উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

দূরশিক্ষা অধিকার

স্নাতকোত্তর বাংলা পর্যায়

তৃতীয় সেমেস্টার

ঐচ্ছিক পত্র ৩০৪

মঙ্গলকাব্য ও আখ্যান কাব্য

পর্যায় – ক

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Postal Address:

The Registrar,

University of North Bengal,

Raja Rammohunpur,

P.O.-N.B.U., Dist-Darjeeling,

West Bengal, Pin-734013,

India.

Phone: (O) +91 0353-2776331/2699008

Fax: (0353) 2776313, 2699001

Email: regnbu@sancharnet.in ; regnbu@nbu.ac.in

Wesbsite: www.nbu.ac.in

First Published in 2019

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission in writing from University of North Bengal. Any person who does any unauthorised act in relation to this book may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

This book is meant for educational and learning purpose. The authors of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the even the Authors has/ have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা

পর্যায় – ক

একক ১ - আখ্যানকাব্য বা কাহিনী কাব্য সম্পর্কে ধারণা

একক ২ - মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে ধারনা

একক ৩ - মনসামঙ্গল কাব্যধারার পরিচয়

একক ৪ - জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল কাব্য

একক ৫ - জগজ্জীবনের কাব্যের চরিত্র-রস-ভাষা ও অলংকার

একক ৬ - শিবমঙ্গল বা শিবায়ন কাব্যের পরিচয়

একক ৭ - রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিব সংকীর্তন বা শিবায়ন কাব্য

পর্যায় – খ

একক ৮ - চন্ডীমঙ্গল কাব্য ধারার পরিচয়

একক ৯ - মানিক দত্ত ও তাঁর চন্ডীমঙ্গল কাব্যের পরিচয়

একক ১০ - মানিকদত্তের ক্যাবের বিশিষ্টতা ও স্বতন্ত্রতা

একক ১১ - মানিকদত্তের চন্ডীমঙ্গলের শিল্পরীতি

একক ১২ - ধর্মমঙ্গল কাব্যধারার পরিচয়

একক ১৩ - ঘনরাম চক্রবর্তীর শ্রীধর্মমঙ্গল কাব্য

একক ১৪ - ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্য বিশিষ্টতা

ঐচ্ছিকপত্র – ৩০৪ আখ্যান কাব্য , মনসা মঙ্গল ও শিবায়ন

একক ১: আখ্যানকাব্য বা কাহিনী কাব্য সম্পর্কে ধারণা- ভূমিকা , আখ্যান কাব্যের সংজ্ঞা , আখ্যান কাব্যের দৃষ্টান্ত , বাংলা আখ্যানকাব্য সমূহের পরিচয়।

একক ২: মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে ধারনা- উদ্দেশ্য , মঙ্গলকাব্য সৃষ্টির কারণ ও পটভূমি , মঙ্গল কাব্যের সংজ্ঞা ও নামকরণ , মঙ্গল কাব্যের আঙ্গিক , মঙ্গল কাব্যের লক্ষণ , মঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন ধারা , মঙ্গলকাব্যের যুগবিভাগ ।

একক ৩: মনসামঙ্গল কাব্যধারার পরিচয়- মনসা দেবী ও মনসা নামের উদ্ভবের কারণ , মনসামঙ্গল কাব্যের ত্রিধারা ও কবিগন , মনসা মঙ্গলের প্রথম যুগের কবিগন , চৈতন্য পর্বের মনসামঙ্গল কাব্য।

একক ৪: জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল কাব্য- কবি জগজ্জীবন ঘোষালের পরিচয় , জগজ্জীবনের মনসা মঙ্গলের খন্ড ও পর্ব-বিন্যাস , জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল কাহিনীর পরিচয় , পুরাণকথা বর্ণনায় মৌলিকতার অভিনবত্ব , জগজ্জীবনের কাব্যে সমাজ চিত্র।

একক ৫: জগজ্জীবনের কাব্যের চরিত্র-রস-ভাষা ও অলংকার- জগজ্জীবনের মনসামঙ্গলের চরিত্র-চিত্রন , জগজ্জীবনের মনসামঙ্গলে হাস্যরস , জগজ্জীবনের মনসামঙ্গলে লোকাচার , জগজ্জীবনের কাব্যে প্রবাদ-প্রবচন , জগজ্জীবনের কাব্যে শব্দ প্রয়োগের অভিনবত্ব , জগজ্জীবনের কাব্যে অলংকার প্রয়োগ।

একক ৬: শিবমঙ্গল বা শিবায়ন কাব্যের পরিচয়- দেবতা শিবের উৎস , প্রাচীন সাহিত্যে শিব প্রসঙ্গ এবং শিবায়ন কাব্যের উদ্ভব , শিবায়ন কাব্যের বৈশিষ্ট্য , শিবায়ন কাব্যের কাহিনী , শিবায়ন ও মঙ্গল কাব্যের পার্থক্য , শিবায়নের কবিগন , শিবায়নের শ্রেষ্ঠ কবি রামেশ্বরের পরিচয় , রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কবি প্রতিভা।

একক ৭: রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিব সংকীর্তন বা শিবায়ন কাব্য- শিব সংকীর্তন বা শিবায়ন কাব্যের রচনাকাল , শিব সংকীর্তন বা শিবায়ন কাব্যের কাহিনী , শিব সংকীর্তন বা শিবায়ন কাব্যের সমাজচিত্র , শিব সংকীর্তন বা শিবায়ন কাব্যে পৌরাণিক ও লৌকিক প্রভাব , রামেশ্বরের শিব সংকীর্তন কাব্যের চরিত্র-চিত্রন, রামেশ্বরের শিব সংকীর্তন কাব্যে হাস্যরস।

একক: ১: আখ্যানকাব্য বা কাহিনী কাব্য সম্পর্কে ধারণা

বিন্যাসক্রম

১.১: ভূমিকা

১.২: আখ্যান কাব্যের সংজ্ঞা

১.৩: আখ্যান কাব্যের দৃষ্টান্ত

১.৪: বাংলা আখ্যানকাব্য সমূহের পরিচয়

১.৫: অনুশীলনী

১.৬: গ্রন্থপঞ্জি

১.১: ভূমিকা

সংজ্ঞা: যে কাব্য বিশেষ কোনও আখ্যান বা কাহিনিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে সাধারণভাবে তাকে আখ্যান কাব্য বলে

'আখ্যান বা কাহিনি কাব্য প্রচলিত বা কল্পিত কোনো কাহিনিকে কাব্যে রূপায়িত করে তবে মনে রাখতে হবে আখ্যান কাব্য আর গাথা বা Ballad সমধর্মী হলেও উভয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য ও বিদ্যমান' মূলতঃ গাথা প্রচলিত লোক গল্পের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়, কিন্তু আখ্যান কাব্য প্রচলিত কাহিনি দ্বারা গ্রথিত হলেও তার মধ্যে একটা এঁতিহ্যগত ভাব প্রকট হয়ে উঠে। দ্বিতীয়তঃ গাথা কাব্য প্রধানতঃ রোমান্টিক প্রণয় কাহিনি দ্বারা গড়ে ওঠে। কিন্তু আখ্যান কাব্যে দেব দেবীদের মাহাত্ম্য বর্ণনা বিশেষ রূপে প্রকট হয়ে ওঠে। তৃতীয়তঃ গাথা মূলতঃ জনসাধারণের মুখে মুখে ফিরে বেড়ায়, কিন্তু আখ্যান কাব্যের

লিখিত রূপ সেই সুপ্রাচীন কাল হতে প্রচলিত, তবে কাহিনি বা আখ্যান কাব্য অনেকাংশে গাথা কাব্য অথবা রোমান্সের অনুরূপ হলেও প্রচলিত বা কল্পিত কোনও কাহিনিকে বর্ণনাত্মক রীতিতে পরিবেশন করাই তার উদ্দেশ্য । ধর্ম ও নীতি শিক্ষার মাধ্যম রূপে তার বিশেষ সার্থকতা ।

দৃষ্টান্ত: ইংরেজি সাহিত্যে আখ্যান কাব্য রচনার বহু কবির নাম স্মরণীয় হলেও বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন স্কট, ম্যূর, বায়রন প্রমুখ। তবে, রোমান্টিক কবিদের মধ্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ (Prelude Michael) কোলরীজ (The Rime of the Ancient Meriner, Christable) বায়রন (The Giaour, Beppo , Don Juan)) এবং কীটস The Eve of St Agnes) কাহিনি ভিত্তিক কবিতা রচনা করেছিলেন । ভিক্টোরিয়ান যুগে টেনিসন, ব্রাউনিং এবং মেসফিল্ড, এজরাপাউলন্ড, এলিয়ট, রবার্ট ফট প্রমুখ আধুনিক কবিরাও কাহিনি ভিত্তিক কবিতা রচনা করেছেন।

১.২: আখ্যান কাব্যের সংজ্ঞা

যে কাব্য বিশেষ কোনও আখ্যান বা কাহিনিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে সাধারণভাবে তাকে আখ্যান কাব্য বলে।

আখ্যান বা কাহিনি কাব্য প্রচলিত বা কল্পিত কোনো কাহিনিকে কাব্যে রূপায়িত করে। তবে মন রাখতে হবে আখ্যান কাব্য আর গাথা বা Ballad সমধর্মী হলেও উভয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য ও বিদ্যমান, মূলত গাথা প্রচলিত লোক গল্পের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়, কিন্তু আখ্যান কাব্য প্রচলিত কাহিনি দ্বারা গ্রথিত হলেও তার মধ্যে একটা ঐতিহ্যগত ভাব প্রকট হয়ে ওঠে।

তৃতীয়তজনসাধার ,ণের মুখে মুখে ফিরে বেড়ায়, কিন্তু আখ্যান কাব্যের লিখিত রূপ সেই সুপ্রাচীন কাল হতে প্রচলিত, তবে কাহিনি বা আখ্যান কাব্য অনেকাংশে গাথা কাব্য অথবা রোমান্সের অনুরূপ হলেও প্রচলিত বা কল্পিত কোনও কাহিনিকে বর্ণনাত্মক রীতিতে পরিবেশন করাই তার উদ্দেশ্য । ধর্ম ও নীতি শিক্ষার মাধ্যম রূপে তার বিশেষ সার্থকতা।

১.৩: আখ্যান কাব্যের দৃষ্টান্ত

ইংরেজি সাহিত্যে আখ্যান কাব্য রচনার বহু কবির নাম স্মরণীয় হলেও বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন স্কট, ম্যূর, বায়রন প্রমুখ। তবে, রোমান্টিক কবিদের মধ্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ (Prelude, Michael) কালরীজ (The Rime of the Ancient Meriner, christable) বায়রন(The Giaour, Beppo, Don Juan) এবং কীটস (The Eve of St. Agnes) কাহিনী ভিত্তিক কবিতা রচনা করেছিলেন। টেনিসন, ব্রাউনিং এবং মেসফিল্ড, এজরাপাউন্ড, এলিয়ট, রবার্ট ফ্রষ্ট প্রমুখ আধুনিক কবিরাও কাহিনি ভিত্তিক কবিতা রচনা করেছেন।

বাংলা সাহিত্য বিশ্ব সাহিত্য ধারার বাইরে নয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, দৌলত কাজীর লোর চন্দ্রানী ও পদ্মাবতী, নাথ সাহিত্যের ময়নামতী, গোপীচন্দ্রের আখ্যান, একালেও কাহিনি কাব্যের ধারা বহন করেছে, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (পদ্মিনী উপ্যাখ্যান, কর্মদেবী, শূর সুন্দরী এবং কাঞ্চিকাবেরী), মধুসূদন দত্ত (তিলোত্তমা সম্ভব, মেঘনাদ বধ, ব্রজাঙ্গনা কাব্য), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বীরবাহু কাব্য, বৃত্তসংহার) নবীন চন্দ্র সেন (পলাশির যুদ্ধ, বঙ্গমতী) রবীন্দ্রনাথ (বিদায় অভিশাপ, দেবতার গ্রাস, পূজারিনি, অভিসার কর্ণ কুন্তী সংবাদ প্রভৃতি) মোহিতলাল (কালাপাহাড়), জসিমুদ্দীন (কবর, নকসী কাঁথার মাঠ) প্রমুখ কবিগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।

১.৪: বাংলা আখ্যানকাব্য সমূহের পরিচয়

'মঙ্গল কাব্য' এই ধারার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে গবেষক আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছে- "আনুমানিক খ্রী. ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বঙ্গ সাহিত্যে যে বিশেষ এক শ্রেণির ধর্ম বিষয়ক আখ্যান কাব্য প্রচলন ছিল, তাহাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। বাংলার পল্লির জনসভায় ইহার উত্তব হইলেও শেষ পর্যন্ত রাজসভায় ইহা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।"

মন্তব্য

'মঙ্গলকাব্য' মূলতঃ দেবদেবীর মাহাত্ম্য জ্ঞপক আখ্যান। এই কাব্যের প্রধান দেবদেবী ছিলেন তিনজন- চন্ডী, মনসা এবং ধর্ম। সেই অনুসারে চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল কাব্যের সুস্পষ্ট ধারা সৃষ্ট হয়েছে, এর পরবর্তীকালে কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল, এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল বিশেষ ভাবে সংযুক্ত হয়েছে মঙ্গলকাব্য ধারায়।

মঙ্গলকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল-

১। এর গঠনে একটা সাধারণ নিয়ম মেনে চলতে হয়। এর প্রধান খণ্ড দুটি - দেবখণ্ড ও মানব খণ্ড। দেবখণ্ডে দেবতাদের কথা থাকে এবং মানবখন্ডে থাকে সেই দেবদেবীর মধ্যে যাঁরা শাপ ভ্রষ্ট হয়ে মর্ত্যে লীলা করছেন তাঁদের কথা ।

২। দৃশ্যতঃ চারটি খন্ডে মঙ্গল কাব্য বিভক্ত- বন্দনা খন্ড, গ্রন্থোৎপত্তির কারণ, দেবখণ্ড এবং নরখণ্ড। বন্দনা খণ্ডে থাকে দেবদেবীর বন্দনা- যে দেব বা দেবীর প্রশস্তি রচনা করা হচ্ছে তিনি তো বটেই, তাছাড়াও আরও অনেক দেবদেবীর । গ্রন্থোৎপত্তির কারণ খণ্ডে দেবতা বা দেবীর আশীর্বাদ ও স্বপ্নাদেশই যে কাব্য রচনার কারণ, সেকথা বলা হয় এবং কবিও তাঁর আত্মপরিচয় এখানে দান করেন। দেবখণ্ডে সেই অভিশাপের কথা বর্ণিত হয় যার জন্য দেবতা বা দেবীকে সত্যেই জন্মগ্রহণ করতে হবে। নরখণ্ডে থাকে মর্ত্য ধামে তাঁদের লীলা।

৩। কতকগুলি বিষয় মঙ্গলকাব্যে থাকবেই, যেমন- বার মাসের দুঃখের কাহিনি বা বারমাস্যা, চৌতিশা স্তব, নারীদের পতিনিন্দা, রান্না ও খাওয়ার বিস্তৃত বর্ণনা, ফুলফল ও পশু পাখির আলোচনা প্রভৃতি ।

৪। গ্রন্থোৎপত্তির কারণের মধ্যে কবির তৎকালীন সমাজের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যের ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকদের কাছে এই সব তথ্য সূত্র অতি মূল্যবান।

৫। মূলতঃ দেবদেবীর মাহাত্ম্য বিষয়ক কাব্য হলেও মঙ্গল কাব্যে মানুষের চরিত্র ও অত্যন্ত সুচারুভাবে অঙ্কিত হয়েছে। ফলে চাঁদ সদাগরের দৃপ্ত ও অনমনীয় ব্যক্তিত্ব, সনকার

সকরুন মূর্তি, ভাঁড়ু দত্ত ও মুরারি শীলের চাতুর্য ও খলতা প্রভৃতি অত্যন্ত সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।

১.৫: অনুশীলনী

১। আখ্যান কাব্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২। আখ্যান কাব্যের সংজ্ঞা সহ উদাহরণ দিয়ে বাংলা আখ্যান কাব্য সমূহের পরিচয় দিন।

১.৬: গ্রন্থপঞ্জি

১। সাহিত্যের রূপভেদ রূপনরীতি নির্ণয়-সুধাংশুশেখর মণ্ডল।

একক: ২: মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে ধারনা

বিন্যাসক্রম

২.১: উদ্দেশ্য

২.২: মঙ্গলকাব্য সৃষ্টির কারণ ও পটভূমি

২.৩: মঙ্গল কাব্যের সংজ্ঞা ও নামকরণ

২.৪: মঙ্গল কাব্যের আঙ্গিক

২.৫: মঙ্গল কাব্যের লক্ষণ

২.৬: মঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন ধারা

২.৭: মঙ্গলকাব্যের যুগবিভাগ

২.৮: অনুশীলনী

২.৯: গ্রন্থপঞ্জি

২.১: উদ্দেশ্য

যেখানে মঙ্গলকারী দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয় তাকেই বলা হয় মঙ্গলকাব্য। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে বাংলার বিশৃংখল আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তি।বাংলার মানুষের বিন্যাস ছিল যে মঙ্গলকাব্য গুলি পাঠ করলে কিংবা শ্রবণ করলে অথবা গ্রন্থ গুলি বাড়িতে রাখলে সকলের মঙ্গল সাধিত হবে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সংস্কারের বিপরীতে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম ভাবনার রীতিনীতি, উচ্চ নীচ নির্বিশেষে সকল মানুষকে মর্যাদা দান - প্রভৃতি কারণে মঙ্গলকাব্যের সূচনা হয়েছিল।এখানেও দেব দেবীর উল্লেখ

আছে,কিন্তু মঙ্গলকাব্যের দেব দেবী গন প্রত্যেকেই মর্ত্য মৃত্তিকা ঘেঁষা। আর এর মূলে ছিল অনার্য সম্ভূত দেবদেবীর সঙ্গে পৌরাণিক দেব দেবীর মিলন সাধনের প্রচেষ্টার ফল। মঙ্গলকাব্য গুলি দেব পূজা এবং ধর্মচিন্তা কেন্দ্রিক আখ্যানকাব্যের এক বিশেষ শাখা। মনসা,চন্ডী,ধর্ম প্রমুখ দেবতার কাহিনি বিভিন্ন আসরে, ঘরোয়া উৎসবে গান করা হত। বিবাহ,সন্তানের জন্ম,ফসলের জন্য,গৃহের যে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে এবং দেবতার পূজায় গাওয়া হতো এই মঙ্গল গান। সুকুমার সেন ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীকে 'তামসী শতাব্দী' বলে উল্লেখ করেছেন।আনুমানিক সেই ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত দীর্ঘসময় এই ধর্মীয় কাব্য শাখাটি জড়িত ছিল জনজীবনের সঙ্গে। অবশ্য পঞ্চদশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত গ্রাম্য ব্রত কথা এবং পাঁচালী রূপেই প্রচলিত ছিল এই বিশেষ রীতির কাব্যধারা। এই দীর্ঘকাল ধরে কোন কবিগণ কোন সমাজ থেকে উদ্ভূত হয়েছেন, কিভাবে দেবকথার সঙ্গে মানব কথাকে যুক্ত করে জনপ্রিয় আখ্যান গড়ে তুলেছেন- সেই বহু কথিত কবিকাহিনী ও বহু আয়াসসাধ্য গবেষণালব্ধ মঙ্গলকাব্য কথাকেই নতুন করে দেখা আমাদের এই আলোচনার উদ্দেশ্য। এর ফলে বাংলা মধ্যযুগের ইতিহাসে জনজীবনের পরিচয় আমাদের সামনে অনেকটাই স্পষ্ট হবে। আর এই সাহিত্যধারা পাঠ করলে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বের বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকার পরিচয় লাভ করব। পাশাপাশি বাঙালির ভৌম জীবন ও ভাব জীবন, মর্ত্য জীবন ও অধিমানুষের জীবন সম্পর্কেও অবহিত হতে পারব।

২.২: মঙ্গলকাব্য সৃষ্টির কারণ ও পটভূমি

মধ্যযুগের সাহিত্য ভূমিতে মঙ্গলকাব্য গুলি যেন একরাশ সূর্যমুখী ফুল- তার জন্ম মাটিতে, পরিপুষ্ট তা মাটির রসে ও মাটি ঘেষা জীবনের স্বেদবিন্দু ছায়ায়। অথচ প্রতি মুহূর্তে দৈব কৃপালাভের জন্য ক্রমাগত তার উর্ধমুখী প্রার্থনা। একারণেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কালান্তর'গ্রন্থে 'বাতায়নিকের পত্রে' ব্যাখ্যা করেছিলেন- "বাংলা মঙ্গলকাব্যের বিষয়টা হচ্ছে, এক দেবতাকে তাঁর সিংহাসন থেকে খেদিয়ে দিয়ে আরেক দেবতার অভ্যুদয়। সহজেই এই কথাটা মনে হয়, দুই দেবতার মধ্যে যদি কিছু নিয়ে প্রতিযোগিতা থাকে তাহলে সেটা ধর্মনীতিগত তারতম্য নিয়ে।" রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এই প্রতিযোগিতার বিষয়ে

রূপায়নের অন্তরালে মানব বুদ্ধির আগমন অগোচর দৈব মাহাত্ম্য ঘোষণাই এর মূল উপজীব্য বিষয় বলে ভেবেছিলেন। এই অনুমান সত্য,তবে সম্পূর্ণ সত্য নয়।

মঙ্গলকাব্য গুলি ধর্মীয় বিচারে দেব দেবীর মহিমা জ্ঞাপক কাহিনি। ইতিহাসের বিচারে মধ্যযুগীয় মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতার পটভূমিতে আত্মরক্ষার পুরাণ। কারণ তুর্কি আক্রমণ বাংলাদেশে বিজাতীয় সংস্কৃতিবাহী বিধর্মী রাষ্ট্রশক্তির অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠায় ধন-প্রাণ-ধর্মরক্ষার চিন্তায় হিন্দু মানস হয়ে উঠেছিল অস্থির। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ১২০৩ থেকে ১২০৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তুর্কি আক্রমণ বাংলাদেশে বিপর্যয় সৃষ্টির অন্যতম কারণ। পাল রাজবংশ এ দেশে প্রায় ৪০০ বছর রাজত্ব করে। গঙ্গা নদীর তীরে নদিয়ায় ছিল রাজা লক্ষণ সেনের অস্থায়ী রাজধানী। তাঁর আমলে বাংলায় সুখ শান্তি বজায় ছিল।তুর্কি নেতা বক্তিয়ার খলজির আকস্মিক আক্রমণে লক্ষনসেনের সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়,বক্তিয়ার খলজির সঙ্গে দলে দলে তুর্কিরা যোগ দেয়। ভেঙে পড়ে বাংলার হিন্দু প্রশাসন।দলে দলে সাধারন মানুষ, লক্ষনসেনের আমলা এবং অভিজাতরাও পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গ ছেড়ে পূর্ববঙ্গের কামরূপে আশ্রয় নেয়। ঐতিহাসিকের মতে, বৃদ্ধ লক্ষণ সেন চলে যান বিক্রমপুরে। তুর্কি শক্তি ক্রমশ প্রসারিত হয় উত্তর ভারত থেকে পূর্ব ভারতের দিকে।এরপর বক্তিয়ার অধিকৃত অংশে ও সমগ্র বাংলাদেশেই ক্রমাগত লুণ্ঠন ও ধ্বংস চলতে থাকে এবং প্রচারিত হতে থাকে ইসলাম ধর্ম।পরিণামে বাংলাদেশে প্রচন্ড শক্তিশালী সম্পূর্ণ বিজাতীয় ইসলাম ধর্মের এক রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।যুদ্ধে হিন্দু রাজশক্তি সেন বংশের পতনের ফলে রাজকীয় আনুকূল্য থেকে হিন্দু ধর্ম বঞ্চিত হয়। আবার জাতপাত, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদির কারণে হিন্দু ধর্ম নিম্নবর্ণের মানুষজনের সহানুভূতি হারায়। নবাগত ইসলাম ধর্মের প্রতি আকর্ষণে অনেকে ধর্মান্তরিত হন। উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে দেখা দেয় হতাশা ও ব্যর্থতার বেদনা। প্রথম পর্যায়ে ইসলামী শাসকবর্গের ধ্বংস, হত্যা,অত্যাচার ও লুণ্ঠনের নাটকীয় আচরণে হিন্দু সমাজের সর্বস্তরে এক বিপন্ন মনোভাব দেখা দেয়। বস্তুত তুর্কি আক্রমণোওর বাংলাদেশের জনজীবনে যে অস্থির চিন্তার আলোড়ন দেখা দিয়েছিল তারই মনোদর্পণ 'মঙ্গলকাব্য'। ইসলামী ধর্ম ও সংস্কৃতির আঘাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য এদেশের হিন্দু সংস্কৃতিমনা সম্প্রদায় আর্য দেবভাবনা ও

আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে প্রাগার্য দেবদেবীর সমন্বয় সাধনের জন্য সচেষ্ট হন।ফলে এতদিন ধরে উচ্চবর্ণের মানুষদের দ্বারা উপেক্ষিত চন্ডী,মনসা, ধর্মঠাকুর প্রমুখ দেবদেবীরা, রাষ্ট্রীয় অবিচার এবং আধি ব্যাধি সর্পভয় নিবারণে কবি কল্পনায় দেখা দিয়েছিল।

তুর্কি রাজত্ব,পাঠান ও মুসলমান শাসনের দীর্ঘ সময় ধরে হিন্দুরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল হত্যা,ধর্মান্তরকরণ, মন্দির ধ্বংস ইত্যাদি কারণে।১৪১৪খ্রিস্টাব্দে আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহকে সিংহাসনচ্যুত করে বাংলার শাসন ক্ষমতা অধিকার করেন হিন্দু রাজা গণেশ। প্রবল সামরিক শক্তিতে তিনি ইলিয়াস শাহী বংশ ধ্বংস করেন এবং হিন্দু রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পুত্র যদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জালালউদ্দিন নাম গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রবল হিন্দু বিদ্বেষী হয়ে উঠেছিলেন। বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি অংশ বিধর্মী রাজা গণেশের আধিপত্য মেনে নিতে পারছিলেন না। তাদেরই আহ্বান জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শরকি বাংলা আক্রমণ করেন ও সিংহাসনে আরোহন করেন যদু অর্থাৎ জালালউদ্দিন। কিন্তু ইব্রাহিম দেশে ফিরে গেলেই গণেশ আবার তার প্রতিপক্ষকে দমন করেন। জালাল উদ্দিনকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজে 'দনুজমর্দনদেব'উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসন অধিকার করেন এবং পুত্রকে আবার হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনেন।

এরপর ইলিয়াস শাহী বংশের দ্বিতীয় ধারার পর অর্থাৎ অন্ধকার যুগের অবসানের পর বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯)। হোসেন শাহ ও তাঁর পুত্র নসরত শাহ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইলিয়াস শাহী বংশের দ্বিতীয় ধারায় বাংলার সুলতান রুকনুদ্দিন বরবক শাহও (১৪৫৬-১৪৭৪) ছিলেন বাংলা সাহিত্যের উৎসাহদাতা।ভাগবতের অনুবাদ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'গ্রন্থের রচয়িতা মালাধর বসুকে তিনি 'গুনরাজ খাঁ' উপাধি দিয়েছিলেন। হোসেন শাহের আমলেও মুসলিম শাসনকর্তাগন হিন্দু কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এই সময়ে মালাধর বসু,বিপ্রদাস, বিজয়গুপ্ত প্রমুখ কবিরা সুলতানের আনুকূল্য লাভ করেছেন। পরাগল খাঁ ও ছুটি খাঁর নির্দেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীর মহাভারত অনুবাদে ও এই সাংস্কৃতিক উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। এদিক থেকে পূর্ববর্তী রাজা দনুজমর্দন গণেশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির অভ্যুদয় ঘটেছিল তাঁর আমলেই। অনুমান করা হয়

যে বাংলা রামায়ণের অনুবাদক কৃত্তিবাস ওঝা তাঁর সভা অলংকৃত করেছিলেন। তিনিই মুদ্রায় উৎকীর্ণ করেছিলেন 'চণ্ডীচরণ পরায়ণস্য' শব্দটি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে তুর্কি বিজয়ের পরিণামে অন্ত্যজ হিন্দু সমাজের সঙ্গে বর্ণশ্রেষ্ঠ হিন্দুদের যোগাযোগ তৈরি হল। নিপীড়িত হিন্দু-মুসলমান ও বৌদ্ধদের মধ্যে একটি সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হল। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা আত্মরক্ষার্থে কেবল যে নিম্নবর্ণের অবহেলিত হিন্দুদের সঙ্গে সম্পর্ক করতে সচেষ্ট হলেন তাই নয়, ইসলাম ধর্ম গ্রহণের হাত থেকেও হিন্দুসমাজ অনেকটা রক্ষা পেল এবং লোকায়ত দেবদেবীরাও প্রতিষ্ঠা পেলেন। মঙ্গলকাব্যগুলি মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল,শিবমঙ্গল,ধর্মমঙ্গল এই দেব-দেবীদের আখ্যান রূপে রচিত হল। সুকুমার সেনের একটি মন্তব্য এই প্রসঙ্গে খুবই প্রাসঙ্গিক- "বাংলাদেশ আর্য অনার্য দুই স্তরের পরস্পর মিলন কল্পে তুর্কি অভিযান রূপে প্রচন্ড সংঘর্ষের অপেক্ষা করেছিল। মুসলমান শক্তির মধ্যস্থতায় আর্য ও অনার্য মিলন হইয়া বাঙালি জাতি বিশিষ্ট রুপাইয়া জন্মগ্রহণ করিল"।

এই রাষ্ট্রীয় বিপর্যয় ছাড়াও মঙ্গলকাব্য সৃষ্টির আরো বেশ কিছু কারণ ছিল। সেগুলি হল-

ক) আর্য সংস্কৃতির ধারক উচ্চবর্ণের হিন্দু ও অনার্য সংস্কৃতির ধারক নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে যে অবজ্ঞা ও ঘৃণা ছিল, যে ধর্ম চিন্তাগত তীব্র ব্যবধান ছিল তুর্কি আক্রমণের ফলে তাদের মধ্যে ব্যবধান ঘুচে সংস্কৃতির বিনিময় ঘটলো। ভীতসন্ত্রস্ত বাঙালি হল ঐক্যবদ্ধ। আর্য-অনার্য দেবদেবীদের মধ্যেও ঘটলো সংমিশ্রণ। 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যে ওঁরাও, সাঁওতাল, ব্যাধ বা সবর পূজিতা 'চান্ডী' বা 'চুন্ডী'দেবী শিবজায়া উমার সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠলেন দেবী চণ্ডী রূপে, সর্প দেবী মনসা 'মঞ্চামা' বা 'মনোমাঞ্চী' নামের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে বা বৌদ্ধ সর্পদেবী 'জাঙ্গুলী' তারার সঙ্গে জড়িত হয়ে লৌকিক দেবী রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। অনুরূপভাবে ধর্ম ঠাকুর অস্ট্রিক কূর্মবাচক 'দরম' বা অন্ত্যজ দেবতা 'ডোমরায়' কিংবা বৌদ্ধ দেবতা 'নিরঞ্জন'বা বৈদিক বিষ্ণু-শিব-ইন্দ্র-বরুণ-যম প্রমুখ দেবতার ভাব কল্পনার সঙ্গে অভিন্ন চেতনায় ধর্ম ঠাকুর রূপে 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে প্রকাশিত হলেন।

খ) বিপদে পড়লে ভীত মানুষ দেবতার আশ্রয় প্রার্থনা করেন। মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীদের উৎপত্তির মূলে রয়েছে এই রকম নানা ধরনের আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক প্রভাব।

বাংলাদেশ নদী-নালা, খাল-বিল ও বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ। বাঘ,কুমির,সাপ ইত্যাদি হিংস্র জন্তু জানোয়ারদের আক্রমণে এবং বসন্ত,কলেরা প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধির প্রকোপে প্রায়ই মানুষের প্রাণহানি ঘটত। নানাভাবে উপদ্রুত বাংলার মানুষ তাই ভেবেছিল এই সমস্ত আধিভৌতিক দুর্যোগের পিছনে নিশ্চয়ই পরাক্রমশালী দেবতার অদৃশ্য হাত কাজ করছে। সেই ক্রুদ্ধ দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে পারলেই মঙ্গল সাধিত হবে। তাই সাপ, বাঘ, কুমিরের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য মনসা, দক্ষিণরায় ও কালো রায় প্রভৃতি দেবদেবীর কল্পনা করা হল। ঝড় ঝঞ্ঝার ক্ষেত্রে উদ্ভূত হলো দেবী চণ্ডী, অনাবৃষ্টিতে বৃষ্টি দানের জন্য ধর্ম ঠাকুর, কলেরা ও বসন্ত ব্যাধির থেকে উদ্ধার পেতে শরণাপন্ন হলেন দেবী শীতলার । স্বভাবতই লোকচিত্তে এই বিশ্বাসবোধ প্রকার হলো যে, এইসব দেব-দেবীকে পুজো করে তুষ্ট করলে তাঁরা ভক্তকে সকল প্রকার বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। মঙ্গলকাব্য রচনার আর একটি মৌল প্রেরণা এই ভয়ভাবনাজাত অহৈতুকী ভয় ভাবনা। একদিকে উচ্চবর্ণের ঘৃণা ও অবজ্ঞা থেকে রেহাই পাবার জন্য নিম্নবর্ণের হিন্দুদের দলে দলে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ, অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা-এই দুইয়ে মিলে হিন্দু সমাজের দ্রুত ভাঙ্গন ও অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য লৌকিক দেবদেবী ও ধর্ম বিশ্বাসকে বাঙালি হিন্দুরা মেনে নিতে লাগলেন। এটাই ছিল মঙ্গলকাব্য উদ্ভবের সব চেয়ে বড় কারন।

গ) সম্রাট অশোকের সময় থেকেই ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম সুবিস্তৃত ছিল। তারই প্রতিক্রিয়ায় হিন্দু দেবতাদের মধ্যে ক্ষমতা আরোপ করে তাঁদের প্রকট করে তোলা হল।

ঘ) পাল রাজাদের সময় থেকে বিভিন্ন লৌকিক ধর্মমতের উদ্ভব হয় ও সেনরাজাদের সময়ে বৈষ্ণবধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে এই লৌকিক ও দেশীয় সংস্কৃতি মিশে যায়। এই সাংস্কৃতিক সমন্বয় মঙ্গল দেবতাদের উদ্ভবের একটি বিশিষ্ট কারণ।

ঙ) রাজা লক্ষণ সেন ছিলেন পরম বৈষ্ণব। তাঁর সভাকবি ছিলেন 'গীতগোবিন্দ' রচয়িতা কবি জয়দেব। জয়দেবের কাব্যে প্রথম 'মঙ্গল' শব্দটি উল্লেখ পাওয়া যায়।

২.৩: মঙ্গল কাব্যের সংজ্ঞা ও নামকরণ

মঙ্গলকাব্যের সংজ্ঞা:-

মধ্যযুগের সাহিত্য ভূমিতে মঙ্গলকাব্যগুলি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। বস্তুত পদাবলী, চরিত কাব্য ও অনুবাদ শাখার মত মঙ্গলকাব্যগুলিও বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট পর্যায়। এর আখ্যানের বহিরঙ্গে আছে দৈবলীলা বা দেব দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার এবং অন্তরঙ্গে আছে সেই দেবদেবী বা শাপভ্রষ্ট চরিত্রের মানবিক স্বভাবের রূপায়ণ। লোক সমাজে পূজা প্রচার ও স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় এখানে দ্বন্দ্বই হয়েছে দেবতা ও মানব চরিত্রের বিধিলিপি। মঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ গবেষক শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্যের মত অনুসারে,"খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবি ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে যে বিশেষ প্রকার সাম্প্রদায়িক সাহিত্য প্রচলিত ছিল তাহাই মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত"।

"অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে বলেন-" মঙ্গলকাব্যগুলি গান করিয়া দেবতার মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচার করা হইত। সেই গান একটি বিশেষ রকম সুরে হইত এবং সেই সুরকেও মঙ্গল বলিত।..... যে গান শুনিলে মঙ্গল হয়, যেখানে দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারিত, যে গান মেলার গীত এবং যে গান একদিন যাত্রা করিয়া অর্থাৎ আরম্ভ হইয়া আটদিন ব্যাপীয়া চলে তাহাকেই মঙ্গলগান বলে।"

মঙ্গলকাব্য প্রসঙ্গে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন-"দেবমাহাত্ম্য বাচক বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য যে আখ্যান কাব্য রচিত হইয়াছিল, সাধারণ কথায় তাহাকে মঙ্গলকাব্য বলা যায়।"

মঙ্গল নামকরণের কারণ:-

মঙ্গল কাব্য গুলির মঙ্গল নামের কারণ ও উৎস সম্পর্কে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। সেই তথ্যগুলিকে সুত্রাকরে এইভাবে সাজানো যেতে পারে-

১) 'মঙ্গল' শব্দটি ঋকবেদে 'গৃহ কল্যাণ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই সূত্রানুযায়ী শব্দটি গৃহীত হতে পারে।

২) হরিবংশ অনুযায়ী মঙ্গল শব্দটির অর্থ দেবলীলাগত।

৩) জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যে "মঙ্গলম উজ্জ্বল গীতি"বলে গানের সূচনা হয়েছে।

৪) ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, ভারতীয় সংগীত শাস্ত্রে 'মঙ্গল' নামে একটি পৃথক রাগের উল্লেখ আছে। তাঁর মতে একসময় মঙ্গলকাব্যগুলি এই মঙ্গল রাগেই পরিবেশিত হতো।

৫) বাংলাদেশ,অসম ও তামিলনাড়ুতে বিবাহের বন্ধন হিসেবে ‘মঙ্গল’ শব্দের ব্যবহার আছে। এক্ষেত্রে শব্দটির অর্থ বিবাহ সংগীত।

৬) প্রাচীন মঙ্গলকাব্যে বিবৃত মঙ্গলাসুর দৈত্য বধের কাহিনী থেকে কাব্যের এইরূপ নামকরণ হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

৭) 'অষ্টমঙ্গলা' অর্থাৎ মাসের এক মঙ্গলবার থেকে শুরু করে আর এক মঙ্গলবারের মধ্যে এই কাব্য পালা পাঠ সীমাবদ্ধ থাকতো বলে এর 'মঙ্গলকাব্য' নামকরণ করা হতে পারে।

এই কাব্য লিখনে মঙ্গল, পাঠ করলে মঙ্গল, শুনলে মঙ্গল এবং ঘরে রাখলেও মঙ্গল হয়। আসলে 'মঙ্গল' শব্দের অর্থ হল 'গাথা'। গানের 'গা' আর কথার 'থা' মিলে হল গাথা। সেই সূত্রে মঙ্গলকাব্য হলো গান ও কথার সংমিশ্রণ। অধ্যাপক রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এই অভিমতের পক্ষপাতী। এক কথায় বলা চলে, অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন মঙ্গল বিধায়ক দেব দেবীর বিজয় কাহিনী বর্ণনা করা যে কাব্যের মূল লক্ষ্য, তারই নাম 'মঙ্গলকাব্য'।

২.৪: মঙ্গল কাব্যের আঙ্গিক

মঙ্গলকাব্য দেবলীলা বর্ণনার কাহিনী কাব্য। ধর্মতত্ত্ব, দেবলীলা ও নানাকাহিনীর সংমিশ্রণে মঙ্গলকাব্য গড়ে উঠেছে।সংস্কৃত পুরাণের শেষ সংস্করণ বলা যেতে পারে এই কাব্যগুলিকে। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য বিচার বিশ্লেষণ করে তাদের মধ্যে যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য গুলি লক্ষ্য করা গেছে সেগুলি এইরকম-

১) মঙ্গল কাব্যের দুটি ভাগ- একটি দেবখন্ড এবং অন্যটি নরখন্ড। 'দেবখন্ডে' উদ্দিষ্ট দেবতাকে সাধারণত মহাদেবের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয় । অপরটি ‘নরখন্ড’- এখানে মর্ত্যলোকে দেবতা নিজের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য মানব-মানবীকে অনুগ্রহ বা নিগ্রহ করে

থাকেন। মঙ্গলকাব্যের সূচনায় কবি গণেশাদি অন্যান্য দেবদেবীর প্রশস্তি বন্দনা ও গ্রাম্য দেবতাদের বন্দনা করতেন। চৈতন্য পরবর্তী মঙ্গলকাব্য গুলিতে চৈতন্য বর্ণনা স্থান পেয়েছে অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে।

২) মঙ্গলকাব্যের সূচনায় কবি গণেশাদি অন্যান্য দেব দেবীর বন্দনা করে কাব্য শুরু করেন। এই বন্দনা অংশে হিন্দু দেব দেবীর পাশাপাশি অনেক কবি অন্যান্য দেবতা এমনকি ইসলামী দেবতাকেও বন্দনা করতে কুণ্ঠিত হননি। আবার চৈতন্য পরবর্তী কালের মঙ্গলকাব্য গুলিতে চৈতন্য বন্দনা স্থান পেয়েছিল এক অপরিহার্য অঙ্গ রূপে।

৩) প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যে 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ' বর্ণনায় স্বপ্নাদেশ বা দৈবাদেশের উল্লেখ রয়েছে। এই অংশ কবির ব্যক্তি জীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় এমনকি সমকালীন ইতিহাস, আঞ্চলিক পরিচয় বিবৃত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গল কাব্যের অংশবিশেষ।

৪) মঙ্গলকাব্যের নায়ক নায়িকাদের অনেকে বনিক বা অন্ত্যজ শ্রেণী ভুক্ত, যেমন- চাঁদ সওদাগর, ধনপতি, শ্রীমন্ত সদাগর, ব্যাধ কালকেতু, ফুল্লরা, কালু ডোম, লখাই প্রমুখ।

৫) অনেক মঙ্গলকাব্যে যাত্রা, সমুদ্রযাত্রা এবং শিকারের বর্ণনা পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়,মনসামঙ্গল এবং চন্ডীমঙ্গল কাব্যের সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা রয়েছে, আবার চন্ডীমঙ্গল কাব্যে শিকারের বর্ণনা পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গলে কামরুপ যাত্রার কথা আছে, আছে যুদ্ধযাত্রার কথা।

৬) মঙ্গলকাব্য গুলিকে বলা যেতে পারে মধ্যযুগের লোক সংস্কারের খনি। সাধভক্ষণ, শিশুর জন্ম, অন্নপ্রাশন, সংসার জীবনের বর্ণনা, রন্ধন তালিকা, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিবাহ রীতি, সংস্কার, নারীগণের পতিনিন্দা, নায়িকার বারমাস্যা, চৌতিশা স্তব ইত্যাদি প্রসঙ্গে বাঙালিয়ানা প্রতিফলিত হয়েছে। অধিকাংশ কবি বাঙালি জীবনকে ছুঁয়ে গেছেন।

৭) জরতী বা বৃদ্ধার বেশে ভক্তকে ছলনা বা শত্রুপক্ষকে ভয় দেখানোর প্রচেষ্টা মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের মধ্যে দেখা যায়।

৮) কবির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদির ব্যবহার সমকালীন সমাজ জীবনের বাস্তব চিত্রকে তুলে ধরেছে। গোষ্ঠী বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যথাযথ বর্ণনা পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ থেকে শুদ্র, এমনকি মুসলমান সম্প্রদায়কেও তারা বাদ দেননি। অবশ্য মনসামঙ্গলে বিশেষ করে বিপ্রদাস-এর 'মনসাবিজয়'-এ মুসলমানদের উপর মনসা এবং তার সর্পকুলের যে কোপ তা অন্য কথা বলে। যদিও অবন্তী সান্যাল মনে করেছেন অংশটি রচনা বিপ্রদাসের নাও হতে পারে। তবে ধর্মমঙ্গলে হিন্দু-মুসলমানের একত্রে রুটি ভাগ করে খাওয়ার সাম্যবাদী ছবি ধরা পড়েছে।

৯) করুণরস, বীররস এবং কৌতুক রসের আশ্রয়েই প্রধানত মঙ্গলকাব্যগুলি লেখা হত। এরফলে দুঃখের দারুণ দহন এবং কৌতুকের স্নিগ্ধ নির্ঝরে কাব্যগুলির কাহিনী সুশোভিত হয়ে উঠেছিল।

১০) মঙ্গলকাব্যগুলি মূলত পয়ার ছন্দে লেখা। একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ইত্যাদি পয়ারের বিচিত্র রূপ দেখা যায়।আবার ভারতচন্দ্রের মতো কবির রচনায় বহু সংস্কৃত ছন্দের বাংলায় প্রকাশ ঘটেছিল।

১১) প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের অলৌকিকতা প্রাধান্য লাভ করেছে। মঙ্গলকাব্যগুলি প্রধানত দেবমাহাত্ম্য বর্ণনার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল বলেই এমনটি ঘটেছে।

২.৫: মঙ্গল কাব্যের লক্ষণ

আঙ্গিক অর্থাৎ গঠনশৈলীর নির্দিষ্ট বিভাগ ছাড়াও মঙ্গলকাব্যের সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষণ আছে। মঙ্গলকাব্যগুলি প্রথম পর্যায়ে ছিল ব্রত কথা। গ্রামীণ নারীসমাজ গৃহের সুখ-শান্তির কারণে লৌকিক দেবতাদের কাছে প্রার্থনা জানাতেন ছড়া ও গানের মাধ্যমে। লোকসমাজ থেকেই সৃষ্ট এইসব ব্রত কথায় দেব বন্দনা মূলক কাহিনী কিছু কিছু থাকতই। সঙ্গে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে আলপনা ও কিছু প্রতীক চিহ্নের ব্যবহারে শিল্প সৌন্দর্য সৃষ্টি হত। এই মৌলিক সাহিত্য ছাড়া ব্রতকথা পরবর্তী সময়ে লিখিত পাঁচালীর মর্যাদা লাভ করে। ক্রমশ দেবীদের বিশেষত চন্ডী ও মনসার লীলাকাহিনী পাঁচালীর আকারেই বিস্তৃত হতে থাকে। পাঁচালী ব্রতকথার মতো সংক্ষিপ্ত নয়, বরং তা আরো বিস্তারিত হয়ে বিভিন্ন বিষয় যুক্ত হয়ে মঙ্গল

কাব্যগুলির সৃষ্টি করেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় পল্লীর সাহিত্যই বৃহৎ সাহিত্যে রূপান্তরিত হল। মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, কেতকাদাস প্রভৃতির মনসার ভাসান, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এই শ্রেণীর কাব্য; তাহা বাংলার ছোটো পল্লী সাহিত্যকে বৃহৎ সাহিত্যে বাঁধিবার প্রয়াস। সব শ্রেণীর মঙ্গলকাব্যের রয়েছে-

১) নায়িকার বারোমাস্যা, কখনো নায়কদেরও। সুখের বারোমাস্যা যেমন আছে তবে দুঃখেরই বেশি।

২) এখানে আছে লোকসমাজ, লোক জীবনের ও লোক সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়। এসেছে অন্ত্যজ ব্রাত্য মানুষদের জীবনযাপন, বিশ্বাস সংস্কার, আচার-আচরণ, উৎসব অনুষ্ঠানের কথা।

৩) আছে নারীদের পতিনিন্দা। সংস্কৃত সাহিত্যে পতিনিন্দার এই রীতি লক্ষ করা গেছে। মঙ্গল কাব্যে বিবাহ বাসরে উপস্থিত রমণীরা আপন আপন স্বামী নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছে। চন্ডীমঙ্গলে দেখা যায়-

'দেখিআ বরের রূপ জতেক যুবতী

মনে মনে নিন্দা করে আপনার পতি।'

৪) মঙ্গলকাব্য গুলিতে কবিরা আত্মপরিচয় দান ছাড়াও ভণিতা ব্যবহার করেছেন। যেমন 'চন্ডীমঙ্গল'কাব্যে-

‘প্রভুর ইঙ্গিত পায়া আদি দেবী মহামায়া

সৃষ্টি সৃজিতে খৈল মন।

উমাপদ-হিত চিত রসিল নতুন গীত

চক্রবর্তী শ্রী কবিকঙ্কন।।’ (প্রথম দিবস: নিশা)

অবশ্য বিভিন্ন পুঁথিতে ভিন্ন ভিন্ন ভনিতাও পাওয়া যায়। অনেক কবি তাদের ভনিতায় পূর্ববর্তী কবিদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। যেমন মুকুন্দরাম স্মরণ করেছেন পূর্ববর্তী কবি মানিক দত্তকে-

'মানিক দত্তের বন্দো করিয়া বিনয়।

যাহা হইতে হইল গীত পথ পরিচয়।।'

ধর্মমঙ্গলের আদি কবিকে স্মরণ করেছেন পরবর্তী কবি ঘনরাম চক্রবর্তী।

৫) প্রত্যেকটি মঙ্গলকাব্যে বিবাহ আচারের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। কবিগণ প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতাতেই এই অংশটি রচনা করেছেন।

৬) মঙ্গলকাব্য গুলিতে নায়িকাদের রন্ধনবিদ্যায় নিপুণতা, দীর্ঘ বিস্তৃত রন্ধন ও খাবারের তালিকা এবং বহুরকম খাদ্যবস্তুর কথা আছে, যা বাঙালির ভোজনপ্রিয়তাই প্রমাণ দেয়।

৭) মঙ্গলকাব্য গুলিতে আছে বণিকদের বাণিজ্য যাত্রার বিষয়। মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ সদাগর চৌদ্দ ডিঙা নিয়ে বাণিজ্যে যায়।চন্ডীমঙ্গল কাব্যে ধনপতি সওদাগর সপ্তডিঙা নিয়ে চন্দন ইত্যাদি আনবার জন্য বাণিজ্যে যায়। এ প্রসঙ্গে সমুদ্রপথের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

৮) বারমাস্যা বা বারমাসের দুঃখের কাহিনী মঙ্গল কাব্যের একটি বিশেষ অংশ। ফুল্লোরা বারমাসের দুঃখের কথা শুনিয়েছে ছদ্মবেশিনী দেবী চণ্ডীকে। প্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত এই বারমাস্যা।

৯) অনেক মঙ্গল কাব্যে দেব দেবীর শতনাম কীর্তন আছে। মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল কাব্যে আছে দেবী চণ্ডীর শতনাম বর্ণনা।

১০) মঙ্গলকাব্য গুলিতে আছে নগর বর্ণনা, সরোবর বর্ণনা, বিস্তৃত বৃক্ষ তালিকা। চন্ডীমঙ্গল কাব্যে গুজরাট নগর পত্তন এর বর্ণনা বন কেটে বসতি স্থাপনে এই দিক গুলির পরিচয় আছে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে বর্ধমান নগরের বর্ণনা আছে।

১১) লোক সাহিত্যের কোন কোন লক্ষণ মঙ্গলকাব্যেও দেখা যায়। যেমন নারীর সতীত্ব প্রমান-এর বিষয়। মনসামঙ্গল কাব্যে বেহুলাকে এবং চন্ডীমঙ্গল কাব্যে খুল্লনাকে এই পরীক্ষা দিতে হয়েছে।

১২) মঙ্গলকাব্য গুলিতে মূল চরিত্র প্রথমে বিদ্রোহী হলেও পরে দেবতা বা দেবীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। অবশ্য সবই উদ্দিষ্ট দেবতার মহিমা ও পূজা প্রচারের জন্য। মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদসদাগর, চন্ডীমঙ্গল কাব্যে ধনপতি সওদাগর, ধর্মমঙ্গল কাব্যে মহামদ এমনই চরিত্র। মঙ্গলকাব্যের কবিরা এভাবেই প্রথা রক্ষা করেছেন।

২.৬: মঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন ধারা

মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ঘটেছিল সম্ভবত তুর্কি আক্রমণ কালে তথা ক্রান্তিকালে। তখন তার আকার বা রূপ কেমন ছিল তা জানা না থাকলেও অনুমান করা হয় যে, তখন মঙ্গল কাব্যের কাহিনীগুলি সংক্ষিপ্ত পাঁচালীর আকারেই বর্তমান ছিল। তারপর আদি মধ্যযুগে আমরা প্রচলিত আকারে পাচ্ছি মঙ্গলকাব্যের একটি ধারা-'মনসামঙ্গল' বা 'পদ্মাপুরাণ'কে। অন্ত্যমধ্য যুগে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট রূপে আত্মপ্রকাশ করে 'চন্ডীমঙ্গল' বা 'অভয়ামঙ্গল'। মঙ্গলকাব্য শাখার তৃতীয় প্রধান শাখা 'ধর্মমঙ্গল'কাব্যের উদ্ভব অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে। মঙ্গলকাব্যের প্রধান চতুর্থধারা 'শিবমঙ্গল', যেটি সাধারণত 'শিবায়ন' নামেই অধিক পরিচিত।'মঙ্গল'নামে অভিহিত হলেও 'শিবায়ন' প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলকাব্য নয়। এরূপ একটি ধারা'কৃষ্ণমঙ্গল'-এটি বস্তুত ভাগবতের অনুবাদ। পরে আরো অনেক অনার্য সমাজ থেকে আগত দেবদেবী বিষয়ক পৌরাণিক কাহিনী এবং কাব্যও 'মঙ্গলকাব্য'-র পরিচয় লাভ করেছে, এমনকি দেবোপম নর-নারীর কাহিনী নামেও 'মঙ্গল' শব্দ যুক্ত হয়েছে।

প্রাচীনত্ব, সংখ্যা ও উৎকর্ষের বিচারে মঙ্গলকাব্য গুলিকে প্রধানত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়-

১) প্রধান মঙ্গলকাব্য , ২) অপ্রধান মঙ্গলকাব্য,

১) প্রধান মঙ্গলকাব্য :

মনসামঙ্গল :-

প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে পড়ে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও শিবায়ন।আপাতত যে সমস্ত মঙ্গলকাব্যের পুঁথি আমাদের হস্তগত হয়েছে তার বিচার বিশ্লেষণ থেকে অনুমিত হয় যে, মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ প্রাচীনতম মঙ্গলকাব্য। এর অন্তত তিনজন গ্রন্থকারকে চৈতন্য পূর্বকালে স্থাপন করা হয়। এঁরা হলেন- নারায়ন দেব, বিজয় গুপ্ত ও বিপ্রদাস পিপলাই। মনসামঙ্গল কাব্যে এছাড়াও অর্ধশতাধিক কবির নাম পাওয়া গেলেও এঁদের মধ্যে দ্বিজ বংশীদাস এবং কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বণিক প্রধান চাঁদসদাগর বা সাধু চন্দ্রধরের পূজা লাভের জন্য দেবী মনসার নিষ্ঠুরতার কাহিনীই এর প্রধান উপজীব্য।

চন্ডীমঙ্গল :-

চন্ডীমঙ্গলও প্রাচীন কাব্য, তবে চৈতন্যপূর্ব যুগের কোন কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। এই ধারার কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী সমগ্র মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা লাভ করে থাকেন। অপর কবি দ্বিজ মাধব। চন্ডীমঙ্গল কাব্যে দুটি পরস্পর নিরপেক্ষ কাহিনী-একটি ব্যাধসন্তান কালকেতু ও ফুল্লরার কাহিনী, অপরটি বণিক ধনপতি সওদাগরের কাহিনী। এই কাব্যে দেবী চণ্ডীর মধ্যে নিষ্ঠুরতার পরিচয় নেই।

ধর্মমঙ্গল :-

ধর্মমঙ্গল কাব্যের উদ্ভব ও বিস্তৃতি রাঢ় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। এর প্রধান কাহিনী লাউসেনকে অবলম্বন করে গড়ে উঠলেও, পার্শ্ব কাহিনী রয়েছে অনেকগুলি। এতে কিছু কিছু পৌরাণিক কাহিনীও যুক্ত হয়েছে। এই ধারার কবিদের মধ্যে ঘনরাম চক্রবর্তী নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শিবায়ন :-

শিবায়ন কাব্যের প্রধান দেবতা পৌরাণিক শিব, অতএব পূর্বোক্ত মঙ্গলকাব্যগুলির সঙ্গে এর একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।অবশ্য শিবায়ন কাব্যে পৌরাণিক কাহিনীর পাশাপাশি

লৌকিক কাহিনীও যুক্ত রয়েছে। এই ধারার কবিদের মধ্যে রামেশ্বর চক্রবর্তী, কবি চন্দ্রশংকর চক্রবর্তী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

২) অপ্রধান মঙ্গলকাব্য :

অপ্রধান মঙ্গল কাব্যের অনেকগুলিই পৌরাণিক দেব-দেবীদের মাহাত্ম্য প্রচার উপলক্ষে রচিত। অতএব এদিক থেকে এগুলিকে মূলধারার বহির্গত বলাই উচিত। এই অপ্রধান মঙ্গলকাব্য ধারায় কোন উল্লেখযোগ্য কবির পরিচয় পাওয়া যায় না। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র এবং তাঁর কাব্য অন্নদামঙ্গল এর ব্যতিক্রম। অপ্রধান ধারায় রয়েছে গঙ্গামঙ্গল- এই ধারার কবিদের মধ্যে আছেন মাধব, দ্বিজগৌরাঙ্গ, দ্বিজ কমলাকান্ত, দুর্গা প্রসাদ প্রমুখ। গৌরীমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা পাকুড়ের ভূস্বামী পৃথ্বীরাজ। শীতলা মঙ্গল কাব্যের কবিদের মধ্যে রয়েছেন-নিত্যানন্দ ও বল্লভ। দুর্গা মঙ্গল কাব্যের কাহিনীকার ভবানীপ্রসাদ, রূপনারায়ন ও রামচন্দ্র। বাসুলিমঙ্গল কাব্য কারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কবিচন্দ্র মুকুন্দ। ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্যের কবি কৃষ্ণরাম, রুদ্র রায় ও শংকর। রায়মঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দরের অনেক ভিড়ের মধ্যে আছেন ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন, কবিকঙ্কন, সাবিরিদ খাঁ। এই মঙ্গল কাব্য গুলির ছাড়াও রয়েছে- সূর্যমঙ্গল, কপিলামঙ্গল, গোসানিমঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, লক্ষ্মীমঙ্গল, তীর্থমঙ্গল প্রভৃতি।

এছাড়া চৈতন্যমঙ্গল, অদ্বৈতমঙ্গল আদি গ্রন্থের সঙ্গে 'মঙ্গল' শব্দ যুক্ত থাকলেও এগুলি বস্তুত জীবনীগ্রন্থ- নাম ছাড়া মঙ্গল কাব্যের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই।

২.৭: মঙ্গলকাব্যের যুগবিভাগ

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীকে মঙ্গলকাব্যের উদ্ভবের যুগ বলা হয়। এই যুগের সাহিত্যিক নিদর্শন প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মনসামঙ্গলের কবি বিজয়গুপ্ত তাঁর পূর্ববর্তী মনসামঙ্গল রচয়িতা হরিদত্ত সম্পর্কে বলেছেন-

'মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।

প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত।।

হরি দত্তের যত গীত লুপ্ত হইল কালে।

ঘোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে।।'

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে চন্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর পূর্ববর্তী কবি মানিক দত্তকে যথোচিত বৈষ্ণবীয় বিনয়ের সঙ্গে বলেছেন-

'মানিক দত্তেরে বঙ্গ করিয়া বিনয়।

যাহা হইতে হইল গীত পথ পরিচয়।।'

মানিক দত্ত সম্ভবত খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর কবি। মধ্যযুগের ধর্মমঙ্গলের কবি ঘনরাম চক্রবর্তী ও ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদিকবি ময়ূর ভট্টের নাম স্মরণ করেছেন শ্রদ্ধার সঙ্গে। তাতেও দেখা যায় ময়ূরভট্টের কৃতিত্ব এই যে, তিনি ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবি।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীই মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টির যুগ।পরবর্তী যুগের আখ্যায়িকা এই যুগে এসে একটা পরিমিত পরিনতি পেয়েছে। এযুগের প্রসিদ্ধ মনসামঙ্গলকার বিজয় গুপ্ত, নারায়ন দেব, দ্বিজ বংশীদাস ও চণ্ডীমঙ্গলের লেখকেরা দ্বিজমাধব, মুকুন্দরাম এবং ধর্মমঙ্গলের কবি মানিক গাঙ্গুলী, খেলারাম আবির্ভূত হন। এই সময়ে উল্লিখিত শক্তিমান কবিদের হাতে মঙ্গলকাব্যগুলো পরিপূর্ণ অবয়ব লাভ করেছে ঠিকই, কিন্তু এই পরিপুষ্ট অবয়বের উপর তখনও শিল্পিত করার কাজ বাকি ছিল। এই যুগে মঙ্গল কাব্যের অপর সংস্কৃত পুরাণের প্রভাব পড়ে। তখন হিন্দুসমাজ লৌকিক কাহিনী অপেক্ষা পৌরাণিক কাহিনীতেই বিশ্বাসী ছিল।এইভাবে সেই যুগে মঙ্গলকাব্যে লৌকিক ও পৌরাণিক ঘটনা মিশ্রিত করে মঙ্গলকাব্য আভিজাত্যের স্তরে উঠলো। তবুও তখনও এর ভাষায় ও কল্পনায় সম্পূর্ণ গ্রাম্যতা মুক্ত হয়ে সাহিত্যিক সৌন্দর্য মন্ডিত হতে পারেনি। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ঘনরামের ধর্মমঙ্গল ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে সাহিত্যিক আভিজাত্য ফুটেছে, যদিও ষোড়শ শতকের মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকটা উপন্যাসের মতই জীবন্ত।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্যে ভাবসত্য কম ছিল না।কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্যে কাব্যিক ব্যায়াম অনেক সময় আধুনিক লেখকদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

ভারতচন্দ্রের অলংকার ও ছন্দ ছিল আধুনিক যুগের লেখকদের অনুপ্রেরণা। রূপনারায়ণের দূর্গামঙ্গল, মার্কন্ডেয় পুরাণের ভাষানুবাদ ও রতিদেবের মৃগলুব্ধ শিবপুরাণের কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি। কবিদের মৌলিক কবিত্ব ছিল মধ্যযুগের লৌকিক দেব দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনার ক্ষেত্রে। মুকুন্দ রামের চন্ডীমঙ্গলে ও বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে মানবিক রস পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতকে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্নদামঙ্গল নাগরিক কবি ও রাজসভায় লালিত ভারতচন্দ্রের বাগবৈদগ্ধ্যপূর্ণ রচনা। অন্নদামঙ্গল 'নূতন মঙ্গল' কাব্য তাতে কোন সন্দেহ নেই।ঘনরাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গল বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনার মৌলিকত্ব আছে।তবু এ কথা অনস্বীকার্য, মঙ্গল কাব্যের প্রথম যুগের সৃষ্টিসম্ভার যতটা মানবিক, শেষ পর্যায়ের মঙ্গলকাব্য গুলিতে শিল্পগুন বেশি থাকলেও অবক্ষয়িত সমাজের ছায়া থেকে সেগুলো মুক্ত নয়।

২.৮: অনুশীলনী

১। মঙ্গলকাব্য সৃষ্টির কারণ ও পটভূমি ব্যাখ্যা করুন।

২। মঙ্গল কাব্যের সংজ্ঞা ও নামকরণ বিষয়ে আলোচনা করুন।

৩। বাংলা মঙ্গলকাব্যের আঙ্গিক সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪। মঙ্গল কাব্যগুলির লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিন।

৫। টীকা লিখুন- বাংলা মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন ধারা।

৬। মঙ্গলকাব্যের যুগবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২.৯: গ্রন্থপঞ্জি

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস- শ্রী সুকুমার সেন, প্রথম খন্ড।

২. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস- শ্রী সুকুমার সেন, দ্বিতীয় খন্ড।

৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (প্রথম খন্ড) প্রথম পর্ব- ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত- ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস- ক্ষেত্র গুপ্ত।

৬. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১ম পর্যায়)- শ্রী ভূদেব চৌধুরী।

৭. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস- ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য।

৮. বাংলা সাহিত্য পরিচয়- ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

একক ৩: মনসামঙ্গল কাব্যধারার পরিচয়

বিন্যাসক্রম

৩.১ : মনসা দেবী ও মনসা নামের উদ্ভবের কারণ

৩.২ : মনসামঙ্গল কাব্যের ত্রিধারা ও কবিগন

৩.৩ : মনসা মঙ্গলের প্রথম যুগের কবিগন

৩.৪ : চৈতন্য পর্বের মনসামঙ্গল কাব্য

৩.৫ : অনুশীলনী

৩.৬ : গ্রন্থপঞ্জি

৩.১: মনসাদেবী ও মনসা নামের উদ্ভবের কারণ

মনসামঙ্গল আদি মধ্যযুগের প্রাচীনতম মঙ্গলকাব্য। ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতকের পরেও মনসামঙ্গল কাব্য লেখা হয়েছে। নিগৃহীত জাতির মর্মবেদনা যেন জীবন্ত রূপ ধরেছে চাঁদ সদাগরের বিদ্রোহী স্বভাবের গভীরে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের নানা প্রসঙ্গে চাঁদ সদাগরের কথা উল্লিখিত।শুধু তাই নয় চন্ডীমঙ্গলের বণিক খন্ডের নায়ক ধনপতি এমনকি ধর্মমঙ্গলের লাউসেন চরিত্রের পরিকল্পনাতেও চাঁদ সদাগরের চরিত্রের প্রভাব অল্পবিস্তর পরিলক্ষিত হয়।

মনসাদেবীর উদ্ভাবনের কারণ :-

অর্থশাস্ত্রে সর্পদেবতার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ঋকবেদে। এ প্রসঙ্গে মঙ্গলকাব্যের গবেষক শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, সর্প শব্দের ব্যবহার যজুর্বেদেই প্রথম পাওয়া যায়। যজুর্বেদের কাল থেকে আমরা সর্প নামক প্রাণীটির সঙ্গে প্রথম পরিচিত হই।

ভারতবর্ষে আর্যপূর্ব কাল থেকেই সর্প ভীতি ছিল। বাংলা আদিম অনার্য অধিবাসীদের মধ্যে দ্রাবিড়রা ছিল এক প্রধান শাখা। দাক্ষিণাত্যের নিম্নবর্গীয় দ্রাবিড় ভাষীদের মধ্যে সর্প পূজার ব্যাপক প্রচলন আছে। বাংলার দ্রাবিড় অধিবাসীদের কাছ থেকেই সর্বপ্রধান তিনটি ধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

১) নাগরাজ বাসুকি ও তাঁর সরীসৃপ মূর্তিপূজা বিশেষভাবে উত্তর ভারতে ও মধ্য ভারতে প্রচলিত।

২) দক্ষিণ ভারতের জীবন্ত সর্প পূজার আদর্শই প্রবল।

৩) বাংলাদেশে সর্প পূজার কেন্দ্রে আছেন নারী রুপা সর্পদেবতা জাঙ্গুলী, পদ্মাবতী, মনসা ইত্যাদি নামে এর পরিচয়। অবশ্য বাংলার পূর্ব ও পশ্চিম উভয় স্থানেই সর্প-প্রতীক পূজার রীতি আছে। এই প্রতীক হিসেবে কখনো 'মনসার ঘটে' নানা আকৃতির সর্প ফনা আঁকা হয়। কখনো ফনিমনসা গাছের ব্যবহারও দেখা যায়। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই সর্পদেবী হলেন দেবী মনসা। সর্প দেবী রূপে এই মাতৃকা মূর্তির পরিকল্পনা বাংলার সর্প পূজার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

মনসা নামের উদ্ভব :-

'মনসামঙ্গল' কাব্যের 'মনসা' নামের উৎপত্তির মূল কারণটি অজ্ঞাত। 'মনসা' নামটি সম্বন্ধে সন্ধান করে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া গেছে তা হল- দক্ষিণ ভারতে কর্ণাট অঞ্চলে এক নিম্নবর্গীয় জাতি "মনে মঞ্চমা" নামে এক সর্পিনীর পূজা করত। এই 'মঞ্চ' থেকেই মনসা নামের উৎপত্তি বলে অনুমিত হয়। আবার পাণিনির ব্যাকরণে 'মনসো নান্মী' সূত্রেও মনসা নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে,ছোটনাগপুরের সিংভূম মানভূম বীরভূম ইত্যাদি জেলা থেকে 'মনসা' নামটি বাংলায় সম্প্রসারিত হয়েছিল। কোন কোন সংস্কৃত পুরাণে 'মনসা' নামের সামান্য পরিচয় বিদ্যমান।নানা দেব ভাবনা ও রূপ কল্পনার নানা দিক-দেশাগত কাহিনীর সঙ্গে মিশে গিয়ে মনসা মূর্তির উদ্ভব হয়েছে। এমনকি বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের উপাসনা পদ্ধতিতেও মহামায়ূরী দেবী বা 'জাঙ্গুলী তারা'নামে দেবীর কথা শোনা যায়। এই প্রসঙ্গে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন-

মন্তব্য

"প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ গ্রন্থে সর্পের দেবীর বর্ণনা আছে। বৌদ্ধ গ্রন্থেই যেন সর্পের দেবীর বেশি উল্লেখ আছে। 'বিনয় বস্তু'ও'সাধনমালা'নামে দুখানি বৌদ্ধ গ্রন্থের সর্পের দেবীর স্পষ্ট বর্ণনা আছে। 'সাধনমালা'য় দেবীকে'জাঙ্গুলী' বা 'জাঙ্গুলী তারা' বলা হয়েছে। প্রাচীন যুগে সাপের রোঝাকে বলা হত 'জাঙ্গুলীক'।"প্রাচীন পুরান ও মহাভারতে যে সর্পদেবীর উল্লেখ আছে তিনি হচ্ছেন জরৎকারু মুনির পত্নী এবং আস্তিক তাঁর পুত্র। পদ্মপুরাণ, দেবী ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে মনসার উল্লেখ আছে। আর্য সমাজ ছিল পিতৃতান্ত্রিক। আর্য দেবতারা তাই প্রায়ই পুরুষ। বাংলাদেশের সর্পদেবীর এই মাতৃ-মূর্তি অনার্য সমাজ থেকেই এসেছে। বৌদ্ধ যুগের জাঙ্গি নামক দেবতা সর্প মাতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান বাংলাদেশ। সর্পদেবী মনসার ধ্যানে তাঁকে 'ফণিময়ী', 'বিষহরি'নামের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ পূর্ব কোন অরণ্য জাতির পূজিতা দেবী ছিলেন জাঙ্গুলী। তবে বাংলাদেশে সর্পদেবী বিষহরি ও মনসা নামে পরিচিত।

ড. নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, সাপ প্রজনন শক্তির প্রতীক। মূলত কৌমসমাজে প্রজনন শক্তির পুজো সর্বত্র প্রচলিত ছিল। বাংলাদেশে প্রাপ্ত মনসা মূর্তির ক্রোড়ে একটি ফল দেখতে পাওয়া যায়। কোথাও বা পূর্ণ ঘটের উপর মনসার প্রতিকৃতি আঁকা হয়। এদের প্রত্যেকটিই প্রজনন শক্তির প্রতীক। 'মুদামা' নামে এক দক্ষিণী সর্পদেবীর প্রভাব আছে মনসার নাম ও রূপ কল্পনায়।

পাল আমল থেকেই মনসা-দেবী উচ্চশ্রেণীর সমাজে স্বীকৃতি পান। সেন আমলে এই মনসা দেবীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অর্বাচীন পুরানগুলিতেও এই সময়ে মনসা নামক দেবীর পরিচয় অনার্য মনসা দেবীর আর্যীকরনের ফল।

মনসামঙ্গল কাব্য দীর্ঘকাল জনপ্রিয়তার জোয়ারে জীবিত ছিল। তার কারণ এই কাব্য ছিল অশ্রুভারাতুর মানব সংবেদ্য। অনেকদিন আগে থেকেই বাস্তুদেবতা, আরোগ্যের দেবতা ও সম্পদের দেবতা বলে যে দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল, সেই দেবীই মানুষের অনুরাগ-এর আহবানে সারা দিয়ে মনসা বা সর্পের দেবী নাম নিয়ে আবির্ভূতা হলেন কবিমানসে।

৩.২: মনসামঙ্গল কাব্যের ত্রিধারা ও কবিগন

বাংলার নানা অঞ্চলে এবং বাংলার বাইরে মনসামঙ্গল কাহিনীর অল্পস্বল্প বৈচিত্র্য আছে। দক্ষিণ ভারতের লোকসাহিত্যও মনসামঙ্গলের অনুরূপ একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। বিহারে মনসামঙ্গলের আখ্যান হিন্দি ভাষায় প্রচলিত আছে, সেটিও অনেকটা বাংলার মত, মনে করা হয় এই গুলি বাংলার প্রভাবেই পরিকল্পিত হয়েছে। বাংলায় মনসামঙ্গল কাব্যের তিনটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। এগুলি হল-

১) রাঢ়বঙ্গের ধারা:-

কবিগন : বিপ্রদাস পিপলাই, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, সীতারাম দাস, রসিক মিশ্র প্রমুখ।

২) পূর্ববঙ্গের ধারা:-

কবিগন : নারায়ন দেব, বিজয় গুপ্ত প্রমুখ।

৩) উত্তরবঙ্গ ও কামরূপের ধারা :-

কবিগন : তন্ত্র বিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল প্রমুখ।

পূর্ববঙ্গের ধারাটি ‘পদ্মপুরাণ’ নামে পরিচিত। কাহিনীর দিক থেকে উত্তরবঙ্গের ধারা একটু পৃথক ধরনের। এতে ধর্মমঙ্গলের বেশ প্রভাব রয়েছে।

৩.৩: মনসা মঙ্গলের প্রথম যুগের কবিগন

এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত তথ্য থেকে জানা যায় যে, কানা হরিদত্ত ছিলেন বাংলা মনসামঙ্গল ধারার প্রথম কবি।বিজয় গুপ্ত ছাড়া পুরুষোত্তম নামক একজন গায়েনের উল্লেখ থেকেও কানা হরিদত্তর প্রাচীনতার পরিচয় আবিষ্কার করা চলে। ইনিও শ্রদ্ধার সঙ্গে হরি দত্তের ঋণ স্বীকার করেছেন।মনসামঙ্গল কাব্যের সন-তারিখ যুক্ত প্রাচীনতম পুথির লেখক বিজয়গুপ্ত পূর্বতম কবি কানা হরিদত্ত প্রসঙ্গে লিখেছেন-

'মূর্খে রচিল গীত না জানে বৃত্তান্ত।

প্রথমে রচিত গীত কানা হরিদত্ত।।'

বিজয় গুপ্তের রচনার সময় কানা হরিদত্ত-এর কাব্য লুপ্ত যদি নাও হয়ে গিয়ে থাকে, তবু অতিপ্রাচীন হয়েছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।এদিক থেকে হরি দত্তের রচনাকে অন্তত দুই শতাব্দি পূর্বের বলে মনে করলেও সম্ভবত কানা হরিদত্ত খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত। কানা হরিদত্ত-এর রচিত মনসামঙ্গল কাব্যের পুঁথির হদিশ পাওয়া যায়নি। তবে তাঁর কাব্যের 'পদ্মা' ময়মনসিংহ জেলা থেকে সংগৃহীত হয়েছে। মনসামঙ্গলের প্রাচীনতম কবিদের মধ্যে কানা হরিদত্তর পরেই নারায়ন দেবের নাম উল্লেখ করা হয়। মনসামঙ্গল কাব্যধারার শুধু একজন সুপ্রাচীন কবিই তিনি নন, এই কাব্য ধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। নারায়নদেবের কবি প্রতিভার খ্যাতি বিস্তৃত হয় পূর্ববঙ্গের সীমা অতিক্রম করে রাঢ় অঞ্চল ও আসামে। নারায়ন দেবের পূর্ণাঙ্গ পুথি এপর্যন্ত পাওয়া যায়নি। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' সিদ্ধান্ত করেন, নারায়ণ দেব পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি। ড. সুকুমার সেনের মতে, ষোড়শ শতকের শেষ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় নারায়ণ দেব তাঁর মনসামঙ্গল কাব্যটি রচনা করেন।

৩.৪: চৈতন্য পর্বের মনসামঙ্গল কাব্য

চৈতন্যপর্বে মনসামঙ্গলের ধারাটি সবেগে চলতে থাকে। তবে ষোড়শ শতকের কবিরা ঠিক বিজয়গুপ্ত ও নারায়ণ দেবের সমকক্ষ নন। প্রথম পর্বের কবিরা (ত্রয়োদশ-পঞ্চদশ শতক) পৌরুষদৃঢ় চরিত্রচিত্রণে এবং গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে জীবনকে দেখবার চেষ্টায় কতকতা সফল হয়েছিলেন। তাঁদের কাব্যের ভাষা ছিল কর্কশ। চৈতন্যোত্তর কালের কবিরা তাঁদের কাব্যে বিভিন্ন দিক থেকে সজীবতা আনলেন-

(১) ভাষায় লাবণ্য এল

(২) চাঁদের দৃঢ় পৌরুষ এ কালের মনসামঙ্গল কাব্যে মিলল না চৈতন্যর প্রভাবে চাঁদের চরিত্র প্রথাসর্বস্ব প্রানহীন ও গতানুগতিক হয়ে গেল।

(৩) মনসাচরিত্রের হিংস্র রূপটি এ পর্বে অনেকটাই প্রশমিত ও প্রয়োজনে রচিত। বৈষ্ণবীয় ভক্তি-মনসাদেবীর হিংস্রতাকে প্রশ্রয় দিল না।

(৪) কবিরা কাহিনি বর্ণনায় ও চরিত্রটি এনে সুযোগ পেলেই ভক্তিরস আমদানি করতে লাগলেন।

১) তন্ত্রবিভূতি -

সাম্প্রতিককালে আবিষ্কৃত 'তন্ত্রবিভূতি'র মনসামঙ্গল কাব্যে কিছু বৈচিত্র্য সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রন্থকর্তার নাম বিভূতি, সম্ভবত তিনি তাঁতী ছিলেন বলেই নামের সঙ্গে 'তন্ত্র' শব্দটি যোগ করেছেন। কবি ছিলেন উত্তরবঙ্গবাসী- এই উত্তরবঙ্গে মনসা মঙ্গল কাব্যের একটা স্বতন্ত্র ধারা প্রচলিত ছিল। কাহিনীতে এবং চরিত্রসৃষ্টিতেও কিছুটা নতুনত্ব দেখা যায়। তন্ত্রবিভূতির কাহিনী এবং রচনারীতি প্রশংসনীয় হলেও এতে আদিরসের বাড়াবাড়ি নিন্দনীয়। কবি সম্ভবত সপ্তদশ শতকে বর্তমান ছিলেন।

২. জগজজ্জীবন ঘোষাল -

জগজ্জীবন ঘোষাল উত্তরবঙ্গের কবি। তাঁর আত্মপরিচয়ে জানা যায় যে, তিনি দিনাজপুরের কুচিয়ামোড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রূপ, মাতা রেবতী। তিনি সপ্তদশ শতকের শেষভাগে জন্মগ্রহন করেন বলে অনুমান করা হয়। কবি চরিত্রসৃষ্টিতে স্বাভাবিক বর্ণনায় মোটামুটি প্রতিভার পরিচয় দিলেও গ্রন্থের বহু অংশ তন্ত্রবিভূতির সঙ্গে হুবহু এক- শুধু ভণিতায়ই পার্থক্য। আদিরসের আধিক্য কবির রুচি-বিকৃতিরই পরিচয় দেয়।

৩) দ্বিজ বংশীদাস -

ময়মনসিংহ জেলার পাতুয়ারি গ্রামের অধিবাসী দ্বিজ বংশীদাস একজন শক্তিমান কবি ছিলেন। তাঁর গ্রন্থে তিনি যে কাল-পরিচয় জ্ঞাপক শ্লোক সন্নিবেশ করেছে তা প্রামাণিক হলে স্বীকার করতে হয় যে তিনি ১৫৭৫ খ্রী: কাব্যটি রচনা করেন। কবির পিতার নাম যাদবানন্দ, কবির কন্যা চন্দ্রাবতী বাঙলার প্রথম মহিলা কবি। কৰি মোটামুটিভাবে প্রচলিত কাহিনীর অনুসরণ করলেও দৃষ্টিভঙ্গির দিক্ থেকে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কাব্যে

সংঘাত যেন দেবতা আর মানবে নয়- এই সংঘাত একেবারেই যেন পারিবারিক। কাব্যের ভাষার সরলতা ও অনাড়ম্বর বর্ণনা-ভঙ্গিই তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৪) হরিদত্ত –

আদিমধ্যযুগের কবি বিজয়গুপ্ত উল্লেখ করেছেন যে হরিদত্তই প্রথম মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন এবং বিজয়গুপ্তের কালেই তাঁর রচনা লোপ পেয়েছিল । কিন্ত হরিদত্তের ভণিতাযুক্ত কিছু কিছু পদ পাওয়া যায়। তবে এই সামান্য অংশ থেকে তাঁর প্রতিভার কোন পরিচয় পাওয়া সন্তব নয়। তাঁর সমস্ত পান্ডুলিপিই ময়মনসিংহ অঞ্চলে পাওয়া গেছে বলে অনুমান করা হয় যে, তিনি সম্ভবত এই অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন।

৫) ষষ্ঠীবর –

কবি যষ্ঠীবর দত্ত সম্ভবত শ্রীহট্ট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। এঁর উপাধি ছিল ‘গুণরাজ খান'। এঁর কাব্যে ভারতচন্দ্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় বলে অনুমান করা চলে যে ইনি সম্ভবত অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন। কবির কাব্য বর্ণনাত্মক-গল্প জমিয়ে তোলার দিকে তাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিল; তাঁর রচনায় পাণ্ডিত্য এবং অভিনবত্ব পাওয়া গেলেও তেমন উল্লেখযোগ্য কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না।

৬) জীবন মৈত্র -

করতোয়া তীরে লাহিড়ীপাড়া গ্রামের অধিবাসী জীবন মৈত্র তাঁর কাব্য রচনা করেন। আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর পিতার নাম অনন্ত, মাতা স্বর্ণমালা। কবি রাজা রঘুনাথের রাজ্যে বাস করতেন।

উপসংহারঃ- মনসামঙ্গলের কবিদের কথাশেষ এখানেই। এইসব কাব্যের পুজো মন্দিরের অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ।

পূর্ববাংলার জনসমাজে মনসামঙ্গলের আবেদন এখনো অটুট। ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা মনসামঙ্গলকাব্যের কবিদের কবি পরিচয় ও কাব্য সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্য দেওয়া হল এই পর্বে।

৩.৫: অনুশীলনী

১। মনসা নামের উদ্ভবের কারণগুলি আলোচনা করুন।

২। মনসামঙ্গল কাব্যের কয়টি ধারা ও কি কি? প্রতিটি ধারা ও তাদের কবিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

৩। মনসামঙ্গল কাব্যের প্রথম যুগের কবিদের সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪। চৈতন্য পর্বের মনসামঙ্গল কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

৩.৬: গ্রন্থপঞ্জি

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস- শ্রী সুকুমার সেন, প্রথম খন্ড।

২. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস- শ্রী সুকুমার সেন, দ্বিতীয় খন্ড।

৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (প্রথম খন্ড) প্রথম পর্ব- ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৪.বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত- ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস- ক্ষেত্রগুপ্ত।

৬. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১ম পর্যায়) শ্রী ভুদেব চৌধুরী।

৭. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস- ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য।

৮. বাংলা সাহিত্য পরিচয়- ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়

একক ৪: জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল কাব্য

বিন্যাসক্রম

৪.১ : কবি জগজ্জীবন ঘোষালের পরিচয়

৪.২ : জগজ্জীবনের মনসা মঙ্গলের খন্ড ও পর্ব-বিন্যাস

৪.৩ : জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল কাহিনীর পরিচয়

৪.৪ : পুরাণকথা বর্ণনায় মৌলিকতার অভিনবত্ব

৪.৫ : জগজ্জীবনের কাব্যে সমাজ চিত্র

৪.৬ : অনুশীলনী

৪.৭ : গ্রন্থপঞ্জি

৪.১: কবি জগজ্জীবন ঘোষালের পরিচয়

কবি জগজ্জীবনের কাব্যে কৃত্তিবাস ওঝার মত বিস্তৃত ব্যক্তি পরিচয় নেই বা মুকুন্দ চক্রবর্তীর মত পৃথক কোন আত্মবিবরনীও তিনি লিখে যাননি। শুধু ভণিতাংশে বিছিন্নভাবে বংশ, গ্রাম নাম, পিত-মাতা-পত্নীর নাম উল্লেখ করেছেন। এ থেকে কবির ব্যক্তিগত পরিচয় কিছু কিছু জানা যায়। কবি লিখেছেন -

‘ঘোষাল ব্রাহ্মণ রাঢ়ী কুচিয়ামোড়ে বাড়ী

মহারাজ প্রাণনাথের দেশ।’

অথবা,

‘ব্রাহ্মণ ঘোষাল খ্যাতি কুচিয়ামোড়ে বসতি

প্রাণমহামহীপতির দেশ।'

অথবা,

'জগতজীবন কবি মনসার দাস

গ্রাম কুচিয়ামোড় যাহার নিবাস।'

অর্থাৎ তিনি ঘোষাল পদবী যুক্ত রাঢ়ী শ্রেনীর ব্রাহ্মণ। কুচিয়া মোড়ায় তাঁদের বসতি, যা মহারাজ প্রাণনাথের রাজ্যভূক্ত। আবার 'প্রাণমহামহীপতি' রাজা প্রাণ নারায়ণও হতে পারেন।

আবার, একটি পুঁথিতে (পুঁথি নং ৪৫৫ বাণিয়া ৮৭ সংখ্যক গান) উল্লেখ আছে জগজ্জীবন কুথোমী শাখার বাৎস গোত্রের লোক।

'ঊর্ধ যৌবন মুনি ভার্গোব জাম যোগিনী

আপনার এ পঞ্চ প্রবর।

কুথোমী শাখারনাম বাছগোত্র অনুপাম

গান কবি মনসামঙ্গল॥'

কিন্তু এখানে বোধ করি লিপিকর বা গায়েনের কিছু অসাবধানতা আছে। প্রসঙ্গত বাৎস গোত্রের প্রবরগুলি অনুসরণ করলে পুঁথির সঠিক পাঠ হওয়া উচিত - উর্ব-চ্যবন মুণি - ভার্গব জামদগ্নি। বিপ্রদাস তাঁর পুঁথিতে লিখেছেন যে তিনি বাৎস গোত্র কৌথুম শাখার পিপিলাই প্রবরের ব্রাহ্মণ। ইনিও পশ্চিমবঙ্গীয় মনসামঙ্গল ধারার প্রতিনিধি স্থানীয় কবি। বোধহয়, একই গায়েনরা বিভিন্ন কবির মনসা ভাসান গান গাইতে গিয়ে বিপ্রদাসের সাথে জগজ্জীবনের পরিচয় গুলিয়ে ফেলেছেন। তাছাড়া পুঁথিতে গান' কবি' কথাটুকু আছে, কোন কবি তাঁর নাম নেই। এখন কুচিয়ামোড়ে বা কুচ্যামোড়া (কোথাও কোথাও পুঁথিতে এই পাঠ পেয়েছি) বিহারের পূর্ণিয়া জেলার বারসুই খানার অন্তর্গত একটি গ্রাম - আগে যা দিনাজপুরের অন্তর্গত ছিল। প্রসঙ্গত কুচিয়ামাড়ী, কালকামোড়া, কাশিয়া মোড়া ইত্যাদি কিছু গ্রাম নামের সন্ধান পেয়েছি, যা বর্তমান উত্তর ও দক্ষিণদিনাজপুর জেলার অন্তর্তুক্ত।

বিশেষত: কুচিয়ামাড়ী বর্তমান গাজলের নিকটবর্তী ইটাহারের কাছাকাছি ৩৪ নং জাতীয় সড়কের পার্শ্ববর্তী একটি গ্রাম। যেখানে একটি বারোয়ারী মনসামন্দির আছে। তবে গ্রামটি অর্বাচীন এবং জগজ্জীবনের বসতির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। প্রসঙ্গত মালদার কাছে জগজ্জীবনপুর বলে একটি গ্রাম আছে। ইদানীং সেখান থেকে বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন মিলেছে। তবে গ্রমটি মনসামঙ্গলের কবি জগজ্জীবন ঘোষালের নামের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়।

কাব্যে উল্লিখিত তথ্য অনুযায়ী জজ্জীবনের পিতৃনাম নিয়ে দ্বিমত সৃষ্টি হয়েছে। কোথাও রূপরায় চৌধুরী।

কোথাও দ্বিজ জয়ানন্দ কবির পিতা বলে মনে হয়। কাব্যে এ সম্পর্কিত একাধিক বিবৃতি পাই –

‘ (১) ঘোষাল রসাল বংশে গণান্বিত সর্ব অংশে

রূপ রায় চৌধুরীর পুত।

জগতজীবন নাম নানা গুণে অনুপাম

রচিল পাচালি অদ্ভুত॥’

(২) ‘শিবনারায়ণ নাম লক্ষ্মীনারায়ণ অনুপাম

তার ভাই প্রাণ নারায়ণ।

তার দেশে রূপরায় তাহার নন্দন গায়

দ্বিজ কবি জগতজীবন॥’

(৩) ‘চৌধুরী রূপরায় সর্বদেশে গুণ গায়

জয়ানন্দ দ্বিজের নন্দন।

তার পুত্র ঘনশ্যাম তার কনিষ্ঠ অনুপাম

বিরচিল জগতজীবন ॥'

একজায়গায় আছে -

তার' পুত্র ঘনশ্যাম শিশু অতি অনুপাম

জয়ানন্দ রেবতি-নন্দন।'

অন্যত্র পাই -

''চৌধুরি রূপরায় সর্বদেশে গুণগায়

জয়ানন্দ দ্বিজের নন্দন।

তাহার অনুজ ভাই পদ্মার আদেশ পাই

বিরচিল জগতজীবন ॥'

এইসব ভণিতা বিশ্লেষণ করলে মনে হয় জয়ানন্দ কবির পিতা হতে পরেন। পিতা 'দ্বিজ জয়ানন্দ' এবং পুত্র 'দ্বিজ কবি জগতজীবন'। তন্ত্রবিভূতির কাব্যেও জগতজীবনের ভণিতা আছে "দ্বিজসুত", "দ্বিজমহামতি" ইত্যাদি নামে। যদি তন্ত্রবিভূতি তন্তুবায় বা তাঁতি হন তবে এই ভণিতাগুলি জগজ্জীবনকেই নির্দেশ করছে বলে সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন। সুতরাং জয়ানন্দ কবির পিতা। আবার বহু জায়গায় রূপ রায়কে পিতা বলে মনে হয় 'গাত্র কবি রূপের নন্দন', এই রূপরায় এর প্রাপ্ত উপাধি চৌধুরী''। নিশ্চয়ই কোন জমিদার প্রদত্ত উপাধি। কিন্তু কাব্যে এ সম্পর্কে বিশেষ কিছু উল্লেখ নেই। চূড়ামণি চৌধুরীদের জমিদারবাড়ী ছিল। ঘনশ্যাম চৌধুরী এদের বীজপুরুষ। কাব্যে এক ঘনশ্যামকে ভ্রাতা বা ভাতৃপ্রতিম বলা হয়েছে -

'তার পুত্র ঘনশ্যাম তার কনিষ্ঠ অনুপাম

বিরচিল জগতজীবন।'

সুকুমার সেন লিখেছেন – "ভণিতা হইতে জগৎজীবনের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। পিতামহ জয়ানন্দ, পিতা রূপ (রাম) রায় চৌধুরী, মাতা রেবতী, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঘনশ্যাম, পত্নী পদ্মমুখী"(বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ২৪৩)

আবার আশুতোষ দাস এর প্রাপ্ত পুঁথিতে আছে -

'ব্রাহ্মণ ঘোষাল রাঢ়ি কুচিআমুড়াতে বাড়ি

প্রাণমহিম নৃপতির দেশ।

জয়গুরু রূপরাত্র তাহার নন্দন গাত্র

পদ্মার পুরাণ চন্দ্রপতির আদেশ ॥

তার পুত্র ঘনশ্যাম শিশু অতি অনুপাম

জয়ানন্দ রেবতী নন্দন।

পদ্মার পাইয়া বর পদ্মমুখী প্রাণেশ্বর

বিরচিল জগতজীবন॥'

এই বিবৃতির অর্থ করলে 'রূপরায়' জগজ্জীবনের গুরু এবং শিষ্য পুত্রবৎ, তাই তিনি রূপরায় -এর 'নন্দন' আবার

রূপরায় চৌধুরীকে কবির পিতা বলে মনে করলে পিতাকে 'গুরু' বলা হয়েছে অর্থ করতে হবে। আশুতোষ দাস লিখেছেন - "সহোদর ঘনশ্যাম"। কিন্তু কাব্যে পাই এই ঘনশ্যাম "শিশু অতি" । আবার বলছেন "তার কনিষ্ঠ অনুপাম"। শিশু ঘনশ্যামের কনিষ্ঠ কি করে জগজ্জীবন হবেন তা ভাবনার বিষয়। কিন্তু এক্ষেত্রে পুথিগুলিতে কিছু লাইন বাদ পড়াতে অর্থ সংকট সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়। তবে ১ম ও ৩য় ও ২য় ও ৪র্থ লাইনকে একত্র করলে অর্থের সরলীকরণ করা যায় -

'চৌধুরী রূপরায় সর্বদেশে গুণগায়

জয়ানন্দ দ্বিজের নন্দন।

তারপুত্র ঘনশ্যাম তার কনিষ্ঠ অনুপাম

বিরচিল জখতজিবন॥'

পিতাপুত্র উভয়রেই নামের আদ্যক্ষর জাল্কহতে পারে। কবি বলতে চেয়েছেন- রূপরায় চৌধুরীর পুত্র ঘনশ্যাম চৌধুরী এবং জয়ানন্দ দ্বিজের ছেলে জগতজীবন। তবে পুথির হারিয়ে যাওয়া লাইন গুলি না মিললে এ সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে আসা যাবে না।

কবির মায়ের নাম রেবতি, এ নিয়ে কোন দ্বিমত নেই। কাব্যে পাই -

"রূচিয়া ত্রিপদি ছন্দ পাচালি করিয়া বন্ধ

গাইল রেবতির কুমারে।'

কোথাও আছে "রেবতি নন্দন", কোথাও "জয়ানন্দ রেবতি নন্দন"।

সুতরাং কবির মাতা হলেন রেবতী।

কবির পত্নী পদ্মামুখী। বহু জায়গায় "পদ্মামুখী প্রাণেশ্বর" ভণিতা ব্যবহৃত হয়েছে, উল্লেখযোগ্য একই ভণিতা তন্ত্রবিভূতির কাব্যেও পাওয়া গেছে -

উদ্ধৃতিঃ-

'মনসার পাঞা বর পদ্মুখী প্রাণেশ্বর

রচিল বিভূতি পদে গান।'

ফলে আশুতোষ দাস (সম্পাদিত তন্ত্রবিভূতির পদ্মাপুরাণ) পদ্মমুখীকে তন্ত্রবিভূতির স্ত্রী বলেছেন। কিন্তু উভয়ের স্ত্রীর একই নাম ছিল এমন ভাববার কারণ নেই।

দ্বিতীয়ত: আশুতোষ বাবু জগজ্জীবনের কাব্য সম্পাদার সময় পদ্মমুখীকে জগজ্জীবনের স্ত্রী বলেছেন।

তৃতীয়ত: তন্ত্রবিভূতি কোথাও নিজের আর কোন বংশ পরিচয় দেননি অথচ কেবল স্ত্রীর নাম উল্লেখ করবেন এমন ভাবনা অমূলক। এ প্রসঙ্গে সুকুমার সেন বলেছেন – "বণিক

খন্ডের অধিকাংশ যে জগৎজীবনের রচনা তা বোঝা যায় বিভূতির সঙ্গে 'পদ্মমুখী'র উল্লেখে। পদ্মমুখী ছিলেন জগজ্জীবনের পত্নী।

সুতরাং বলা যায় আত্মপরিচয়ে কবি জগজ্জীবন স্বল্পবাক্। তাঁর কাব্য থেকে তাঁর বংশ, গ্রাম, পিতা-মাতা,পৃষ্ঠপোষক ও পত্নীর নাম পেয়েছি যা থেকে তাঁর ব্যক্তিপরিচয়ের একটা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তৈরী করা যায়।

কাব্য রচনা কাল- কবি জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলের কোনো পুথিতে কালাঙ্ক সূচক কোনো পদ পাইনি। কিন্তু কাব্যের ভণিতাতে তিনি কয়েকবার প্রাণনারায়ণ, প্রাণনাথ, দুর্গাচন্দ্রপতি, ঘনশ্যাম ইত্যাদি ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছেন, যার সাহায্যে কবির কাল সম্পর্কে একটা অনুমান করা যায়।

সুকুমার সেন রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় জগজ্জীবনের কাব্যের একটি পুথির লিপিকাল ১১০২ সাল বলে উল্লেখ করেছেন (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড, আনন্দ, পৃ. ২৪৩)। আশুতোষ দাস জগজ্জীবনের পুথি সম্পাদনার ভূমিকা অংশে লিখেছেন - "১৩১৪ সালের রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রাচীন গ্রন্থাবলীর বিবরণ প্রসঙ্গে পুথি পরিচয়ে জগজ্জীবনের পুথিটির লিপিকাল ১১০২ বঙ্গাব্দ (১৬৯৫ খ্রী.) উল্লেখ আছে। ঐ পুথিতে কালিদাস নামক এক মনসামঙ্গলের কবির চারটি ভণিতা থাকায়, অপরের ভণিতামুক্ত জগজ্জীবনের মূল পুথিটির লিপিকাল, নিশ্চয়ই আরো পূর্ববর্তী মনে হয়"। কালিদাসের গ্রন্থ রচনারকাল ১৬৯৭ নির্ণয় করে সম্পাদক অধ্যাপক দাস জগজ্জীবনের কাব্যকাল "সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধের শেষাংশ" বা ১৬৮৭-১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দ বলে সিদ্ধান্তে এসেছেন। পুথিটি কবির স্বহস্তে লিখিত, এমন উল্লেখ কোথাও নেই। এই তথ্যকে মেনে নিলে বলতে হয় জগজ্জীবন অবশ্যই সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যপর্বের কবি।

৪.২: জগজ্জীবনের মনসা মঙ্গলের খন্ড ও পর্ব-বিন্যাস

আশুতোষ দাস মহাশয় জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল-এর সম্পাদিত-পাঠ প্রস্তুত করেছেন দুটি খণ্ডে বিভক্ত করে। দেবখণ্ড আর বানিয়া খণ্ড। আমরা পুথির পাঠ নিবিড়ভাবে অনুসরণ করে কাব্যটির বিন্যাস সংক্রান্ত কিছু নতুন ভাবনায় উপনীত হয়েছি। আমাদের প্রস্তাব

কাব্যটিকে দেবখণ্ড আর বানিয়াখণ্ড- এই দুইভাবে নিশ্চয় বিভক্ত করা সম্ভব। তবে দেবখণ্ড ও বানিয়া খণ্ডকে কয়েকটি পর্বেও বিভক্ত করা সম্ভব। যথা :

দেবখণ্ড : হর গৌরী মিলন পর্ব

পার্বতী মনসা দ্বন্দ্ব পর্ব

কপিলা ও মন্থন পর্ব

বানিয়াখন্ড: পাটন পর্ব

বিবাহ পর্ব

দংশন ও ধন্বন্তরী বধ পর্ব

ভাসান পর্ব

স্বর্গ পর্ব

উজান ও বাদ উদ্ধার পর্ব

কেন আমরা এই পর্ব বিন্যাস করতে চাই সে প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করছি।

হর-গৌরীর মিলন মনসামঙ্গলের ভূমিকা স্বরূপ। এ অংশের মূল বিষয় সৃষ্টি বিবরণ। বিবরণটি অত্যন্ত মৌলিক। বাংলার অন্য কোনো কাব্যধারায় এই নিজস্ব পুরাণ-প্রসঙ্গ নেই। ধর্মমঙ্গল, শূন্যপুরাণ, অনিল পুরাণের সঙ্গে কতকাংশের তুলনা চলে। একে স্বতন্ত্র পর্ব হিসেবেই গণনা করা উচিত।

পার্বতী-মনসা ছন্দ পর্বটিকেও স্বতন্ত্র পর্ব বলতে হয়। মনসাকে জন্ম দেওয়া, পান পাতার মতো "পাতন" করে করপিডতে করে এনে লুকিয়ে রাখা প্রভৃতির মাধ্যমে সতীন-সমস্যা, সামাজিক পরিস্থিতি দেবতার ছদ্মবেশে চমৎকার পরিবেশন করেছেন জগজ্জীবন। উক্ত পর্বটি শেষ হচ্ছে এইভাবে।

'নানা দুঃখে পদ্মাবতী রয়া গেল তথা।
কপিলা মায়ের কিছু কহি তত্ব কথা।।'

পরের গানটির শুরুতেই জগজ্জীবন লিখছেন :

"গঙ্গা দুর্গা রহিলেন সাগরের পার।

কপিলা মায়ের গীত হইল প্রচার।।'

কপিলার কাহিনী সমুদ্র মন্থনের ভূমিকা। এর শেষ ফল গরলের জন্ম । বাংলার পুরাণ-ভাবনা অমৃত মোক্ষণ করার পরবর্তী "দু অজ মথন" শেব্দটি বিপ্রদাস পিপিলাই ব্যবহার করেছেন)-কে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। ফলে নাগ-কাহিনীর ভূমিকা হিসেবে পর্বটিকে আলাদা গুরুত্ব দিতে হচ্ছে।

কপিলা ও মন্থন পর্বের শেষে ১-নং পুথিতে স্পষ্ট লেখা হয়েছে__ইতি দেবখণ্ড সমাপ্ত'। একইভাবে পরের বানিয়া খণ্ডের সূচনায় পাচ্ছি__ "অথ বানিয়া খণ্ড লিখ্যতে' ৫১- নং পুথি ; পশ্য __ পাদটীকা ২.১.১-এর ১ নং পাঠান্তর)

বানিয়া খণ্ডের প্রথমে পর্বের শেষে আছে__ "ইতি চান্দর বুহিতাদি পাটন খণ্ডর সমাপন হৈল। পাটন খণ্ড ।" (২.৫.৬.- এর ৩ নং পাদটীকা)। পাটন পর্ব __ প্রস্তাবের এই স্পষ্ট কারণ।

বিবাহ পর্বটকে আমরা বিন্যস্ত করলাম কারণ দংশন ও তার ফল অন্রান্তভাবে নিজের পক্ষে আনার জন্য মনসা এখানে সক্রিয়। অন্য মনসা মঙ্গলে ধন্বন্তরীবধ প্রসঙ্গ এই অবসরে নেই। আছে, চাদের সঙ্গে মনসার দ্বন্দের প্রথম দিকে। ধরন্বন্তরী প্রসঙ্গ বিশেষ নাটকীয় ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন জগজ্জীবন ঘোষাল। তার পালার শেষে সুস্পষ্ট ভণিতা আছে:

জগত' জীবন কবি বুদ্ধে বিশারদ।

রচিল পুরাণ মধ্যে ধন্বন্তরী বধ।।'

এই ধন্বন্তরী বধ পালাটি শিকলি জাতীয় রচনা। কপিলা-র প্রসঙ্গের মতো। জগজ্জীবন সেটির আসরের দিকে চেয়ে লিখেছেন। বিবাহ পর্বকে ধর্বন্তরী বধ পর্বের সঙ্গে মেশানো যায় না। ভাসান পর্বকেও পৃথক করার যুক্তি এখানে নিহিত।

স্বর্গপর্ব আসলে স্বর্গ যাত্রা পর্ব। বাংলার নিজস্ব পুরাণ চেতনায় স্বর্গ কিন্তু হিমালয় সন্নিহিত নয়। বাঙালির স্বর্গ সমুদ্র-সন্নিহিত। বেহুলার ভাসান যাত্রা ভাটি প্রবাহে ক্রমশ স্বর্গের প্রতি স্বয়ন্প্রবাহিত। নানা বাধা বিপত্তি, জল বাটোয়ার, নষ্ট চরিত্রের অলস পুরুষ থেকে আর্ত করে ঘাটোয়াল দানী__ কত যে বাধা এই পথে। সমস্ত বাধা অতিক্রম করে স্বর্গের ঘাটে উপস্থিত হলেন বেহুলা। সেই ঘাট নেতা ধোপানীর ঘাট :

'ভাসিতে ভাসিতে কন্যা গেল ভাটি ঘাটে।

নেতেলা কাপড় ধোয় সুবর্ণের পাটে।।'

এই পর্ব শেষ হচ্ছে মনসার কৃপায় সমস্ত সম্পদ নৌকা ছয় ভাসুর আর লখিন্দরকে নিয়ে বেহুলার ফেরৎ আসার সূচনায়।

স্বর্গপর্বের পরবর্তী পর্ব উজান ও বাদ উদ্ধার বলে আমরা চিহিতি করেছি। প্রকৃতপক্ষে গানের পরই কাব্য শেষ। কবির ভণিতা :

'জগত জীবন কবির মধুরস বাণী।

বদন ভরিয়া সভে বলো হরি ধ্বনি।।'

পরের গানটি অষ্টমঙ্গলা। কাহিনীর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ। উক্ত নয় পর্বে বিন্যস্ত করলে জগজ্জীবনের কাহিনী পরিবেশনের তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্যটি পাঠকের মনে স্পষ্ট হবে বলে আমাদের ধারণা ।

৪.৩: জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল কাহিনীর পরিচয়

উত্তরবঙ্গে আজও মনসাভাসানে জগজ্জীবলের কাব্য গান করা হয়। অতি জনপ্রিয়তার কারণে কবির কাব্যের নকল হয়েছে অসংখ্য। আসরে গাইতে গিয়ে গায়েনদের দ্বারা সংযোজন-বিয়োজন বা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জগজ্জীবনের কাব্যের কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে। বিশেষতঃ কবির স্বহস্তলিখিত পুথি যখন পাওয়া যায়নি, তখন কাব্যের আদল যে হুবহু রক্ষা পায়নি তা ধরে নেওয়া যায়।

জগজ্জীবন অতি জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর কাব্য সাধারণ মানুষের পাঠযোগ্য, অতি সরল কাব্য। তিনি মনসামঙ্গল কাহিনীর আদ্য-প্রান্ত বর্ণনা করেছেন। বেহুলা-লখিন্দরের জনপ্রিয় গল্প তাঁর হাতে পরিপূর্ণতা পেয়েছে। তুলনায় কবির লেখা দেবখন্ড অনেক সংক্ষিপ্ত। আছে কয়েকটি বন্দনা। মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত প্রথা অনুসরণ করে এই বন্দনা দিয়েই জগজ্জীবনের কাব্য শুরু হয়েছে।

কাব্য-পুথিতে গণেশ, গঙ্গা, সরস্বতী, কালি, নারদ, সর্বদেব-দেবী ও বেড়াবন্দনা নামে 'আসর বন্দনা' পেয়েছি। গণেশ, গঙ্গা, কালি ও নারদ বন্দনা পড়লে কবির প্রতিভার স্পর্শ অনুভব করা যায়। বন্দনাতে পৌরানিক প্রসঙ্গ ও পান্ডিত্যই প্রধাণ। কবি গণেশ বন্দনায় লিখেছেন –

'অঙ্গে যজ্ঞ ফোটা দোলে আভরণ মনি জ্বলে

সুবর্ণ কুঞ্জর বদন।

রজত নির্মিত সুন্ড সিরে সোভে শশী খন্ড

বিচিত্র মোকুট সুশেভন॥'

কালি বন্দনায় দেবী কালিকার বিভৎস ভয়াল রূপ সুন্দর ফুটে উঠেছে -

উলমস্ত' করিয়া ভেশ আউলাইয়া মাথার কেশ

শঙ্গে ফিরে শ্রকালি গিধিনি।

জিভা লহু লহুকরে রাইকশ্য পলায়ে ডরে

দেখিয়া কাতর দেবমনি ॥'

গঙ্গা বন্দনায় গঙ্গার পৌরানিক প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু পুথি ছিন্ন হওয়ায় সব শব্দ উদ্ধার করা যায়নি। নারদ বন্দনা কবিজগজ্জীবনের এক বিশেষ সৃষ্টি।

দেবখন্ডের কাহিনী পৌরানিক প্রসঙ্গে পরিপূর্ণ। আছে সৃষ্টি তত্ত্বের কথা - অনাদি ঈশ্বর ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও ধর্মের সৃষ্টির কথা পাই। ধর্মের নিঃশ্বাস থেকে মনসা জন্মালেন। ধর্মের

সঙ্গে তাঁর বিবাহ হল। ধর্ম দেহ-ত্যাগ করলেন। মনসা সতী হলেন। পুনরায় তিনি অগ্নি থেকে জন্মালেন, লোহার মঞ্জুসে তাঁকে ভাসালো হল। তিনি হেমন্ত মেনকার গৃহে গৌরী বূপে আবির্ভূতা হলেন। ওদিকে শিবের মদন দহন, কামের জাগরণ হল। শিব মালঞ্চ সৃজন করে তাতে কর্ষন করলেন। পার্বতী দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করলেন। শিব মালঞে দেবীর পুষ্প চয়নের প্রস্তাব এলো, হেমন্ত অগত্যা সম্মত হলেন, হাতে ফুলসাজি নিয়ে সিংহপৃষ্ঠে দেবী মালঞ্চে গেলেন, বৃষপৃষ্ঠে মহাদেবের আগমন ঘটল, হরগৌরীর মিলন হল। সিংহ ঋষির কাছে নালিশ করলে দেবীকে নানা কৈফিয়ৎ দিতে হল। গঙ্গার কাছে নারদ নালিশ করলে গঙ্গানন্দন ডাকুর মহানন্দের রোষ হল- দেবীকে জলে নিমগ্না করার চেষ্টা হল। হেমন্তের 'কয়ালী বন্দীকরণ', কয়ালীর স্বরূপ উদ্ধার, শিবের বিবাহ প্রস্তাব, শিব-পাব্বতীর বিবাহের উদ্যোগ, নারদের অধিবাস, দ্রব্যসহ যাত্রা, শিবের বর বেশে যাত্রা, বর বরণ, মেনকার মুচ্ছা, হেমন্তের বিপরীত দর্শন। বিয়ে-যজ্ঞ-কন্যাবিদায়, বাসর, গঙ্গা গৃহে শিবের রাত্রি যাপন। গঙ্গা-দুর্গার কোন্দল, শিবের মালঞ্চ যাত্রা, যাত্রা পথে মনসার জন্ম, শিবকে দুর্গার ছলনা, গণেশের জন্ম, কার্তিকের জন্ম, মনসার রূপে শিবের আসক্তি, মনসাকে করন্ডীতে করে নিয়ে শিবের কৈলাসে গমন, মনসার চক্ষুনাশ, দুর্গাকে মনসার দংশন, শিবের অনুনয়ে জীবনদান, গঙ্গা-দুর্গার গৃহত্যাগ। কপিলা উপাখ্যান, কালকূট বিষে শিবের মৃত প্রায় অবস্থা, গঙ্গা-দুর্গার প্রত্যার্পণ, মনসার শিবকে জিয়ান, জরৎকারুর সঙ্গে মনসার বিয়ে, মনসাকে পরিত্যাগ, আস্তিকের জন্ম, দেবীর রাখালদের পুজা লাভ, জালো-মালোর পুজা লাভ - জগজ্জীবনের কাব্যের দেবখন্ডের এখানেই সমাপ্তী।

জগজ্জীবনের মনসামঙ্গলের বণিক খন্ড শুরু হযেছে “অথ বাণিয়া খন্ড লিখ্যতে" দিয়ে। বাণিয়া খন্ডের সম্পূর্ণ কাহিনীটিই মনসা ও চাঁদের বিরোধ ও পূজা লাভের প্রচেষ্টার গল্প। সেই সঙ্গে স্থান পেয়েছে বেহুলা-লখিন্দর প্রসঙ্গ। কোটীশ্বর ও কলাবতীর শিবকৃপায় চন্দ্রপতির জন্মবৃতান্ত দিয়ে কাহিনীর সূচনা। শিবভক্ত চাঁদের ১৬ বছর বয়সে সনক সাধুর কন্যা সনকার সঙ্গে বিয়ে হয়, তাদের ছয় ছেলে। পদ্মাবতী শিবের কাছে আবদার করলেন যেন চন্দ্রপতি মর্ত্যে মনসা পুজা প্রচার করেন। শিবের আদেশে সত্ত্বেও এই প্রাস্তাব চাঁদ প্রত্যাখ্যান করলে অপমানিত মনসা নেতার সঙ্গে পরামর্শ করলেন। নেতা মনসাকে সন্ধি

প্রস্তাব সহ চাঁকে পুনরায় অনুরোধ করতে বললেন। চাঁদ হেমতালের লাঠি দিয়ে বিতাড়িত করলেন দেবীকে। মনসা চাঁদের ছয়পুত্রকে হত্যা করলেন। পুত্রদের শবদেহ তাড়কা রাক্ষসীকে দিয়ে মায়া করিয়ে মনসা চুরি করালেন। চাঁদ বানিজ্যে চললেনতার , বিস্তৃত বিবরণ আছে জগজ্জীবনের কাব্যে। মনসার চক্রান্তে রাজা লঙ্কেশ্বর দক্ষিণ পাটনে চাঁদকে বন্দী করলেন। ফেরার পথে সাধুর ১৪টি বানিজ্যতরী কাঁকড়ার জলে মনসা ডুবিয়ে দিলেন। বহু কষ্টে সাধু প্রাণে রক্ষা পেয়ে ঘরে ফিরলেন। আবার নেতার পরামর্শে ধন্বন্তরীর বরে সনকা ও মেনকার গর্ভে অনিরুদ্ধ ও ঊষা যথাক্রমে লখিন্দর-বেহুলা হয়ে জন্মালেন। এ প্রসঙ্গে সর্গের সভা ও উদার নৃত্য-সজ্জার সুন্দর বর্ণনা আছে। সনকাকে পুত্রবর দেবার কালে ধন্বন্তরি সাবধান করেছিলেন মনসাপূজা না করলে বিবাহ রাত্রিতে পুত্রের মৃত্যু যোগ আছে। তাই সনকা পুত্রের বিয়ে না দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিনে। নেতার পরামর্শে মনসা 'কামসোনা'কে দিয়ে লখিন্দরকে উত্তেজিত করালেন। মাতুলানী কৌশল্যাকে দেব চক্রান্তে লখিন্দর বল প্রয়োগে হেনস্থা করলেন। জগজ্জীবনের কাব্যে তার অবাধ বর্ণনা আছে। চাঁদ সদাগর পাত্রীর খোঁজ করতে বের হলেন পুত্রের জন্য। বহু বিবেচনার পর তিনি বাছো সদাগরের বেটি বেহুলাকে নির্বাচন করলেন। মহা সমারোহে উভয়ের বিবাহ হল। জগজ্জীবনের কাব্যে বিস্তৃত আকারে এই রাজসিক বিবাহের খুঁটিনাটি বর্ণনা পাই। বিয়ের আসরে ভয়াল সর্পরূপ দেখে লখিন্দর মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। বেহুলা মনসাপুজা করে লখিন্দরকে পুনঃজীবিত করলেন। নেউল-মূয়রী-ওঝা-ধন্বন্তরি ও প্রচুর প্রহরীসহ লোহার বাসর ঘর বানিয়ে চাঁদ নিরাপদ বাসরের আয়োজন করলেন। কিন্তু মনসার চক্রান্তে বিশ্বকর্মা লোহার বাসরে সূচীছিদ্র রেখে গেলেন। বেহুলার বাসরের সুন্দর বর্ণনা করেছেন কবি। স্বামী-স্ত্রীর উক্তি, প্রত্যুক্তির মধ্যে বহু শাস্ত্র কথা, নীতি ও শিষ্ঠাচারের ইঙ্গিত আছে। বাসরে কাল নাগিনী প্রবেশ করে লখিন্দরকে দংশন করল, বালা প্রাণ হারাল। বেহুলা সাপটিকে বন্দি করে রাখল। পদ্মাবতী বালার প্রাণ নিজ হেফাজতে রাখলেন। ওঝা ধন্বন্তরি লখিন্দরের প্রাণ ফেরানোর জন্য ওষুধের সন্ধানে চললেন। মনসা ধন্বন্তরীর শিষ্যদের গোয়ালিনী বেশে ছলনা করে বিষ দধি খাইয়ে দিলেন। ওঝা-মন্ত্র পড়ে জল সিঞ্চন করে তাদের প্রাণ ফেরালেন। ধন্বন্তরীর স্ত্রীর সঙ্গে সখ্যতা করে মনসা ওঝার মৃত্যু রহস্য জেনে নিয়ে তক্ষক সাপের দ্বারা মূলকল্পে দংশন করালেন। অনেক প্রচেষ্টা

সত্ত্বেও ওঝাকে বাঁচানো গেলনা। লখিন্দরের পুনর্জীবিনের সব সম্ভাবনা নির্মূল হলে বেহুলা সে দায়িত্ব নিতে চাইলেন। তিনি ছয় মাসের সময় নিয়ে মৃত স্বামীর সঙ্গে কলার ভেলায় ভেসে চললেন। বেহুলার জলযাত্রার নিখুঁত বিবরণ আছে জগজ্জীবনের কাব্যে। সুন্দরী স্ত্রীলোক দিনে রাতে একাকিনী কিভাবে মৃত স্বামী নিয়ে ঘাটে ঘাটে লম্পট-তস্করদের সাথে লড়াই করে দেবী মনসার সহায়তায় শেষে নেতা ধোপিনীর সাক্ষাৎ পেল, কবি জগজ্জীবন তা করুণ রসাত্মক ভাবে বর্ণনা করেছেন। নেতা বেহুলাকে শিব সকাশে নিয়ে গেলেন। বেহুলা নৃত্যে সন্তুষ্ট করলেন মহাদেবকে। শিব মনসাকে লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে বললেন। মনসা সভার মাঝে অভিযোগ অস্বীকার করলেন যে তিনি লখিন্দরকে হত্যা করেছেন। বেহুলা সাপুড়ায় বন্দী নাগকে উন্মুক্ত করে দিলেন। কালনাগিনী বেহলার সপক্ষে সাক্ষী দিলো। ত্রিবেনির ঘাটে অস্থি ধুয়ে মনসা লখিন্দরকে পুনজীবিত করলেন।

লখিন্দর জীবিত হয়ে নটিনী বেহুলাকে বিষম তিরষ্কার করলেন। দেবগন লখিন্দরকে সত্য তথ্য দিয়ে শান্ত করলেন। বেহুলা ছয় ভাসুর ও চাঁদের চৌদ্দডিঙ্গা ফেরৎ চাইলেন এবং প্রতিশ্রুত হলেন যে তিনি দেশে ফিরে মনসা পুজা করাবেন। দেবী বেহুলাকে ধন-জন সব ফিরিয়ে দিলেন। মহানন্দে সকলকে নিয়ে বেহুলা চম্পাবতী ফিরে এলেন। সকালে জানাজানি হলে সনকা ঘাটে ছুটে এসে পুত্রদের মুখ দেখলেন। বেহুলার সঙ্গে সমস্থ দেবতারা চাঁদকে মনসা-পূজা করতে বললেন। চাঁদ সম্মত হলেন। মন্দির নির্মাণ করে সদাগর মনসা পূজা করলেন। ঊষা-অনিরদ্ধকে ইন্দ্রের রথ স্বর্গে ফিরিয়ে নিতে এলো। তার আগে বেহুলা স্বামীর সঙ্গে মেড় ঘর দেখতে গেলেন। ছয়মাসের পুরনো অন্ন-ব্যঞ্জন যেমনকার তেমনই আছে। শিয়রে প্রদীপও জ্বলছে অমলিন। দেখে বেহুলা নিজের সতীত্বের বড়াই করলেন। চাঁদএর পরিবারের সবার কাছ থেকে বিদায় নেবার আগে বেহুলা মা-বাবার সঙ্গে দেখা করে এলেন। তারপর কাষ্ঠাগ্নিতে নরতনু বিসর্জন দিয়ে বেহুলা-লখিন্দর স্বর্গের ঊষা-অনিরুদ্ধ হয়ে স্বর্গে ফিরে গেলেন। জগজ্জীবনের কাব্য সমাপ্ত হল।

৪.৪: পুরাণকথা বর্ণনায় মৌলিকতার অভিনবত্ব

জগজ্জীবনের মনসামঙ্গলের পুরাকথার বেশ কিছু অভিনব উপাদান আছে। বিশেষত তাঁর সৃষ্টি-বর্ণনা অর্থাৎ Creation Myth যথেষ্ট মৌলিক। কোন্ সুত্রে তিনি এই পুরাকথা পেয়েছেন জানা কঠিন।

মনসা বা কেতকীর নানারূপে পিতৃকল্প ধর্মের এবং ধর্মের পুত্র শিবের সঙ্গে মিলিত হবার যে কাহিনি রচনা করেছেন জগজ্জীবন তা অত্যন্ত প্রাচীন পরম্পরা। পরবতী কয়েকটি অনুচ্ছেদে এ নিয়ে সামান্য আলোচনা করছি।

আদিতে সব জলময় ছিল। এই সুত্র পৃথিবীর অধিকাংশ পুরাকথাতেই আছে। এসময় বিমূর্ত 'অঙ্গুষ্ঠ' প্রমাণ অনাদি ঈশ্বর বটপত্রে ভেসে যাচ্ছিলেন। তাঁর ইচ্ছা হল সৃষ্টি করবেন। নিজেকে তিনি ধর্মে রূপান্তরিত করলেন। বাংলার নিজস্ব পুরাকথা এটি। ধর্মমঙ্গল কাব্যধারায় এর সামান্য যুক্তিযুক্ত বিবর্তন লক্ষ করি। সেখানে আছে শূন্য নিরঞ্জন ধর্ম, ধর্ম নিরঞ্জন রূপে নিজেকে গড়লেন। স্বয়ম্ভূ তিনি। চৌদ্দ ভূবন অন্ধকার। সবই জলময়। ফলে তাঁর দুঃখ হল। দুঃখজনিত শ্বাস থেকে জন্ম নিল উলূক পক্ষী । সৃষ্টির আদিতে পাখির প্রসঙ্গ অন্যত্র বহু পুরাণকথায় আছে। জগজ্জীবন ধর্ম ঠাকুরের কথা লিখেছেন। তঁর কথায় ধর্ম চার ভাইকে সৃষ্টি করলেন এবার। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আর অনিল। অনিল প্রসঙ্গটি তিনি খুব সম্ভব ধর্মমঙ্গল ঐতিহ্য থেকে পেয়েছেন। দীর্ঘশ্বাস থেকে তাঁর উলুক পক্ষী হয়নি এখানে- হয়েছে বাতাস। অনিলের সঙ্গে ধর্মের সামান্য বিতর্ক দিয়ে কাহিনি সূচনা হয়েছে। ধর্ম নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছেন এই উক্তি শুনে তাঁর ক্ষোত। এহল ঈশ্বরকে অপমান। সুতরাং তাঁকে অভিশাপ দিতে চাইলেন তিনি।

'অনিলে বোলেন ভাই কি করছ এই ঠাই ধর্ম সে গুরু নিন্দা করে।

ধর্মকে দিয়া শাপ খণ্ডিবে মনের তাপ চলহ আপনার ঘরে।।'

সে অভিশাপের ফলে ধর্ম ঠাকুর মৃত্যুবরণ করবেন। তাঁর শরীর-

'মড়া পচা হা ভাদিযা যবে নীরে।

লাগবে পাও পাকা তুমার শরীরে।।'

অনিল-এর আর তেমন কোনো বিকাশ মনসামঙ্গলে নেই। মনসাকে প্রথমে জগজ্জীবন লিঙ্গ চিহ্নহীন করে দেখিয়েছেন।

'নাই স্ত্রী নাই বর না জানিয়া বস্ত্রধর

নপুংসক হৈয়া হৈল জন্ম।'

ধর্ম ঠাকুর তাঁর ভগদেশে নখের রেখা দিলেন। সেই হল আদি নারীর চিহ্ন 'সেই পথে স্রাব রক্ত চলে'। কন্যার রূপ দেখে ধর্ম মুহ্যমান অচেতন। তাঁকে বিয়ে করতে চান তিনি। মনসা রাজি নন ('কুমারী হরিলে হবে নরকে বসতি')। ধর্ম কৌশল করে তাঁকে পুত্রদের অনুমতি নিয়ে বিয়ে করলেন।

বিবাহের পর তাঁর পুংলিঙ্গ দেখে ভীত মনসা, তা দেখে 'অষ্টাঙ্গুল প্রমাণ' লিঙ্গ ছিন্ন করেন ধর্মঠাকুর। তারপর সেই অর্ধছিন্ন মুষ্ক ধর্ম মনসাকে আলিঙ্গন দিতে গিয়ে শরীর খারাপ হল তাঁর।

'স্বলন হইল রেত বদন হইল শ্বেত

নয়ান হইয়া গেলো গোল।'

বস্তুত নপুংসক ছিলেন মনসা, ধর্মও নপুংসক-প্রায় হলেন। এর পিছনে সুপ্রাচীন অতীত কালের নপুংসক-পৌরোহিত্যের (eunuch priestship-এর) পরিচয় থাকা সম্ভব। যাই হোক মনসা রতিক্লান্ত, ধর্মঠাকুর মৃত্যু বরণ করলেন।

'তেজিয়া মনসা সতী সৃষ্টির অধিপতি

করে প্রভু মরণ উপায়।'

অনিলের অভিশাপ সত্য হল।

শিব ধর্মঠাকুরকে বিধিমতো সংস্কার করলেন। সঙ্গে থাকলেন ব্রহ্মা ও বিষ্ণু। ইতোমধ্যে তাঁরা কাঁদছেন দেখে ধর্ম তাঁদের সান্ত্বনা দিলেন।

‘পুত্রের ক্রন্দনে ধর্মের হইল চেতন।

না কান্দ না কান্দ মোর পুত্র তিনজন॥’

অভিশাপ সত্য করার জন্যই তাঁকে মরতে হয়েছে। তবে তিনি রূপান্তর গ্রহণ করবেন। মহেশ্বরের শরীরে তাঁর সত্তা সঞ্চারিত করবেন তিনি। ‘তানে’ যেমন নানাভাবে তাঁর কন্যাকে স্ত্রী হিসেবে পেতে চেয়েছেন মাওরি পুরাকথায় এখানেও তেমনি ব্যাপার ঘটল। শিবকে বললেন ধর্ম:

‘এক কথা কহি না করিহ উপহাস।

মুখ মেল সত্বরে উদরে দেহ বাস ॥’

শিব মহা বিস্মিত ‘ইহা নাকি হয়’। ধর্ম বললেন ‘বাপু মিথ্যা কথা নয়’ প্রস্তাব তাঁর- ভবিষ্যদ্বাণী :

‘তুমি আমি অর্ধ অঙ্গ হইব শূলপাণি।

মনসা কামিনী হবে তোমার ঘরণী ॥’

তাই হল। মনসা জেগে উঠলেন। ধর্ম নেই। পুত্রদের কাছে গিয়ে জানলেন সব। শিব তাঁকে সতী হতে বললেন। চিতা প্রদক্ষিণ করে দেবী আরোহণ করলেন অগ্নি-মঞ্চে। কিন্তু সেই চিতার ভস্ম থেকে একটি নবজাত কন্যার কান্না শোনা গেল-

‘উঁহা চুহা করিয়া মনসা কাঢ়ে রাও ।

অনলের মধ্যে হইল তিন দিনের ছাও॥’

লোহার মঞ্জুষ বানিয়ে নবজাতিকাকে ভাসিয়ে দেওয়া হল। সমুদ্রতীরে অপুত্রক হেমন্ত ঋষি তাঁকে নিয়ে গেলেন। রূপান্তরিত মনসাই হেমন্ত ঋষির কন্যা পার্বতী হিসেবে বড় হলেন।

আদি পুরুষ আর আদি দেবীর এই বিচিত্র সম্পর্কের বিন্যাস মনসা মঙ্গলের পুরাকথার অভিনব বৈশিষ্ট্য। এযেন তাঁদের কাছে আসা আর দূরে সরে যাওয়া।

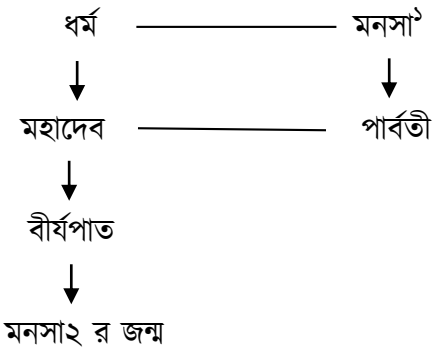

মনসা১ আদি দেবী। মহাদেবের মাতৃস্থানীয়া। মনসার রূপান্তরিত হওয়া পার্বতী তাঁর ভগিনী স্থানীয়া। ধর্মের অর্ধঅঙ্গ শুলপাণির শরীরে প্রবিষ্ট হওয়ায় পার্বতী শিবের কন্যাস্থানীয়া । মহাদেব পুস্পবনে বীর্যপাত করার ফলে মনসার জন্ম হল। এই মনসা মহাদেবের কন্যা স্থানীয়া। এই পুরাকথার মৌলিক অভিনবত্ব সুদূর অতীত সমাজের চিত্র বহন করছে।

কিছু কিছু প্রসঙ্গ জগজ্জীবন অভিনবভাবে উপস্থাপিত করেছেন। কয়েকটি সূত্র ক্রমান্বয়ে লিখব।

১. **ইন্দ্র-বসুমতীর বিবাহ:** বিন্ধ্য পর্বতের উপরে মহাদেবের মালঞ্চ গড়ার সময় লাঙ্গল দিয়ে পৃথিবীর উপর চাষ দিতে যাবেন, বসুমতী দেখা দিয়ে তাঁকে বললেন :

‘ধর্মের দেহাই লাগে ধর্মের মাথা খাঅ।

অকুমারী বসুমতীতে লাঙ্গল না লাগাঅ ॥’

শিব ইন্দ্রকে ডেকে বসুমতীর সঙ্গে বিবাহ দিলেন। দুজনের মাথায় পল্লবের জল ছেটানো হল। কাপড়ে বাঁধা হল ‘লগ্ন জাটি’ বিষয়টি পুরাণপ্রসিদ্ধ শচী-ইন্দ্রের ধারণাকে সচকিত করে। তবে ‘ইন্দ্রধ্বজ' ব্রত, ইঁদ পরব, বাঁশ পূজা, মদনকাম প্রভৃতি পূজা ব্রতের সংবাদ থেকে এ বিষয়টি নিতান্ত আরোপমূলক বলে মনে হচ্ছে না। উত্তরবঙ্গের ‘মদনকাম’ ইন্দ্রের পূজা বলেই মনে হয়।

২. গঙ্গার দুই পুত্র--- ডাকুর, মহানন্দ : কোনো পুরাণে এরকম নেই। বাংলার মঙ্গলকাব্য ধারায়ও এই নাম দুটি অভিনব। তারা গিয়ে কনকাই নদীতে পাটনী হয়ে পার্বতীর ঘরে ফেরার ঘাটে উপস্থিত। উদ্দেশ্য-দেবীকে মুশকিলে ফেলা। মা গঙ্গার সতীন হয়ে কেউ পরিবারে আসুন তারা চাননা।

শেষে শিবের চারপুত্র সহ দুই স্ত্রী পার্বতী ও গঙ্গার একটি চিত্র উপস্থাপিত করার মধ্য দিয়ে জগজ্জীবন অভিনব পুরাণপ্রতিমা তৈরি করেছেন।

‘প্রথমে গঙ্গার পুত্র ডাকুর মহানন্দ।

দেখিয়া শঙ্কর দেব পরম আনন্দ ॥’

৩. গণেশ ও কার্তিক জন্মকথা : পার্বতী শিবের সঙ্গে মিলনের উদ্দেশ্যে গেলেন তাঁর মালঞ্চে। গঙ্গার অনুমতি নিয়ে গেলেন তিনি গোয়ালিনীর বেশে। শিব তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। পার্বতী তাঁর কাছে সুবর্ণ কাতি ‘নিশান’ নিয়ে এলেন। জন্ম নিলেন গণেশ। বার বছর পরে কুচনীর রূপে দেবী গঙ্গার উপদেশে আবার মালঞ্চে এলেন। শিব তাঁকে গ্রহণ করলেন। সুবর্ণ অঙ্গুরি নিশান নিয়ে এলেন মিলনের পর। এবার জন্মালেন কার্তিক। শিব গণেশ-কার্তিককে চিনতে পারছেন না, গঙ্গা বললেন : 'কহিতে বাসি লাজ'। এদুটি তাঁর সন্তান। নিশান দেখে মনে পড়ল সব। গণেশ আর কার্তিকের জন্মকথার এই বৈচিত্র্যের কারণ সম্ভবত অঞ্চল-প্রসিদ্ধ কোনো সমান্তরাল লোকপুরাণ।

৪. দুর্গার সঙ্গে অসুরের সম্পর্ক নিয়ে নিন্দাবাদ : গঙ্গা-দুর্গার দ্বন্দ্বের অবসরে চকিতে বিষয়টি উপস্থাপিত।

‘গঙ্গা বোলে দুর্গা তোর নিষ্ফল জীবন।

তুমার অসুর ছিল ভাতার কেমন ॥’

অন্যত্র এ কথা আর নেই। গোয়ালিনী আর কুচনী বেশধারিণী দুর্গার প্রসঙ্গ মনে রাখলে গঙ্গার নিন্দাবদের আড়ালে কোনো অবিকশিত পুরাকথার পরিচয় আছে বলে ধরতে হয়।

৫. মনোহর মহাব্যাঘ্র দ্বন্দ্ব ক্ষীর সমুদ্র গড়া : বৎস্য মনোহরকে রেখে চরতে গেলেন। তাকে এক মহাব্যাঘ্র খাদ্য হিসাবে পেতে চাইল। তাকে কোনো ক্রমে সত্যে বদ্ধ করিয়ে (ফিরে আসার শর্তে) কপিলা গেলেন দেবকার্য । মনোহর তৃষ্ণায় সমুদ্র শোষণ করলেন। মহাব্যাঘ্রের সঙ্গে যুদ্ধ হল তার। কপিলা এলেন। বললেন তিনি ব্যাঘ্রের খাদ্য হবেন। ব্যাঘ্র তার মহত্বে খুশি। শেষে স্থির হল :

'এক বেট দুগ্ধ রাখ দেবের কারণ।

এক বেট দুগ্ধ রাখ ব্যাঘ্রের ভোজন ॥

এক বেটের দুগ্ধ বাছা কর তুমি পান।

এক বেটের দুগ্ধে ভরাঅ সাগরখান ॥'

ফলে গড়ে উঠল ক্ষীর সমুদ্র।

'কপিলার দুগ্ধে সাগরে হৈল নীর।

বহিয়া চলিল সিন্ধু গহন গম্ভীর ॥'

সমুদ্র মন্থনের এই যুক্তিধারা ও কাহিনি বাংলার নিজস্ব পুরাকথা। এর লক্ষ্য অমৃত নয়-বিষ। মনসার বিষাধিকার। যাতে তিনি মাওরি পুরাকথার হিনে-নুই-তে-পো-র মতোই 'both a lifegiver and life destroyer' হয়ে ওঠেন। কপিলার কাহিনি এই সূত্রে মনসামঙ্গলে প্রাসঙ্গিক।

৬. কামসোনা-কোসল্যা-লখিন্দর প্রসঙ্গ : কামসোনার কথা অন্যত্র নেই। জগজ্জীবন তাঁর কথা এনেছেন লখিন্দরকে বিবাহের জন্য উত্তেজিত করার জন্য। মনসা নেতার পরামের্শ কামসোনার কাছে গেছেন। স্বর্গে থাকেন কামসোনা। তাঁকে কোসল্যার রূপ ধরে লখিন্দরকে স্বর্গে দেখাতে, স্বপ্নে সেই রূপে মিলিত হতে আর পরদিন সরোবরে গিয়ে মিলিত হবার কথা জানাতে বলেছেন মনসা। কামসোনা স্বপ্নে এসে অনুরূপ কাজ করেছেন।

কোসল্যা লখিন্দরের মামী। তার স্বামী মহাদানী মধুসূদন। মনসা তাকে সন্তানের লোভ দেখালেন। বললেন সরোবরে স্নান করতে যেতে। স্বপ্ন দেখে তাকে সত্য বলে ধরলেন। গেলেন সরোবরে। সেখানে কোসল্যাকে বলপূর্বক ভোগ করলেন লখীন্দর। মামী-র সঙ্গে এই রকম করা পুরাণসম্মত- লখাই একথা বললেন। আসলে মাতুলানীর সঙ্গে সম্পর্ক পূর্বতর সামাজিক ব্যবস্থার ইঙ্গিত হতে পারে। এদিক থেকে দেখলে, বর্তমান প্রসঙ্গটি সমাজে মাতুল-প্রাধান্যের অবক্ষয় তথা পুরুষপ্রাধান্যের সূচনার প্রমাণ বলে মনে হয়।

৭. নিদ্রালি দেবী প্রসঙ্গ : নিদ্রালি দেবীর কথা জগজ্জীবন এনেছেন লখাই-কে দংশন করার প্রস্তুতির সময়। দেবী মনসা তার কাছে গেছেন। নেতার পরামর্শে 'নিদ্রালি নগরে' গেলেন মনসা । নিদ্রালি বৃদ্ধা, তাকে মনসা মাসী বলে সম্বোধন করেছেন। স্মরণ করলেই যেতেন তিনি, একথা শুনে মনসার মৃদু ভাষ্য :

'পদ্মা বোলে মাও মাসী ভিন্ন নাই জানি।

কেমতে ডাকিব মাসী আইলু আপনি ॥'

নিদ্রালি দেবীর আচরণ বাংলার লোকজীবনে প্রচলিত 'ঘুমপাড়ানি মাসী পিসী'র সঙ্গে তুলনীয়। যাই হোক নিদ্রালি চললেন তাঁর নিদ্রার ঝুলি নিয়ে।

'পদ্মার বচনে চলিল দুষ্ট বুড়ী।

ঝাড়িঞা ফেলিল যত নিদ্রার ধোকড়ি ॥'

মেড়ঘর-সহ চম্পালির সকল এলাকায় নিদ্রালির প্রভাব পড়ল। চম্পালি হল ঘুমন্ত পুরী।

৮. তাড়কা রাক্ষসী প্রসঙ্গ : রামায়ণের লোকপ্রচলিত ভাষ্য জগজ্জীবন জানতেন। তাড়কা রাক্ষসীর কথা রামায়ণ থেকে নেওয়া হতে পারে। মনসামঙ্গলে এটি বিচিত্রভাবে ব্যবহৃত। রামায়ণে বাল্মীকি লিখেছেন তাড়কাকে রাম-লক্ষণ হত্যা করেছে বিশ্বামিত্রের পরামর্শে :

'অলং তে ঘৃণয়া রাম পা পৈষা দুষ্ট চারিণী।

যজ্ঞ বিঘ্ননগরী যক্ষী পুরা বর্ধৈত মায়য়া ॥

বধ্যতাং তাবদেবৈষা পুরা সন্ধ্যা প্রবর্ততে।

রক্ষাংসি সন্ধাকালে তু দুর্ধর্যাণি ভবতি হি ॥'

সন্ধ্যাকালে রাক্ষসীর মায়াবল বাড়ার আগেই তাড়কা নিহত হল। ইন্দ্রাদি দেবতারা খুশি হলেন। জগজ্জীবনের কাব্যে তাড়কা মোটেই মারা যায় নি। চাঁদের ছয় পুত্রকে এক সঙ্গে হত্যা করে তাড়কার হাতে গচ্ছিত করেছেন মনসা। চিতা থেকে তোলা সেইসব মৃতদেহ। মনসার পরামর্শ ছিল:

'পদ্মা বোলে তাড়কা রাক্ষসী মায়া ধর।

ছয় মৃত্যু বানিয়ার শীঘ্র চুরি কর ॥'

মনসা তাকে বলেছেন যখন চাইবেন তখন যেন পান। ('জোগাইতে চাহ মৃত্যু যবে আমি চাই') স্বর্গে নৃত্য দেখিয়ে স্বামীকে বাঁচিয়ে বেহুলা ছয় ভাসুরকে বাঁচিয়ে দেবার নাছোড় উপরোধ করেছেন। মনসা টেটনী বেনিয়া বধূ-র উপরোধ এড়াতে পারলেন না। তাড়কার দেশ লঙ্কায় গেলেন তারা- তিনজন। বেহুলা, লখিন্দর আর মনসা। তাড়কাকে অনুরোধ করলেন মনসা। বুড়ী রাক্ষসী 'লোটন' বেঁধে হাজির। চাল থেকে মৃতদেহ পাড়া হল। মৃত্যুকে বান্ধিয়া বলে ঠমকে ঠমকে চলে যায় বুঢ়ি পদ্মা দরশন ॥

তাড়কার এই প্রাণবন্ত উপস্থিতি মনসার সর্বাতিশায়ী শক্তি, সর্বত্র গতিশীলতা ও অধিকারের প্রমাণ। নাগলোক, রাক্ষসকুল আর দেবলোকে তার প্রতিপত্তি দেখাতেই জগজ্জীবন এই প্রসঙ্গটি এনেছেন।

রামায়ণ-মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ প্রসঙ্গ জগজ্জীবন ব্যবহার করেছেন তাঁর কাব্যে। সে-সব নিয়ে ধর্মনীতি ও বিশ্বাস প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। বেহুলার মান্দাস তৈরির সময়, বিচনী চিত্রিত করার অবসরে এমন উদাহরণ পাওয়া গেছে। চরিত্রের মুখেও এসেছে পুরাণের প্রসঙ্গ। মাতুলানী কোসল্যাকে বলাৎকারের সময় কৃষ্ণকথা স্মরণ করেছেন লখাই। বেহুলার উপর শক্তি প্রদর্শনের আগে তার দাদা শঙ্খাই সাধু পরস্ত্রী হরণের পুরাণ-প্রসঙ্গ স্মরণ করেছেন। এসবই মনসামঙ্গলে বহিরাবরণ মনে হয়। পুরাকথার গভীর অন্তর্ভেদী আদি-উপকরণ এসব নয়।

৪.৫: জগজ্জীবনের কাব্যে সমাজ চিত্র

কাব্য বাস্তবের কথাচিত্র নয়। অন্তত মধ্যযুগের আসর-পোষিত, ধর্মসম্মত কাব্যে বাস্তবের চেয়ে বাস্তবের অতিশয়নই বেশি। সাহিত্য খণ্ডে বাস্তব বলে যা অনুভূত হয় তা যুক্তির কষ্টি পাথরে ঘষে না নিলে বাস্তব সম্পর্কে পূর্ণ পরিচয় লাভ করা যাবে না। আমরা জগজ্জীবনের কাব্যে যুক্তির সহায়তায় বাস্তবের যে অভ্রান্ত পরিচয় পাই তা ক্রমান্বয়ে উপস্থাপন করছি।

কাব্যের সূচনায় ধর্ম দেবতার মৃত্যু, তিনপুত্রের শবদাহের বিবরণ আছে। শিব-বিষ্ণু- ব্রহ্মা ধর্ম-পুত্র। তারা অগ্নিসংযোগ করলেন। মুখাগ্নি দিলেন শিব।

মন্ত্র পড়ে মহেশ্বর অগ্নি দিল মহেশ্বর [ধর্ম] পুড়িয়া হইল ছাই ॥

অন্যত্রও এরকম শবদাহের বর্ণনা আছে। ছয় পুত্র একদিনে মরবার পর তাদেরও দেহ সাজানো হয় চিতায়। জগজ্জীবনের বিবরণ :

‘যতেক বানিয়াগণ লৈয়া তৃণ কাষ্ঠ।

মরা ছয় লৈয়া যায় গগরির ঘাট ॥’

ধর্মের মৃত্যুর পর কেতকাকে মহেশ্বর পরামর্শ দিয়েছিলেন সতী হতে। সতী অর্থাৎ স্বামীর চিতায় আরোহণ করে প্রাণ বিসর্জন। মধ্যযুগে এই প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। শিব কেতকা বা মনসাকে বলেছেন:

‘এই ঘাটে পুড়িল অনাদি সুরপতি।

বাপ হইল মরা মাগো তুমি হইল সতী।।’

বিবাহে যৌতুক প্রদান বিশেষত কন্যা জামাতাকে রাজ্য বা বিষয় দান বাংলার প্রচীন সংস্কৃতি। মনসার বিয়ের পর শিব তাঁকে অনুরূপ যৌতুক দিয়েছেন।

‘ময়নাবতী গ্রাম দান দি সেই গ্রাম

আর ময়না বড়ু রাজ্য।

বোলে দেব ত্রিপুরারি শুনি বাছা বিষহরি

মর্ত্যে পাইবে প্রজা সজ্জ ।।'

ময়নামতী গোপীচন্দ্রের রাজ্যাধিকারের কথা মনে পড়ে। মনসামঙ্গলের অন্যান্য ভাষ্যে 'জয়ন্তী' রাজ্যের কথা মেলে। ময়নাকে বড়ু রাজ্য বলেছেন জগজ্জীবন। বড়ু রাজ্য নিশ্চয় বড়ুয়া পদবীধারী মগ-বৌদ্ধদের স্মৃতি চিহ্নিত। বাংলায় মধ্য যুগের সাহিত্যে যারা বৌদ্ধ সংস্কৃতি নজর করতে পারেন না-তাদের জন্য এ একটি অভ্রান্ত উদাহরণ।

কন্যাপণই প্রশস্ত ছিল মনে হয়। লখিন্দরের বিবাহে সাহো বেনে যেসব উপহার দিয়েছেন, চাঁদ তা নিতে অস্বীকার করেছেন। তাঁর কথা :

'মোর ঘরে হীরা মতি গড়াগড়ি যায়।

ঘুচাহ জঞ্জাল বালা বড় দুঃখ পায় ॥'

হতে পারে বরপণ গ্রহণ করলে সামাজিক সম্মান হানির সম্ভাবনাও ছিল।

দৈবজ্ঞদের প্রভাব তখনকার সমাজে যথেষ্ট ছিল। বার্নিয়ের-এর ভারতবর্ষ সম্পর্কে লেখায় এ বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য আছে। দিল্লীর বাদশাহরাও দৈবজ্ঞদের উপর প্রভূত নির্ভর করতেন। চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রার প্রাক্কালে এক দৈবজ্ঞ এসেছেন। চাঁদ তাঁকে লেঙঘা পাত্রকে দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছেন। দৈবজ্ঞ গণনা করলেন, তিনি কোনো সুলগ্ন দেখতে পেলেন না। তাঁর কথা :

'সকল কুশল তোর কিছু দোষ নাই ॥'

'এক অমঙ্গল দেখি পদ্মাসনে বাদ।

দক্ষিণ পাটনে তোমার হইবে প্রমাদ।।'

চাঁদ মনোভীষ্ট পুরণ হল না দেখে ক্ষুণ্ন হলেন। নির্দেশ দিলেন: ব্রাহ্মণকে বন্দী করতে। শুধু কি তাই 'যাবত না আসি আমি চম্পালি নগর।' বন্দী অবস্থাতেই থাকতে হবে তাঁকে।

‘সত্য হইলে আমি দিব পঞ্চগ্রাম।

মিথ্যা হইলে তোমার করিব অপমান ॥’

দৈবজ্ঞর গণনায় চাঁদ সদাগর বিশ্বাস করলেন না। তাহলে তিনি দৈবজ্ঞকে ডাকলেন কেন? আসলে চাঁদের মধ্যে এক ধরনের আধুনিকতার লক্ষণ প্রকট। তিনি ভবিষ্যৎ গণনা চাইছেন গঠন করার ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রণ করার আকাঙ্ক্ষায় বাস্তবের মাটিতে পা রেখে ভবিষ্যৎকে নিজ অধিকারে আনার জন্য। এমন পৌরুষব্যঞ্জক চরিত্র বাংলা সাহিত্যে বেশি নেই।

দৈবজ্ঞের আরও পরিচয় বর্তমান কাব্যে আছে। দুবারই দেবী মনসা দৈবজ্ঞের ছদ্মবেশে চাঁদকে লাঞ্ছনার কৌশল করেছেন। প্রথমবার তিনি লঙ্কেশ্বরকে নারকেল সম্পর্কে যা নয় তাই বলেছেন।ফলে চাঁদের প্রতি অবিশ্বাস করেছেন লঙ্কারাজ। নারকেলকে ভেবেছেন বিষ ফল। সেবারকার ছবি, জগজ্জীবনের রচনায় এই:

‘হাতে পুস্তক নিল দৈবজ্ঞ রুপ ধরি।

রাজার সভাতে গেলা দেবী বিষহরি ।।’

যে দৈবজ্ঞ চাঁদকে সঠিক গণনা করে সাবধান করেছিলেন তার ভাগ্যে জুটল লাঞ্ছনা। আর যে দৈবজ্ঞ-রা চাঁদকে বিপদে ফেললেন-তারা প্রকৃত দৈবজ্ঞ নন। জগজ্জীবন ঘোষালের দৃষ্টিভঙ্গি বেশ রসজ্ঞ তির্যক একটি কোণ বেছে নিয়ে জীবনকে দেখেছেন তিনি। দৈবজ্ঞের মারফৎ আমরা পাই তখনকার সমাজবাস্তবের একটি নির্যাস। সেখানেও তির্যক হিউমার মণ্ডিত রচনার কৌশলটি তারিফ করার মতো।

কন্যা দাসী ক্রয়ের রীতি তখন অভিজাত মহলে চালু ছিল। লখাই বিয়ে করার জেদ ধরেছেন। সনকা তাঁকে বলছেন, বিয়েতে বিপদ হবার সম্ভবনা। ধন্বন্তরীর কথা মনে আছে তাঁর। এ সময় বললেন তিনিঃ

‘দ্বার ঘুচাহ বাছা কর স্নান ভোজন।

দাসী করি দিব এক শত নারীগণ ॥’

প্রথমে মনে হয় এ নিছক কথার ছলেই বলা। পরে চাঁদ যখন চলেছেন কন্যা সন্ধানে, তখন উজানী নগরের ছয় ঘাট সরোবরে বেহুলার অসম্ভব শক্তিমত্তার পরিচয় দেখতে পান তিনি। সঙ্গী লেঙঘা পাত্রকে ডেকে বললেন তিনি এই কন্যার পরিচয় চাই।

‘চান্দো বোলে লেঙঘা পাত্র শুনি মোর বাণী।

করিল অদ্ভূত কর্ম এই কন্যাখানি ॥

অন্য জাতির কন্যা হইলে লইব কিনিয়া।

বানিয়ার কন্যা হইলে লখাই দিব বিয়া ॥’

ক্রীতদাসী প্রথার এই রূপ মধ্যযুগের বাস্তব বলেই মনে হয়। সঙ্গে আছে জাতিভেদ- উঁচু জাতের অভিমান, নিচু জাতের মানুষের উপর অত্যাচারের শোষণের পরিচয়।

নৌ-সংস্কৃতির সঙ্গে জগজ্জীবন পরিচিত ছিলেন। উজানী থেকে লখিন্দর-বেহুলা সহ বিশাল প্রদল নিয়ে চাঁদ সদাগর আসার সময় একটি ব্যবস্থা করা হল।

‘নৌকায় বান্ধিল নদী উজানীর জল।

তিলেক উত্তরিল সব চান্দের প্রদল ॥’

লঙ্কা থেকে বাণিজ্য শেষে মোহনার মুখে কাঁকড়ার জলে চাঁদের নৌকা ডুবি হল। কাঁকড়ার জল, খুব সম্ভব নদী মোহনা । কাঁকড়ার পায়ের মতো বহু মুখে নদী যেখানে সমুদ্রের দিকে চলেছে। নৌকাডুবির সময় বাঙ্গাল-মাঝিদের কান্নার বিবরণ এনেছেন জগজ্জীবন। এই বর্ণনার সঙ্গে একালের মঙ্গলকাব্যের পাঠক পরিচিতি। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, বিজয়গুপ্ত এই রকম লিখেছেন। বড় বড় নৌকায় পূর্ববঙ্গের (মূলত চট্টগ্রামের মুসলমান) মাঝিদের বাঙ্গাল বলা হত। তাদের বিষাদ-বিবরণে আসর মনোরঞ্জক উপাদানও ঢুকিয়ে দেওয়া হত। তবে জগজ্জীবন বাস্তবকে অস্বীকার বা আড়াল করেন নি।

সামান্য কিছু অথনৈতিক চিত্র মিলেছে কাব্যটিতে। যাত্রাপথে কাঁকড়ার জল পার হবার পর চাঁদ সদাগরের নৌবহর শঙ্খদহে পৌঁছল। ডিঙ্গায় ছিল লোহার জাল। তা দিয়ে শঙ্খ বন্দি করা হল। চাঁদ সকলকে বললেন কাজ ঠিকমতো করতে। তারা--

‘বালুচরে রাখে শঙ্খ জিয়ন্ত জানিঞা।

যাবার বেলা এই শঙ্খ লইঞা যাব তুলিঞা॥’

রীতিটি বহু প্রচলিত ছিল। অন্য মঙ্গলকাব্যেও আছে।

মনাই কাণ্ডার কড়িদহে এসে কড়ির প্রশংসা শুরু করেছ। কড়িই যে জগতের সব প্রতিপত্তির মূল। তার কথা :

‘যদি কোড়ি দিতে পারি সাজি আসি পরনারী

জাতি কুল না করে বিচার।

যার নাই কোড়ি ধন প্রিয় নহে পুত্রগণ

নিজ নারী না দেন শৃঙ্গার ॥’

কড়ির গুণগান শুনে চাঁদ এখানেও শঙ্খ তোলার মতো ব্যবস্থা করলেন।

‘লোহাজাল করে সন্ধি কোড়ি সব করে বন্দী

ভরিল ডিঙ্গার অর্ধখান।’

তারপরে চরে তারা গর্ত করলেন (‘চর মধ্যে খাদ করি’), সেখানে কড়িগুলি পুঁতে রাখা হল-সঙ্গে গোবর গুলে দেওয়া হল। (‘তাতে দিল গোময় গুলিয়া’) ফেরার সময় এই অতিরিক্ত সম্পদ নিয়ে যাওয়া যাবে। চাঁদের কথা :

‘পচিয়া সরিঞা যাবে উত্তম হইয়া রবে

যাবার কালে লইব তুলিঞা’

একটি বর্ণনা থেকে মনে হয় মধ্যযুগে কড়ি জাল করার ব্যাপারও চালু ছিল। প্রসঙ্গটি পাচ্ছি কনকাই নদীর কাণ্ডারী হয়ে আসা গঙ্গার দুই পুত্র যখন পার্বতীকে পারানির কড়ি চেয়েছে। বলেছে ডাকুর আর মহানন্দ

‘অভয়ার চরণে কহিল দুই ভাই।

পার করি দুর্গাকে মজুরি যদি পাই ॥'

মজুরির কড়ি দেবেন কি করে, সঙ্গে তো নেই। পার্বতী তখন শখা ভেঙ্গে হলুদ মাখিয়ে কড়ির মতো করে তাদের দিলেন।

'ছেল্যার বচনে দুর্গা শঙ্খ করে চুর।

হরিদ্রা মাখিয়া করে তাহার হুজুর ॥'

এভাবে কড়ি জাল করা হত বলেই মনে করি।

জলপানের জন্য আদা নুন খাওয়ার প্রসঙ্গ এসেছে ধনাই মনাইয়ের বাজারে। অন্যত্রও এই রীতির পরিচয় আছে। সজ্জন ভদ্রলোককে খাবার পরিবেশনের আগে আদা নুন খেতে দেবার কথা আছে মেনকার উজানী নগরে জামাতা লখাইকে খেতে দেবার সময়। চাঁদ সদাগর ফিরে আসার পর তাঁকে সনকা খেতে দিলেন আদা আর নুন। চাঁদ- 'আদা নুন করে জলপান'।

ডোমরা নিজেদের হাড়ি বা চণ্ডালদের চেয়ে উঁচু জাত ভাবত। উক্ত নির্লজ্জ দুয়ারিকে ডোমনী বলেছে :

'নিরন্তর সাধুকে যোগাই পান পানি।

বিচার না কর তুমি হাড়ি চণ্ডালিনী।'

দেবী দুর্গা শিবের সঙ্গে একবার গোয়ালিনী-বেশে, একবার কুচনী-বেশে মিলিত হয়েছেন। গোয়ালিনী-বেশী দেবীকে শিব মিলন প্রস্তাব দেবার পর তিনি বলেছেন নীচু জাত।

'গোয়ালিনী বোলে আমরা নীচজন।

ত্রিদশ ঈশ্বরবাক্য লঙ্ঘিব কেমন ॥'

কুচনী-বেশ ধরার সময় দেবী দুর্গার বর্ণনাটিতে সামান্য আয়াসে জগজ্জীবন কোচ জাতির বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করেছেন।

'নাক চেপ্টা করে কোমর হইল মোটা।

কপালে তুলিয়া দিল সিন্দুরের ফোঁটা ॥'

কানের কাছে টেনে খোপা, বুকে পাটের পাটনি বাঁধা, পিতলের খাড়ু পায়ে। দেবীর রূপটি অনেকটাই যাকে বলে ethnic. মোট কথা জগজ্জীবনের কাব্যে সমাজের বহুস্তরীয় সাধারণ মানুষের জীবনবাস্তব ধরা পড়েছে।

৪.৬ : অনুশীলনী

১। মনসামঙ্গল কাব্য রচয়িতা কবি জগজ্জীবন ঘোষালের পরিচয় দিন।

২। জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল কাব্যের খন্ড ও পর্ববিন্যাস সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩। জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

৪। কবি জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল কাব্যে পুরাণকথা বর্ণনায় কবির মৌলিকত্বের পরিচয় দিন।

৫। জগজ্জীবনের কাব্যে তৎকালীন সমাজ চিত্রের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা আলোচনা করুন।

৪.৭ : গ্রন্থপঞ্জি

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস- শ্রী সুকুমার সেন, প্রথম খন্ড।

২. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস- শ্রী সুকুমার সেন, দ্বিতীয় খন্ড।

৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (প্রথম খন্ড) প্রথম পর্ব- ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৪.বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত- ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস- ক্ষেত্রগুপ্ত।

৬. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১ম পর্যায়) শ্রী ভুদেব চৌধুরী।

৭. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস- ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য।

৮. বাংলা সাহিত্য পরিচয়- ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

৯. জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল – অচিন্ত্য বিশ্বাস।

একক ৫: জগজ্জীবনের কাব্যের চরিত্র-রস-ভাষা ও অলংকার

বিন্যাসক্রম

৫.১ : জগজ্জীবনের মনসামঙ্গলের চরিত্র-চিত্রন

৫.২ : জগজ্জীবনের মনসামঙ্গলে হাস্যরস

৫.৩ : জগজ্জীবনের মনসামঙ্গলে লোকাচার

৫.৪ : জগজ্জীবনের কাব্যে প্রবাদ-প্রবচন

৫.৫ : জগজ্জীবনের কাব্যে শব্দ প্রয়োগের অভিনবত্ব

৫.৬ : জগজ্জীবনের কাব্যে অলংকার প্রয়োগ

৫.৭ : অনুশীলনী

৫.৮ : গ্রন্থপঞ্জি

৫.১: জগজ্জীবনের মনসামঙ্গলের চরিত্র-চিত্রন

দেবতার মানবায়ন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শেষ পর্যায়ের লক্ষণ। দেবতাদের নিয়ে রঙ্গ ব্যঙ্গ করার প্রবণতাও কোথাও কোথাও লক্ষিত হয়। মনসামঙ্গলের কাহিনি দৈব আর পৌরুষের দ্বন্দ- এরকমভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেনঅনেকেই। কথাটি জগজ্জীবনের সময় অনেকটাই সত্য হয়েছিল। আদিতে মনসামঙ্গল বাংলার নানা বর্গের কাছাকছি আসা, কৃষি সংক্রান্ত নানান লোক সংরচনের সমাপতন বলেই মনে হয়। দেবীর মৌলিকতা এখানে। তবে মনসা শত চেষ্টাও সত্ত্বেও যাঁরা কাব্য সংকলন করেছেন, তাঁদের প্রশ্নাতীত শ্রদ্ধা

ভক্তি আকর্ষণ করেন নি। ফলে দেবসমাজে ব্রাত্য- অন্ত্যেবাসী দেবী মনসা । যারা তাঁকে পুজা ভক্তি করে তারাও সমাজে নিম্নবর্গে স্থিত। এ অবস্থায় কবির মনে দুটি স্তর খেলা করে। ১. দেবীকে পূর্ণাঙ্গ ভক্তি তিনি করেন না। ২. দেবীর ভক্ত সাধারণের বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতাকে তিনি অস্বীকার করেন না। বাংলার উচ্চবর্গের মানুষ এই দ্বৈত বোধ করেছেন বহুদিন। মনসামঙ্গল কাব্যধারায় এই দ্বৈতের চমৎকার উদাহরণ পাওয়া যায়। দেবতার যে আদর্শ তাঁরা পুরাণ-নিষ্ণাত সংস্কার থেকে পান, দেবী মনসার মধ্যে তার অভাব দেখেছেন তাঁরা । ফলে কখনো তাঁদের লেখনীতে মানুষ চাঁদ সদাগর বেশ প্রধান হয়ে উঠেছেন, কখনো বেহুলাও চরিত্রশক্তিতে দেবীকে অতিক্রম করে গেছেন।

ধর্ম: চরিত্রটিকে পুরাকথার ঢং-এ প্রথম দিকে দেখতে পাচ্ছি। অনাদি ঈশ্বর। অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ বিমূর্ত আকার। বটপত্রে ভাসছেন আদিম জলস্রোতে। পরে তিনি নিজেকে গড়লেন মনুষ্যাকার দেবতা ধর্ম ঠাকুর হিসেবে। পুত্রদের সৃজন করলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আর অনিল। পুত্ররা গেল ধ্যানে। ধর্ম ঠাকুরের মনে জাগল বেদনা। সৃষ্টি আর স্রষ্টার আদি বিচ্ছেদ জাত এই মনোকষ্ট- দীর্ঘশ্বাস। জগজ্জীবন সেই বিমূর্ত বস্তুকে রূপ দিলেন :

'নিঃশ্বাসত নিঃসরিল মনসার জন্ম হৈল বসিলা উঠিলা বাম পাশে'

ধর্মঠাকুর পুত্রদের মতো নিরাসক্ত নন। তাঁর মনে জেগে উঠল এই নারীর প্রতি তীব্র আকর্ষণ। লিঙ্গ-চিহ্নহীন মনসাকে স্ত্রীলিঙ্গ দান করে তাঁর প্রতি কামভাব জাগল। অচেতন হয়ে পড়লেন তিনি। মনসা নিষেধ করলেন : 'কুমারী হরিলে হবে নরকে বসতি'। কিন্তু নীতির চেয়ে ধর্মের মনে জাগল মানবিক ভাব। কামনার এই আদিরসের চাঞ্চল্য ধর্ম ঠাকুরকে মানবিক করে তুলেছে বলাই বাহুল্য। কন্যাস্থানীয়ের প্রতি কামাসক্তি সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের electra complex-এর মতো । পুত্রদের ডেকে বললেন তিনি :

'কহ এক কথা তিন পুত্র মোর কাছে।

উপার্জিয়া খাইলে ফল দোষ কিবা আছে ॥'

কিছুমাত্র দোষ নেই। পুত্রদের কথা শুনবার পর ধর্ম ঠাকুর মনসাকে বিবাহ করার প্রস্তাব জানালেন।পুত্ররা বুঝলেন: কথায় ত আজি আমাক ছলিলেক বাপ। দুইপ্রজন্মের

বিরোধ- নারীকেন্দ্রিক আদি দ্বন্দ্ব। তাকে এই চরিত্রের কৌশলী ব্যবহারে প্রকাশ করলেন কবি।

ধর্ম চরিত্রের প্রথম দিকে কামনাই প্রবল। সৃজনের আসল কথাই তাই। মনসামঙ্গলের সৃষ্টি পত্তনে কামনার অতিরেক তাই অবাস্তব নয়। নিজের লিঙ্গের অর্ধেক ছিন্ন করার বিবরণে কামনারই চিহ্ন। প্রথম কামনা তুষ্টির পর ধর্ম মৃত্যু বরণ করলেন। তাঁর এই ব্যবহার কামাতিরেক ও তার ফল বলেই গণ্য করতে হয়।মৃত্যুর পরও কামনা অনিঃশেষ। পুত্রের প্রতি তাঁর নির্দেশ:

'মুখ মেল সত্বরে উদরে দেহ বাস।'

নিজের অতৃপ্ত বাসনা পূরণ হবে এইভাবে। তাঁর ভবিষ্যৎবাণী: শিবের সঙ্গে তিনি অর্ধ অঙ্গ হবেন- 'মনসা কামিনী হবে তোমার ঘরণী'। জীবন প্রবাহ এইভাবে নতুন প্রবণতার দিকে, নতুন আদলের প্রতি উদ্যত। তবে ধর্ম ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত চরিত্র ধর্মে গুণাদর্শ প্রাধান্য দেখতে পেলাম আমরা ।

শিব: শিবের মধ্যে পবিত্রতা আর লঘুত্বের সমাপতন লক্ষ করি। এই গুণ ধর্ম ও সমাজের অন্তর্গত। জগজ্জীবন প্রচলিত বিষয়কেই অবলম্বন করেছেন। কোথাও কোথাও শিবকে প্রচলিত গুণ ধর্মের মধ্যেও মানব রসে বৈশিষ্ট্য পূর্ণ হয়েছে।

শিব যখন মালঞ্চকে ফুলে ফুলে ছেয়ে ফেললেন তখন তার মধ্যে নান্দনিক অভিব্যক্তি দেখতে পাই। সঙ্গে কামনার স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে এই পর্যায়ে । এই কর্মকুশলতায়- কৃষক হিসেবে শিবকে কিঞ্চিৎ যেন শিবায়নের শিবের মতো মনে হয়। মনসা রূপান্তরিত- হেমন্তের ঝি; তাঁর শরীরেও আদি দেবতা ধর্মের তীব্র কামানুভূতির উপস্থিতি- মিলনের রঙ্গভূমি হিসেবে এই মালঞ্চকে একটি প্রতীকের মতো মনে হয়। দুয়ারি এসে সংবাদ দিলেন: 'মুকুলিত মালঞ্চখান' তখন শিবের কামনা সুস্পষ্ট: 'কামিনী অভাবে মোর কাতর পরাণ।' হেমন্ত ঋষির পালিত-কন্যা পার্বতীকে মালিনী হিসেবে চাই তাঁর। পার্বতী এলেন। কিন্তু তাকে খুঁজে না পেয়ে ঊনপঞ্চাশ বায়ুকে ডাক দিলেন তিনি। বাগান তছনছ হল,

পাওয়া গেল দেবীর সন্ধান। দেবীকে দেখে প্রেম জাগল শিবের। তিনি ভাবলেন 'চঞ্চল নয়ানী দুর্গা' হয়তো ভয় পাবেন- তাই:

'ধীর করি দিল হাত হৃদের উপর।

চমৎকার হয়া উঠে প্রাণে পাঞ্জা ডর ॥'

এই ভয় পাওয়ার ভাব মনস্তত্ত্বসম্মত। শিব তাঁকে গান্ধর্ব মতে বিয়ে করলেন। বিহার করলেন মালঞ্চ ভুবনে । তাঁর কামনার ক্ষেত্রটি হয়ে উঠল প্রতীকের মতো । ইন্দ্রকে বৃষ্টিপাত করতে বললেন শিব। ফলে তাঁরা পবিত্র হলেন।

'সেই জলে শুদ্ধ হইল শঙ্কর ভবানী।'

শিব অবৈধ কামনা প্রকাশে সিদ্ধ হস্ত। কয়ালি-র বেশে হেমন্ত-গৃহে উপস্থিত হলেন একদিন। মেনকার কাছে ভিক্ষা নিলেন না। কথা তাঁর-

'যেখানে ভিক্ষাকে যাই অকুমারীর হাতে পাই

তার দান আসি আমি লয়া।'

তাই হল। পার্বতী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। গোপনে শিব তাঁর শরীরে হাত দিলেন। ফল লোকনিন্দা-

'পাড়া পড়োসি লোকে করে ঠারা ঠারি।

হেমন্ত ঋষির ঝি কয়াল-ভাতারি ॥'

হেমন্ত ঋষি শিবকে বন্দি করলেন। সাগরতীরে ইষ্টদেবের পায়ে যেসব ফুল দিয়েছেন, এসে দেখেন বন্দির পায়ে সেসব ফুল। ঐশ্বর্য এসে চরিত্রভ্রষ্টতাকে আড়াল করল। শিবের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তুতি শুরু করলেন হেমন্ত ঋষি।

শিবের কামনা তির্যক। তাঁর প্রকাশ বহুমাত্রিক। মালঞ্চবনে প্রতিবেশ যখন রমণীয় পাখিরা কলতান করছে, 'নানা পুষ্প পরিমল' -এর সুবাস পাওয়া যাচ্ছে, আকাশপথে স্নানান্তে ফিরে যাচ্ছেন অপ্সরা-বিদ্যাধরীর দল:

‘জলে থাকি ত্রিলোচন দেখিল অপস্বরাগণ

স্বর্গে যায় মাতলীর সঙ্গে।’

তখন তাঁর কামনার প্রকাশ ঘটেছে।

‘কন্যা দেখি ত্রিলোচন মদনে বিকল মন

পার্বতী পড়িল তবে মনে।’

স্খলিত বীর্য তিনি পদ্মপত্রে রাখলেন। জন্ম নিলেন মনসা। রূপান্তরিত মনসা তাঁর স্ত্রী পার্বতী। ধর্মপত্নী মনসা অন্য অর্থে শিবের মাতৃস্থানীয়। এবার মনসা হলেন তাঁর কন্যা।

কাহিনি অনুসরণ করলে মনে হয় কন্যা হলেও মনসা তাঁর কামনার সীমাতেই ছিলেন। কোনো কোনো সময় দেখা গেছে শিষ্টাচার বা অবদমনের প্রকাশ। তবু শিব মনসার প্রতি কিছুমাত্র কামনা প্রকাশ না করলে তাঁকে লুকিয়ে রাখা কেন? মনসাই বা পানের চেয়ে পাতলা হয়ে থাকা, করন্তিকে নিভার করার চেষ্টা করলেন কেন? পার্বতী এই প্রশ্ন যখন করেছেন তখন শিব বা মনসা কোনো উত্তরই দিতে পারে নি।

‘মনেত জানিস কন্যা হয় বিষহরি।

লুকায় আনিস কেনে করন্ডিত করি ॥’

অবদমিত কামনার এই বহুমাত্রিকতায় শিব চরিত্রটি বর্ণাঢ্য।

দেবী দুর্গা তাঁর সঙ্গে মালঞ্চ-বনে মিলিত হয়েছেন দুবার। প্রথমবার গোয়ালিনী বেশে। দ্বিতীয়বার বার কুচুনীর বেশে। দুবারই নীচ জাতীয় রমণীর প্রতি আকৃষ্ট শিব তাদের নিশান উপহার দিয়ে মিলিত হয়েছেন। এই প্রবণতাকে কামনা বৃত্তির উন্মত্ত প্রকাশ বলে মনে করলে ভুল হবে না।

লখাইকে বাঁচাবর চেষ্টা করছিলেন বেহুলা। তাই নেচেছিলেন দেবসভায়। শিব তাঁর প্রতিও কামনা প্রকাশ করেছেন:

‘শিব বোলে অহে কন্যা শুনহ বচন।

হাতে ধরি অহে কন্যা দেহ আলিঙ্গন ॥

দুই স্ত্রী ছাড়িব পার্বতী আর গঙ্গা।

তুমাকে লইয়া আমি হইব অর্ধ অঙ্গা ॥'

দেখে শুনে বেহুলা চমকিত। 'রক্ষকে ভক্ষক হৈলে নাহি প্রতিকার'। এ সময় সতীত্ব নষ্ট না হয়ে আর কোন উপায় নেই-ভাবলেন বেহুলা। দেবতারা নারদকে পাঠালেন। গঙ্গা-দুর্গা এলেন।

শিবকে কখনো কখনো বেশ স্নেহশীল মনে হয়। দ্বন্দ্ব সংঘাত মিটে গেলে গঙ্গাপুত্র ডাকুর মহানন্দ, দুর্গা পুত্র গণেশ কার্তিক আর মনসার সঙ্গে তাঁর সুখী গৃহস্থ রূপও কখনও কখনও ধরা পড়েছে মনসামঙ্গলে। দেবতারা শিব নিন্দা শুনে আরও মহৎ কিন্তু খেয়ালি এক বিচিত্র দ্বৈত-স্বভাব ব্যক্ত করলেন দেবী চন্ডীর কাছে।

'শিব অগতির গতি অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতি

অচিন্ত্যরূপ নৈরাকার'

তা হোক, কিন্তু ভিখারি শিব, তার জ্বালায় অতিষ্ঠ দুই দেবীর অভিযোগও তো ভুল নয়। 'প্রভাতে উঠিয়া যায় কুচনির ঘরে'। সারাদিন কাটিয়ে ফিরে আসেন যখন তখন তাঁর রূপ হয় ভয়ঙ্কর। শুধু ভ্রষ্ট চরিত্র নয়- শিব নেশাগ্রস্ত। বদমেজাজী শিব ঘরে ফিরে বাঘের মতো গর্জন করতে থাকেন। নিজেই গুড়া করা ভাঙ ভাজতে থাকেন। শেষে সে-সব খেয়ে থম মেরে বসে থাকেন। ঘরে খাবার যোগাড় নেই। ভিক্ষা করে নিয়ে এসে যৎকিঞ্চিৎ রান্না করেন পার্বতী (**'শাক কচু সন্ধ্যাকালে রন্ধন চড়াই'**) আর শিব তখন যা করেন তা বলার নয়।

'যখন পাতিলে অন্ন উতালায়া ফুটে।

অন্ন হৈল বোলি বুড়া পায় ধুঞা উঠে ॥'

শুধু কি তাই স্নেহহীন শিব, ভাঙের নেশায় সব ভাতই খেয়ে ফেলেন! 'কার্তিক গণেশ পুত্র খিদায় লালায়'। এই তীব্র বাস্তবতার মাঝখানে শিবকে এনে ফেলে তাঁর কামুক স্বভাবকে ভর্সনা করতে থাকেন দুর্গা। তার প্রশ্ন :

'গঙ্গা দুর্গা দুজন মরি অন্ন দুখে।

আর বিভা করিতে চাহে কুন মুখে ॥'

দেখে শুনে শিব নিরস্ত হন। তিনি পার্বতীকে হাতে ধরে বসালেন সিংহাসনে । দেবাদিদেবের এই স্বভাববৈচিত্র্য বেশ সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

দুর্গাকে বিবাহ করতে যাবেন মহাদেব। গঙ্গা বিমর্ষ। তাঁর মনে হয় তিনি প্রৌঢ় হয়েছেন তাই শিব তাঁকে এড়াতে চান। শিব তখন তাঁকে নানাভাবে প্রবোধ দিয়েছেন- হেমন্ত ঋষির মেয়ে

'বয়সেত শিশুজন সুবেশ বিলাসহীন

তুমা হৈতে নহে রূপমান।'

সুতরাং তাঁকে সতীন হিসেবে দেখার দরকার নেই। দুর্গাকে বিয়ে করার পরও বাসর থেকে চলে গেছেন শিব। গঙ্গার কাছে।

'গঙ্গার ঘরে গেল দেব রঙ্গ হৈয়া মনে।

গঙ্গা বোলে হর তুমি এথা আইলা কেনে ॥'

শিবের মধ্যে সকলের প্রতি স্নেহ করুণাও কম নেই।

মনসাকে জরৎকারুর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে পিতার দায়িত্ব পালন করেছেন শিব । দিয়েছেন যৌতুক। ময়নাবতী আর বড়ুরাজ্য। মনসা যখন তাঁর পুজা প্রচারের জন্য চেয়ে নিতে চান তাঁর ভক্ত চন্দ্রপতিকে। সামান্য দ্বিধা থাকলেও দিতে চেয়েছেন। চন্দ্রপতি অবশ্য শিব ছাড়া কাউকে শ্রদ্ধা জানাবেন না বলে দিয়েছেন। মনসা বিবাদী, যখন তখন যা ইচ্ছা তাই ঘটান, ফলে তাঁর উপর ক্ষুব্ধ হয়েছেন শিব। সব মিলিয়ে তাঁর মধ্য দিয়ে এক ভীরুস্বভাব

স্বামী, উদাসীন নেশাতুর ভিক্ষুক, স্নেহাদ্র পিতা আর এক সৃজনশীল পুরাকথার আদিদেব। কখনো তিনি আধ্যাত্মিক দার্শানকতার সীমা- দ্বান্দিকতার দুটি প্রান্তিক পরিস্থিতি। জগজ্জীবন এই মহাদেবকে সম্ভবমতো মানবিক আবেদনে ধরেছেন।

গঙ্গা: শিবের গৃহিণী। দুই পুত্র ডাকুর মহানন্দকে নিয়ে সংসার। শিব পার্বতীকে বিবাহ করার উদ্যোগ করছেন সংবাদ পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে দুই পুত্রকে পাঠালেন কনকাই নদীতে কাণ্ডার হয়ে যেতে। কনকাই নদীতে জল দিলেন বাড়িয়ে। পার্বতী পড়লেন বিপদে

'হেন জল বহে গঙ্গা স্থল কূল নাই।

কেমতে হইবো পার নাহিক উপায় ॥'

এর আগে কেঁদেছেন যথেষ্ট। সতীন সম্ভাবনায় প্রৌঢ় বিগতযৌবন নারী তাছাড়া আর কী-ই বা করবেন। 'কুম্ভ হেন কান্দিয়া করিল চক্ষ মুখ'। কিন্তু পুত্রদের পাঠানোর মধ্য দিয়ে এক তীব্র অনিশ্চয়তা প্রকাশ পায়। তাঁর মনস্তত্ত্বের সংবাদ জগজ্জীবন ঠিকই দিয়েছেন:

'গঙ্গা বোলে মুই বয়সে হৈলু হীন।

বৃদ্ধ কালে দিলে শোকে দারুণ সতীন।।'

এত চেষ্টা করেও কিছু হল না। শিব পার্বতীকে বিয়ে করতে গেলেন। যাবার সময় দিয়ে গেলেন স্তোক :

'বয়সেত শিশুজন সুবেশ বিলাসহীন

তুমা হৈতে নহে রূপমান'

গঙ্গা কিন্তু জানেন তাঁর সে কথা শুধু প্রবোধ দেবার জন্য। 'কপালের লেখন সতিনী'- মেনেই নিলে তিনি।

পার্বতীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব হয়েছে আবার দুজনে মিলে সংসারও করেছেন। গঙ্গার কাছে পরামর্শ পেয়েছেন পার্বতী। মালঞ্চবনে কখন কি বেশে যাবেন শিবকে সম্ভাষণ করতে, আসার সময় নিশান আনতে হবে- বলতে ভোলেন নি। গঙ্গা হয়েছেন পার্বতীর অভিভাবিকার

মতো। শিব এসে যখন ডাকুর মহানন্দ ছাড়া গণেশ কার্তিককে চিনতেই পারলেন না, তখন গঙ্গা তাঁকে সহাস্যে জানালেন সব।

‘গঙ্গা বোলে গোসাঞি কহিতে বাসি লাজ।

যেখানে সেখানে প্রভু কর মন্দকাজ ॥

গোয়ালিনীর পুত্র গণেশ গজানন।

কুচুনীর গর্ভে কার্তিক ষড়ানন ॥’

এরকম যে হবে আগেই জানতেন তিনি। পার্বতীকে বিবাহে উদ্যোগী শিবকে বলেছিলেন:

‘পাছে না করিহ রোষ দুই নারীর যত দোষ

নিরবধি দ্বন্দ্ব কাচাল।

প্রথমে যুবতী মুখ দুইতে না হবে সুখ

অবশেষে হইবে জঞ্জাল॥’

পুরুষের ভ্রমর-স্বভাব, বহুনারী আসক্তির প্রতি অতি ক্ষীণ প্রতিবাদ গঙ্গার। তবে তাঁর ব্যবহারে মনেই হয় না তিনি দেবতা। তাঁর মধ্য দিয়ে জগজ্জীবন তাঁর সময়ের নারীদের বেদনার সারাৎসারটি প্রকাশ করেছেন।

পার্বতী: দৈবীশক্তিতে ভরপুর প্রাণবন্ত চরিত্র। মালঞ্চ বনে একাই যাবার প্রবল সাহস তাঁর। সিংহবাহিনী হয়ে গেছেন, কিন্তু মাঝপথে সিংহ তাঁকে ত্যাগ করে চলে এসেছে। মালঞ্চে বাগানের দ্বারী তাঁকে বাধা দিয়েছে। মহামায়া তাকে দেখিয়েছেন তাঁর শক্তি।

‘তবে যদি দুয়ারিয়া না ছাড়ে দুয়ার।

আপনার মূর্তি ধরি দেখায় চমৎকার ॥’

দশভুজা শিবের মালঞ্চের দ্বার ভেঙেই ঢুকলেন। “খরতর” কন্যা দেবী চণ্ডী। ফুলবনে গিয়ে অশোক-বাসোক গাছে আশ্রয় নিয়ে লুকিয়ে থাকার পর শিব যখন তাঁকে আবিষ্কার

করলেন তখন পার্বতী তাঁকে প্রথমেই যেভাবে কথা বলেছেন- মনে হয় শিবের কাছে আলিঙ্গনই তিনি প্রার্থনা করছেন। বাইরের আপত্তি আন্তরিক প্রেমাকাঙ্ক্ষারই প্রকাশ। পার্বতী প্রেমময়ী।

পার্বতীকে শিব গান্ধর্ব বিবাহ করলেন- মিলিত হলেন তাঁরা। ফিরে গিয়ে হেমন্ত ঋষি-মেনকা তাঁর রাত্রিবাসের অজুহাত শুনলেন :

'গেনু মুই পুষ্প বাড়ি সিংহ সে আইলা ছাড়ি

সঙ্গে মোর নাহি আর সাথী।

নাহি পথ পরিচয় একলা পাইয়া ভয়

মালঞ্চে রহিনু বাসি রাত্রি ॥'

ফুল বনে 'ভমরোল'-এর ভয়, 'উঝট' লাগা, গলার হার ছিঁড়ে যাওয়া, গাছ থেকে আছাড় খেয়ে পড়া! কিন্তু হেমন্ত ঋষির প্রত্যয় হল না।

'ঋষি বেলে মায়াবতী ই মায়া শিখিলে কতি

চিত্তে মোর নাহি পতিয়ায়।'

কলঙ্ক মোচনের জন্য অষ্ট পরীক্ষা দিতে হবে তাঁকে। পার্বতীও রাজি। নির্ভয় তিনি- মহাদেব রক্ষা করবেন।

অষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন দেবী।

'সভার ভিতরে ঋষি মনে পায় লাজ।

পাক দিয়া ফেলাইল অষ্ট পরীক্ষার সাজ।।'

পার্বতী প্রেমময়ী। শিবকে ছাড়া তিনি কাউকেই জানেন না। সতীন সম্ভাবনার বাষ্পমাত্র নজরে এলে তাঁর তীব্র ব্যবহার বার বার দেখা গেছে।

মনসাকে তিনি কন্যা হিসেবে মানতে পারেন নি। শিব যতই বলুন, মেনে নেওয়া অসম্ভব। প্রথম কথা, মনসার জন্ম রহস্যময়। তা স্বাভাবিক মনের কোনো নারীই বিশ্বাস করতে পারেন না।

দ্বিতীয় কথা, শিব তাঁকে গোপনে ফুলের সাজিতে করে এনেছেন। পানের মতো পাতলা হয়ে এসেছেন মনসা। এর কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পার্বতীর মনের সন্দেহ দূর করছে না।

সুতরাং তীব্র প্রাণঘাতী সংঘাত। মনসার কোমর ভেঙে ফেললেন চণ্ডী, তাঁর একটি চোখ দিলেন নষ্ট করে। মনসাও দর্প রূপ ধারণ করে তাঁকে দংশন করলেন। শিবের নির্বন্ধাতিশয্যে মনসা সৎমাকে বাঁচালেন বটে কিন্তু দুর্গা কিছুতেই শিব-মনসার কথায় বিশ্বাস করলেন না। এক-মুখী সহজ স্পষ্টভাষিণী পার্বতী। গঙ্গার সাহায্যে প্রথমে শিবের সমস্ত 'সাজ' একত্র করে অগ্নিতে নিক্ষেপ করলেন। তারপর চললেন গৃহত্যাগ করে। পার্বতীর সক্রিয়তা, চঞ্চল মানবিক স্বভাব তাঁকে বর্ণাঢ্য করেছে।

এদিকে সমুদ্র মন্থন হল- বিষ পান করে মৃত্যু হল শিবের। নারদের মারফৎ সে সংবাদ পেয়ে এলেন পার্বতী আর গঙ্গা। বিশেষত পার্বতী। তাঁর কান্না:

'তুমার মরণে প্রভু আমার কিবা গতি।

অনাথ হইল মোর কার্তিক গণপতি।।'

বৈধব্য যন্ত্রণা আর সামগ্রিক অনিশ্চয়তা তাঁর। মনসা এলেন- দেবতাদের উপরোধে পিতাকে বাঁচিয়েও দিলেন।

পার্বতীর একমুখী প্রেম মনসামঙ্গলের শেষাংশে আর এক বার দেখা যায়। নারদের মাধ্যমে যখনই তিনি শুনলেন বেহুলার সঙ্গে আবার বিয়ের মতলব করছেন শিব, হৈ হৈ করে এসে পড়লেন। দেবতাদের সামনে যা নয় তাই বললেন। শিব পার্বতীর আগমন সম্ভাবনা পাবার সঙ্গে সঙ্গে বেহুলাকে তাঁর খাটের নিচে লুকিয়ে থাকতে বলেন। পার্বতীর হাত ধরে পাশে বসানোর সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবকোপণ পার্বতীর ক্ষোভ যেন দূর হয়ে গেল। সব শুনে তিনি বেহুলার নৃত্য দেখে তার স্বামীকে বাঁচিয়ে দিতে বললেন। পার্বতীর একমুখী

প্রেমের এও এক প্রমাণ। স্বামীর কাছে সামান্য স্বীকৃতিই তিনি পেতে চান। তাঁর অভাবে তাঁর মনে জেগে ওঠে ক্রোধ বা বেদনা- আদি দেবীর আদি বিচ্ছেদের দৈবীস্বভাব যেমন।

মনসা: মনসাকে বঞ্চিত বিড়ম্বিত এক নারী মনে হয়। আদিতে দেবী কল্পনার দিক থেকে মনসার মধ্যে মহাদেবীত্বের লক্ষণ মেলে, তাঁকে মনেই হয় তিনি Great Mother Goddess. তবে জগজ্জীবনের রচনায় মনসার দৈবীস্বভাব মানবিক প্রবণতা গুণকর্মের দ্বারা অনেকটাই চরিত্র লক্ষণ লাভ করেছে।

প্রথমেই যে কথাটি স্মরণে আসে মনসা শিবের অযোনি-সম্ভবা কন্যা বলে পরিচিত হলেও তাঁর সঙ্গে নাগলোকের যোগটি অস্পষ্ট নয়। শিবের বীর্য পদ্মনাল ধরে পাতাল প্রবেশ করেছে। পাতালপুরীতে তাঁকে পেলেন নাগরাজ বাসুকী :

'পাইয়া সে বাসুকী হইলেন মহাসুখী

পুষিলেন নিজ ভগ্নী করি।'

নাগ-সম্পর্ক মনসার মান ও মর্যাদাকে দেবসমাজে প্রান্তিক করেছে। কোনো ভাবেই তিনি তার প্রাপ্য সম্মান পান নি। সৎ মায়ের তীব্র আক্রমণাত্মক ব্যবহারে কোমর ভেঙেছে, চোখ নষ্ট হয়েছে। মা ও বাবা দুজনই বিষ ক্রিয়ায় মৃত্যু বরণ করলে তাঁকেই বাঁচাতে হয়েছে। মৃত্যু আর পুনর্জন্মের অধিকারী তিনি অত্যন্ত পারঙ্গম। অথচ তাঁর প্রাপ্য সম্মান নেই। পিতাকে বাঁচিয়ে তোলার পর ত্রিভুবন আনন্দে নাচছে কেবল মনসার মুখে হাসি নেই। শিব কারণ জানতে চাইলেন ; পদ্মা বললেন তিনি অন্যের গৃহে প্রতিপালিত হন- 'মাঙ্গিয়া খায়া মরি'। ঘটনা তাই। পিত্রালয়ে পার্বতীর কাছে তীব্রভাবে লাঞ্ছিত হবার পর মনসা এক ব্রাহ্মণের গৃহে দাসীবৃত্তি করেছেন। তাঁর দুঃখ তাঁর স্বামী নেই সংসার নেই।

'মোর প্রাণ পতি নাই রহি আমি কার ঠাই

এই অভিমান আমি করি।'

শিব মনসার বিবাহ দিলেন, যৌতুক দিলেন ময়নাবতী গ্রাম তথা 'বড়ু রাজ্য'। জুরৎকারু মুনির সঙ্গে বিবাহ-পরবর্তী সুখ ক্ষণস্থায়ী।

মনসা জরৎকারুর ঔরসজাত সন্তান গর্ভে ধারণ করলেন। সরোবর তীরে তরুতলে বসে আছেন দেবী, জরৎকারু তাঁর কোলে মাথা দিয়ে থাকলেন।

'পদ্মার উরুতে মুনি করি শিয়র।

তরুতলে নিদ্রাত পড়িল মুনিবর।।'

বর্ষা নেমে এল। ছোট ছোট মাছ আর ব্যাঙ 'খলখল' করছে। মনসার মনে পড়ল তাঁর সাপদের কথা। স্বামীকে উরু থেকে নামিয়ে তিনি গেলেন জলের ধারে।

'আনন্দিত মনসা জলের কাছে যায়।

ধরিয়া ধরিয়া সর্প চেঙ্গ বেঙ্গ খায় ॥'

পিছন থেকে দেখে জরৎকারু বুঝলেন 'এই নারী করিবেক কুলের খাঁখার'। ফিরে এসে আবার শুয়ে পড়লেন তিনি। মনসা সাপ চরিয়ে ফিরে তাঁকে ডাকলেন। জরৎকারু তাকে বললেন- 'চণ্ডালিনী' তুমি আমাকে ডাকলে কেন? চলে গেলেন তিনি। এরকমই শর্ত ছিল। সাপের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার জন্যই মনসার স্বামীর ঘর করা হল না! অথচ সাপই তাঁর শক্তি, সাপই তাঁর অলঙ্কার- সাপ আছে বলেই তাঁর বিষ নিয়ন্ত্রণের খ্যাতি। এজন্যই মানুষ ও দেবতাদের মধ্যে তাঁকে ভয় ও ভক্তির করার সূত্র! বস্তুত মনসার এই শক্তি ও দুর্বলতার মধ্যেই তাঁর বেদনার উৎস নিমজ্জিত।

চাঁদকে বেছে নেবার আগে মনসার একক সংগ্রাম নারীশক্তির আত্মমর্যাদার জন্য তীব্র প্রয়াস বলে মনে হয় কিছু আচার আচরণ । পুত্র জন্মাল মনসার-'চতুমুখ সুন্দর পুত্র'। আস্তিক। কিন্তু স্বামী পরিত্যক্ত মনসা-তাঁর জীবনসংগ্রামের তুলনা নেই। আত্মক্ষোভে বললেন তিনি।

'অন্যের ছাআল হৈলে দুগ্ধে ভাত খায়।

আমার ছাআল কেনে খিদাএ লালায় ॥'

এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর নেই। দেবসমাজ তাঁকে সমাজভুক্ত ভাবেন না (আসলে অভিজাত সমাজ), পুরুষবর্গ তাঁকে সম্মান করেন না। নারী হিসেবে মনসার এই সংগ্রামকে পূজা

লাভের ইচ্ছার সঙ্গে কবি মিলিয়ে নিয়েছেন বলে মনে করি। নিতান্ত ভিক্ষুকের বৃত্তি যেন। সমাজের নিম্ন স্তরে অন্তত দুটি সমাজ বা গোষ্ঠীর মধ্যে মনসা পূজা পাচ্ছেন দেখতে পাচ্ছি। প্রথম গোষ্ঠী রাখাল। দ্বিতীয় গোষ্ঠী মৎস্যজীবী।

রাখালরা দেবীর সহজ প্রার্থনাকে কিছুমাত্র সম্মান দেয় নি। মনসা বলেছিলেন:

'অধিক করিয়া আমি খাইতে নাই চাই।

কিছু দুগ্ধ পাইলে আমি শিশু পতিআই ॥'

কিন্তু সেই করুণ প্রার্থনা তারা পুরণ করল না। দেবীর রাখালদের গোধন লুকিয়ে ফেললেন। হরণ পূরণের দেবী নৃশংসতার শক্তি প্রয়োগ করলেন। এ ছাড়া কীই বা উপায় ছিল তাঁর। শেষ পর্যন্ত রাখালরা পায়রা বলি দিয়ে তাঁকে পূজা দিল। 'প্রত্যক্ষ দেবতা' মনসার পুজা প্রচলিত হল। জালো মালোর সমস্যা ছিল মাছ না পাওয়া।

'সাত দিন মারি মৎস্য করি পরবাস।

সপ্তদিনে না পাই মৎস্যের তলাস ॥'

মনসা তাদের বললেন 'আমার নাম' করে জাল ফেল! উঠে এল 'সুবর্ণের ঝারি'। মনসা তাদের পূজা রীতি বললেন। তারা মনসার পূজা প্রচার করল। এই কাহিনির আড়ালে কোনো জীবন-সত্য আছে কিনা ভাবা যেতে পারে। নিম্নবর্গের পেশাজীবী মানুষ তাদের পেশার সংকট মোচনের জন্যই এক ভয়ঙ্কর দেবতাকে স্বীকার করে নিল।

যদি এমন হত নিম্নবর্গের মানুষদের মধ্যে পূজা পেয়েই মনসা সন্তুষ্ট থাকতেন তাহলে মনসামঙ্গলের মূল কাহিনিই তৈরি হত না। মনসার দেবীত্ব আসলে অনিচ্ছুক উচ্চবর্গের মধ্যে ক্রমে ক্রমে প্রচলিত হবার মধ্য দিয়ে Upward mobility-র দিকে সামাজিক সচলতার দিকে এগিয়ে গেছে। মনসার উচ্চাশা-তাঁর পূজক-গোষ্ঠীর ক্রমিক আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা, হতে পারে, বাঙালির ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

নিম্নবর্গের মানুষের পূজাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনলেন না মনসা। গেলেন পিতার কাছে। তাঁর আবেদন:

‘মর্ত্যত না হইল মোর পুজার বিধান।

তুমার নন্দিনী আমি এই অভিমান ॥’

শিব বললেন তাঁর ভক্তদের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নিতে। মনসার দাবি চন্দ্রপতি তাঁর ভক্ত হন। শিব রাজি তবে দ্বিধান্বিত কারণ চন্দ্রপতিকে তিনি জানেন। চন্দ্রপতিকে ডেকে পাঠাতে তিনি রাজি হলেন না, উপরন্তু মনসাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করলেন। তাঁর কথা-

‘স্বামীএ ছাড়িল যাকে দেখি অনাচার।

হেন জনা পূজিবার ইচ্ছা আছে কার ॥’

স্বামী কি কারণে মনসাকে ত্যাগ করেছেন আমরা জানি। সাপ চরাবার বৃত্তি ত্যাগ করেন নি। যদি তিনি সংস্কৃত হতেন, ত্যাগ করতেন নাগ সম্পর্ক, তা হলে ভদ্র সমাজে মিশে যেতেন। মনসামঙ্গল কথার মৌলিকতা এখানে যে যথাসম্ভব অবিকৃত থেকেই- কেবল শক্তির প্রতিপত্তিতে মনসা দেবীত্বে স্বীকৃতি পাচ্ছেন। 'রসাতল’ থেকে ‘স্বর্গলোক' ক্রমেই বিস্তৃত হয়েছে তাঁর প্রতিপত্তি।

নেতার পরামর্শে দেবী মনসা চন্দ্রপতির কাছে সহজ সম্পর্কের দাবি নিয়ে গেলেন। শিবের শিষ্য আর কন্যা- এক দিক থেকে তাঁরা তো সহোদর সম্পর্কেই পরস্পরকে শ্রদ্ধা সম্মান করবেন। মনসার কথা-

‘এখন আমাকে দাদা দেহ পুষ্পজল।

ঘরে ঘরে দ্বন্দ্ব বাদ নহিরে কুশল ॥’

চন্দ্রপতি তাঁর প্রস্তাব মানেন নি।

সহজ অনুরোধে কাজ হল না। ছয় পুত্রকে মেরে ফেললেন মনসা। সেই ছয়পুত্রের স্ত্রীরা অনুমৃতা হচ্ছে একথা জানলেন তিনি। এবার মনসা তাড়কা রাক্ষসীর মাধ্যমে ছয়পুত্রের মৃতদেহ সরিয়ে রাখলেন। ঘটনাটিতে মনসার নাগ সম্পর্কের পাশাপাশি রাক্ষস সম্পর্কও স্পষ্ট হয়। কবির চোখে মনসা অপদেবতা হিসাবেই ধরা পড়েছেন। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর

মধ্য থেকে অঙ্কুরিত দেব ভাবনাকে আগন্তুক উচ্চবর্গের ভাবাদর্শে, এমনই প্রান্তিক করে রাখা হয়েছে। পৃথিবীর সর্বত্র জাতিবর্গের সংঘর্ষ সংঘাতে প্রথম দিকে এরকম প্রবণতাই দেখা যায়।

চাঁদের বাণিজ্যযাত্রা শুরু হল। লঙ্কার রাজাকে মনসা দেখা দিলেন 'শিরোমণি' দৈবজ্ঞের বেশে। চাঁদ সদাগরের উপহার নারকেল আসলে বিষ ফল- বললেন দৈবজ্ঞ। চাঁদ নিজেই নারকেল ভেঙে খেলেন- সারাদিন তার হল না কিছুই। তার আগে চাঁদের দাবিতে দৈবজ্ঞকে খোঁজা হল। তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। ছলনাময়ী মায়াবিনী মনসা। সামান্য যেন আত্মমর্যাদাহীনও। অন্যের রূপ ধারণ করে ছলনা করছেন এক নারী গোষ্ঠী-নেত্রী এরকম কাহিনি বাংলা রূপকথায় প্রচুর। রামায়ণে গোদাবরী তীরে শূর্পনখাও সুন্দরী নারীর বেশ ধারণ করেছেন-লক্ষ্মণ তাকে লাঞ্ছনা করেছেন, নিতান্ত অনৈতিকভাবে। এই রকম একটি আদল (Structure) মনসামঙ্গলে বার বার ফিরে এসেছে।

বাণিজ্যশেষে দেবী সনকার রূপ ধরে কামনা জাগিয়ে চলে গেলেন। সে অবশ্য চন্দ্রপতির রাত্রের স্বপ্ন।

'শয়ন করিয়া রহে চান্দো অধিকারী ।

সোনা রূপে সপন দেখান বিষহরি ॥'

স্বপ্ন-নিয়ন্ত্রণ আদিম জনসত্তার কাম্য দৈবসত্তা। স্বপ্ন-বিশ্লেষণও প্রাচীন কাহিনিগুলিতে মেলে। 'স্বপ্নবাসবদত্তা' থেকে বুদ্ধজন্মকথা-ভারতে স্বপ্ন সংস্কারের প্রকাশ প্রচুর। মনসামঙ্গল (অন্য মঙ্গল কাব্যগুলিও) কাব্য রচনার কারণ হিসেবেও দেবীর স্বপ্নাদেশ। স্বরূপে স্বপ্ন দেখানোর পাশে এসব অন্যরূপে স্বপ্ন দেখাবার শক্তি মনসাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে।

মনসার স্বপ্ন প্রদর্শন অধিকাংশ সময় কামোত্তেজক বা অনুরূপ অনুষঙ্গে উপস্থাপিত। এখানেও চন্দ্রপতির মনে স্ত্রী-বিচ্ছেদজনিত বোধ জাগল। "কামিনী অভাবে" তাঁর মন অস্থির হল। ঊষা অনিরুদ্ধকে তালভঙ্গ করবার জন্য মনসা অনিরুদ্ধের মনে অনৈতিক কামোত্তেজনা সৃষ্টি করেছেন।

'অনিরুদ্ধ নৃত্য করে বিবিধ বিধান।

মোহিনী মূরতি পদ্মা করিল সন্ধান ॥

হৃদয়ে হইল বালার মদন তরঙ্গ।

চাহিতে পদ্মার দিগে তাল হৈল ভঙ্গ ॥'

লখাইকে স্বপ্ন তিনি সরাসরি দেখান নি। তাঁর অনুরোধে কামসোনা তাকে স্বপ্নে মামী কোসল্যার রূপ ধরে আলিঙ্গন দিয়েছেন। এই প্রবণতাটি মনসার অনুষঙ্গে বাংলার মনসামঙ্গল কাব্যধারায় আছে। জগজ্জীবন তাঁর কাব্যে প্রবণতাটি স্পর্শ করেছেন, প্রয়োজনবোধে এক আধটি শিকলিতে তা রক্ষা করেছেন। একদিকে স্বামীর সংসার করতে না পারা, নারী প্রধান গোষ্ঠী-নেত্রীর মতো ব্যবহার আর অন্যদিকে যৌন উত্তেজক বিষয়গুলির নিয়ন্ত্রণ মনসার স্বতন্ত্র চারিত্র্য উপহার দিয়েছেন।

জল সঙ্কট সৃষ্টি, বাণিজ্যতরী ডুবিয়ে দেওয়া, নদীর স্রোতকে নিয়ন্ত্রণ লোকদেবতার পরিচিত লক্ষণ। কামরূপের কামাখ্যা দেবী ব্রহ্মপুত্র নদী পরিবেষ্টিত। লাউসেন যখন সেখানে গেছেন 'বিপক্ষ' দেখে জলস্রোত বেড়েছে। একই প্রাকৃতিক সংঘটন দেখি লাউসেন যখন ইছাই ঘোষের শ্যামরূপা গড় আক্রমণ করেছেন। তখনও অজয় নদের জল ভয়ঙ্কর বৃদ্ধি পেয়েছে। মনসার অনুরোধে ঊনপঞ্চাশ পবন আর দিগ্বিদিকের যত নদ নদী এসে পড়ল- চাঁদের ভরা ডুবি হল। একা ভেসে যাচ্ছেন চাঁদ- তাঁকে প্রাণে না মেরে লাঞ্ছনা করে চললেন মনসা। কারণ:

'পদ্মা বলে বানিঞা ডুবিয়া যদি মরে।

কি বাদ সাধিব যাইয়া মানুষের ঘরে ॥'

সাগরকে তাঁর নির্দেশ- 'প্রাণে না মারিহ মোর গন্ধ বানিঞাক'। এ অবস্থায় মনসার রূপান্তর গ্রহণ হল মনুষ্যেতর পক্ষী রূপে। 'কাগ রূপে মুখেতে বর্জিল পদ্মাবতী' আধুনিক পাঠক রুচির অপেক্ষা করলে নিরাশা হবেন। চাঁদ সাগরের শব্দ ব্যবহারও মোটেই উন্নত রুচির নয়।

মনুষ্যেতর প্রাণীর রূপ বহুবারই গ্রহণ করেছেন মনসা। বেহুলার ভাসান যাত্রায় তাঁর রূপান্তর

একটি পুনরাবর্তনশীল (recurrent) প্রবণতা ।

১. বাঘ হয়েছেন দেবী :

'চরখি ফিরায়া লেঞ্জ মাথার উপরে।

আন্দোলন করিয়া ব্যাঘ্র মহাশব্দ করে ॥'

২. কুমির হয়েছেন মনসা :

'কন্যার সাক্ষাতে পদ্মা গেল সেই ক্ষণে।

কুম্ভিরিণী রূপ পদ্মা ধরে সেইখানে ॥'

কবিরা এরকম অবকাশে কখনো চিল, শৃগাল হয়েও মনসার ভয় দেখাবার চিত্র অঙ্কন করেছেন। বিষয়টি বিশ্বাসের অঙ্গ-লোকবিশ্বাস। প্রকৃতি জগতের সর্বত্র প্রতিরোধী শক্তির অস্তিত্ব! মনসাকে এমনিভাবেই দেখেছেন কবিরা । কখনও তিনি বেহুলাকে সাহায্যও করেছেন বটে। তবে এখানে রূপান্তরক্ষম দেবীর বহুমুখী সত্তার চিহ্নই স্পষ্ট।

লখাই বিবাহের আয়োজনে বার বার বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর বেশ ধরে মনসা পাত্রপাত্রীদের উত্তেজিত করেছেন। লখাইকে দেখা দিয়েছেন সুন্দরীর রূপে। বিদ্যালয়ে তাঁকে দেখে উত্তেজিত হয়েছেন লখাই। বেহুলাকে বৃদ্ধা বেশে মনসা বিবাহ করার পরামর্শ দিয়েছেন।

মনসার ব্যক্তিত্ব অব্যবস্থিতচিত্ত। লখিন্দরের বিবাহসভায় গেছেন, সঙ্গে অহিরাজ। সাপের নিশ্বাসে লখিন্দর ঢলে পড়েছেন। বেহুলা সখীদের নিয়ে মনসা পূজা করে স্বামীকে বাঁচিয়েছেন। এরকম হবার কথা ছিলনা। বিবাহ রাত্রে সর্পাঘাত করানোর কথাই ছিল। এই ধরনের কাণ্ড দেখে চাঁদ সদাগরের প্রদলকে আক্রমণ করতে যখন তিনি হরি সাধুকে উত্তেজিত করেছেন। তখনও তো বিয়েই হয়নি বেহুলার! ঘটনার গতি প্রকৃতি বিবেচনা করতেই কি পারেন না মনসা? নেতা বার বার তাঁকে পরামর্শ দিয়েছেন। নেতাকে বাদ দিয়েই মনসাকে অসম্পূর্ণ বোধ হয়। মনসার ব্যক্তিত্বকে নেতা নিয়ন্ত্রিত নির্দিষ্ট পথে

পরিচালিত না করলে তিনি দেবীত্বে রূপান্তরিত হতেন কিনা সন্দেহ। জগজ্জীবন অবশ্য নেতাকে প্রথম থেকে আনেন নি। আকস্মিকভাবে তাকে পাই পাটন খণ্ডে। চাঁদ পূজা করতে রাজি নন, তখন :

'নেতা পাত্রকে পদ্মা ডাকিল আনিয়া।

কহেন সকল কথা দুঃখিত হইয়া ॥'

এরপর নেতার ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে।

বেহুলা বার বার স্বামীর মৃত্যু মনসার প্রভাবেই হয়েছে, একথা বললেও, মনসা স্বীকার করেন নি। স্বর্গের সমস্ত দেবতার সামনে মনসার সঙ্গে বেহুলার বিতর্কে মনসার চরিত্রগৌরব বাড়ে নি। বিশেষত যখন তিনি ময়নাবতীতে লুকিয়ে মিথ্যাচার করছেন।

'পদ্মা বোলে নেতা যাহ নন্দীর গোচরে।

এই কথা কহ যে মনসা নাই ঘরে ॥'

শিব ধ্যানযোগে সব জানলেন, তখন তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। 'ক্রোধে কম্পমান'শিবের অভিশাপের ভয়ে এলেন মনসা । 'বিবাদী' মনসা- এই মন্তব্য মনসামঙ্গলে বার বার এসেছে। মনসা সত্যি ভয়ঙ্কর বিবাদী। চাঁদের কাছে সামান্য পূজা পেয়েই অবশ্য মনসা তুষ্ট। তাঁকে স্বীকার করার পর মনসা চাঁদকে 'দাদা' সম্বোধন করে বিবাদ মিটিয়ে নিয়েছেন।

'পদ্মা বোলেন দাদা ক্ষেম মোর দোষ।

বিবাদে করিনু ছন্দ না করিহ রোষ ॥'

একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে কর্ম পরিচালনা, পারিপাশিক বিরোধী পরিবেশ, পুরুষপ্রধান সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে এমনভাবে সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে মনসার শক্তির পরিচয় পাই। চরিত্রের এই শক্তি ব্যতিক্রমী ।

মনসা প্রথমে নিম্নবর্গের পেশাজীবী মানুষদের মধ্যে শক্তি সংহত করেছেন। পরে নারী সমাজের সমর্থন পেয়ে ক্রমে ভদ্র সজ্জনদের পরিবারে স্থান করে নিয়েছেন। সনকার পূজা ভক্তি ব্যর্থ হলেও হলেও পুত্রবধূর অনুরোধ অস্বীকার করতে পারেননি চন্দ্রপতি। মনসা এভাবে 'ষোষিতামিষ্ট দেবতা' থেকে গেছেন।

লখিন্দর: লখিন্দর মনসামঙ্গলের নিষ্ক্রিয় নায়ক। তাঁর সক্রিয়তার অভাব আছে। জগজ্জীবন লখিন্দর চরিত্রটিকে কয়েকটি বিশিষ্ট প্রবণতা দিয়ে সামান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন করেছেন। প্রথম দিকে তাঁর মধ্যে নারীদের প্রতি তীব্র আকর্ষণ লক্ষ করি। মনসা নারী রূপে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে কামোত্তেজিত করেছেন। সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ লখাই তখন বিদ্যালয়ে। ধনী পিতার সন্তানের মতো একটু উচ্ছৃঙ্খল মানসিকতার পরিচয় পাই তখন।

কটাক্ষে' ছেড়ির পানে চাহে লখিন্দর।

হাস্য পরিহাস্য করে বানিয়ার কুঙর ॥'

ব্রাহ্মণীকে লখাই বললেন : 'দেখিব তোমার রূপ দাণ্ডাইহ আগে'। এই নির্লজ্জতার পর মনসা তাঁকে নানাভাবে ধিক্কার জানালেন। 'পরের সুন্দরী' দেখে এরকম উপহাস নিতান্তই অন্যায়। নানারকম কুকথা বলে গেলেন মনসা। লখাই মনে মনে দুঃখ পেলেন। নিজ গৃহে নিজের কক্ষে দরজা দিয়ে অভিমান করে থাকলেন। এই ভাব তাঁর অবদমনের ফল। কাম ভাবকে অবদমিত করে রাখার পর যা হয় মাকে সরাসরি বললেন তিনি- 'বিভা দিতে করে অঙ্গীকার'। সনকা তাঁকে কোনোক্রমে তখনকার মতো নিরস্ত করলেন।

কাম সোনাকে পাঠালেন মনসা। কাম সোনা রাত্রে লখাইয়ের সঙ্গে স্বপ্ন দেখিয়ে তাঁর

মামীমা কোসল্যার রূপ ধরে কামোত্তেজিত করলেন-

'সপনে বালার সঙ্গে রতি রস করে রঙ্গে

হৃদয়ে করে আলিঙ্গন'

শুধু কি তাই, প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন:

‘প্রভাতে যাইব জলে সরোবর বটতলে

তুমি আমি হইবে দরশন’

এরকম স্বপ্ন দর্শনের পর স্বভাবতই লখাই চূড়ান্ত উত্তেজিত বোধ করেছেন। স্বপ্নের মতো রহস্যময় মনস্তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ জগজ্জীবন তাঁর কাহিনি বর্ণনায় সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন।

‘আজি যায়া কর তুমি সরোবরে স্নান।

স্বামীর সংহতি হবে ধন পুত্র বান ॥’

সন্তানহীনা কোসল্যা আনন্দিতে মনে সখীদের সঙ্গে গেলেন সরোবরে। বন্ধুদের নিয়ে লখাই হাতে গুলাল নিয়ে সরোবরে হাজির। মাতুলানীকে বলপূর্বক শ্লীলতা হানি করলেন। মনে ছিল কামনার ভাব, কামসোনার স্বপ্ন দর্শনের উত্তেজিত করার ভূমিকা তো ছিলই। লখিন্দরের চরিত্রে এই উপাদানটি জগজ্জীবন দুটি কারণে এনেছেন। প্রথম, এর মাধ্যমে তাঁকে বিবাহ দিতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁর অভিভাবকরা । দ্বিতীয়, মনসার দৈবী সত্তায় যৌবন-সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য সন্নিবেশ করতে চান তিনি। মনসা স্বর্গেও লখাইকে তাঁর পূর্ব জন্মের সময় কাম মোহিত করেছিলেন। মোট কথা লখাইয়ের স্বেচ্ছচারিতায় চাঁদ সদাগর তাঁর পুত্রের জন্য কন্যা সন্ধানে বের হলেন।

লখাইয়ের মধ্যে দ্বিতীয় একটি উপকরণ সর্প ভয়। বিবাহ বাসরে মেনকা যখন জামাতা-বরণ করেছেন, তাঁকে কাজল পরাতে গেছেন, তখন ‘কাজল দেখিয়া বালা ডরাসে পলায়'। কেন এই বিচিত্র ব্যবহার? কারণ জানিয়েছেন তিনি :

‘কাল সর্পতে খাইল মোর ছয় ভাই।

কাজল দেখিঞা আমি বড় ভয় পাই ॥’

এই ভয় তাঁর মনে সুতীব্র। বিবাহসভায় মনসা এলেন। সঙ্গে তাঁর অহিরাজ। মনসার নির্দেশে অহিরাজ বর-লখিন্দরের মাথায় ছাতার মত ফণা ধরলেন।

‘শুনিয়া পদ্মার কথা অহিরাজ তুলে মাথা

ছত্র ধরে বালার উপরে।'

কিন্তু সাপের স্পর্শ বা আভাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লখিন্দর বিষক্রিয়ার মতো অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

'পাইয়া বিষের তাপ ফিরিয়া দেখিল সাপ

ঢলিয়া পড়িল লখিন্দরে।'

অহিরাজ দেখামাত্র এই ব্যবহার মনস্তত্বসম্মত বলেই মনে হয়।

উক্ত সর্প ভীতি অমূলক নয়। আগের ছয় দাদা এক দিনে সর্পদংশনে মারা গেছেন। মাও দেখিয়েছেন ভয়। বলেছেন তিনি ধন্বন্তরীর কথা, তার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল : 'বিবাহ রাত্রিতে পুত্র খাবে বিষহরি'। মায়ের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় একটু ব্যক্তিত্ব দেখাবার জন্যই লখাই বললেন : 'কপালের লেখা যত অযতনে হয়।' এরকম কথা বলতে ভালো। কিন্তু কাজল দেখে ত্রস্ত, সাপ দেখে অজ্ঞান লখাইয়ের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহই জাগে।

বিবাহ বাসরে শালাজরা লখাইয়ের সঙ্গে বেশ ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করেছেন। খুব বেশিক্ষণ সেসব সহ্য করতে পারেন নি লখাই। শঙ্খ সাধুর স্ত্রী তাঁর গায়ে ছিটিয়েছেন জল, পরে

'কাঁচা সরিষার তেল হাতে লৈয়া গেল

বালার চক্ষে মারে ছিটা'

চোখে জল বের হয়ে যায় তাঁর। লখাইও তাঁকে যথেচ্ছ মন্দ কথা শুনিয়ে ছেড়েছেন। 'স্বামী নাই ঘরে'- তাই তোমাদের এত বিচিত্র ব্যবহার! রাগত লখাইয়ের তীব্র কথা, বিয়ের অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বোধ হয় না। তাঁর কথা :

'আমি কি সহিব মোর এত অপমান।

আগেত কাটিব নাক পাছে দুই কান ॥'

কাণ্ড দেখে বেহুলার মাথা হেট। বিষয়টি লখাইয়ের স্বভাবের অন্তর্গত। ছয় দাদার মৃত্যুর পর বয়সকালে পিতামাতার সন্তান অতিরিক্ত আদরে মানুষ। ফলে তাঁর মধ্যে এরকম মনোভাব লক্ষ করি।

চম্পলা নগরে আসার পথে লখাই-বেহুলা এসেছেন চৌদলে চেপে। বেহুলার বিচিত্র বালিকা-সুলভ প্রশ্ন আর লখাইয়ের উত্তর এই পর্যায়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে উপস্থিত। এই কথোপকথনে মনে হয় বেহুলার কাছে অভিভাবকোচিত গাম্ভীর্য রক্ষার চেষ্টা করছেন তিনি। যদিও ব্যক্তিত্বের বিচারে বেহুলার পাশে তাঁকে মোটেই দৃঢ় চরিত্রের বলা যায় না।

বিবাহ রাত্রের পর মেড়ঘরে রাত্রিবাসের সময় লখাইয়ের দুটি প্রবণতা তীব্র হয়েছে। পাশা খেলতে খেলতে সামান্য স্পর্শ হবার সঙ্গে সঙ্গে বেহুলার প্রতি জেগেছে কাম ভাব। তাঁর প্রার্থনা :

‘দেহ আলিঙ্গন দান রাখহ আমার প্রাণ

ঘঙ্গট ঘুচাহ মুখ চাঅ।’

বেহুলা নানাভাবে নিরস্ত করলেন স্বামীকে। নীতি, সংযম আর ধর্মকথা শুনতে শুনতে লখাই ক্লান্ত। তাঁর তখনও ইচ্ছা অবারিত :

‘তুমার যৌবন দেখি প্রাণ নহে স্থির।

জলিল মদন অগ্নি দহিল শরীর।’

কামনার তীব্রতা যতই হোক, বেহুলার তৎপর ও সুচারু ব্যবহারে নিজের কাম-ইচ্ছা অবদমন করতেই হল। এজন্যই লিখেছি লখাইয়ের ব্যক্তিত্ব তুলনায় মৃদু।

কাম প্রবৃত্তি অবদমিত হবার পর লখাই ক্ষুধা অনুভব করলেন। শ্বশুরবাড়িতে লজ্জায় ভালো মতো খাওয়া হয়নি। 'বাসরে ভোজন আমি না করিল ডরে।' এখন এই মেড়ঘরে কিভাবে রান্না হবে- লখাইয়ের মতো আদুরে যুবক সেসব কথা শুনবেন কেন? তাঁর পরামর্শ বা আদেশ হল-

‘বালা বোলে নারিকেল তিহড়ি করিয়া।

অন্ন রান্ধ সুন্দরী মঙ্গল চাউল দিয়া ॥

ভৃঙ্গারের জলে বান্ধ যেমন তেমন।

মহাসুখে বিদ্যাধরী করিব ভোজন ॥'

বেহুলা মনসাকে স্মরণ করতে দেবী পার্বতী অন্নপূর্ণা রূপে তাঁকে রান্নার বস্তু যোগালেন। রান্না হল। ততক্ষণে লখাই ঘুমিয়ে পড়েছেন। বেহুলা বহু চেষ্টা করেও জাগাতে পারলেন না তাঁকে। তারপর নিদ্রালি-র প্রভাবে বেহুলাও ঘুমিয়ে পড়লেন। লখাই-এর অস্থিরিচিত্ততা, জেদ এই আচরণ টুকু স্পষ্ট।

ছয় মাস ভাসানযাত্রার পর লখাই-এর শবদেহ নিষ্ক্রিয় ভাবে পড়ে থাকল। নৃত্য দেখিয়ে বেহুলা নানাভাবে অভাবিতপূর্ণ সক্রিয়তা দেখিয়ে স্বামীকে বাঁচালেন। জেগে উঠেই লখাইয়ের মধ্যে জেগে উঠল পুরুষসত্তা। তাঁকে নর্তকীর বেশে দেখে তাঁর কথা :

'বালা বোলে শুন বালি কুলে লাগাইলা কালি

তোর কেনে অনুচিত কাজ।'

দেবতারা প্রবোধ দেবার পর লখাইয়ের অহঙ্কার দূর হল। ফেরার সময়, গগড়িয়ার ঘাটে পৌঁছে বেহুলার অনুরোধে বিচনি প্রস্তুতি করে দেবার পরও তাঁর মনে অভিভাবকত্বের আকাঙক্ষা গেল না। চম্পালির সংবাদ শোনার পর বেহুলাকে প্রশ্ন করলেন এতক্ষণ একা একা তিনি থাকলেন কিভাবে।

'প্রভাতে গেলেন সতী সন্ধ্যা হৈল রূপবতী

আজি তোর মতি হৈল ভিন্ন।

শুনিয়া চম্পলার লোকে কি বোলিবে তোকে

মোকে বালা হৈল স্ত্রী অধীন ॥'

বেহুলার ঝটিতি জবাব। 'জল মধ্যে' ভাসার সময় তাঁকে তো কেউ রক্ষা করে নি! পদ্মার দুষ্ট ব্যবহার, জলের দুষ্ট ব্যক্তিদের অন্যায় কাণ্ড কারখানা- সকলের মধ্যে তাঁকে কেউ তো রক্ষা করেনি! এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন কেন লখাই!

'শুনিয়া বালীর বাণী বানিঞার শিরোমণি

লজ্জাতে রহেন হেট মুখে।'

লখাই চরিত্রটিকে এজন্যই মনে হয় নিষ্ক্রিয়। জগজ্জীবন তাঁর মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য ভরে দিয়েছেন। তাতে লখাই চরিত্রের গৌরব বাড়ে নি। বেহুলার উজ্জ্বল উপস্থিতিতে লখাইকে আরও নিষ্প্রভ লাগে।

চাঁদ সদাগর: মনসামঙ্গল কাব্যধারায় তো বটেই, সমগ্র বাংলা সাহিত্যেই চাঁদের মতো পৌরুষ-ব্যঞ্জক চরিত্র উন্নতস্বভাব আদর্শবান মানুষ বেশি নেই। নেই বললেই ঠিক হয়। চাঁদ এদিক থেকে তাঁর আরাধ্য দেবতা শিবকেও অতিক্রম করে গেছেন মনে হয়।

অভিজাত্য পরিবারের সন্তান। ধনবান কোটীশ্বর আর কলাবতীর সন্তান চন্দ্রপতি। শিবের বরে তাঁরা সন্তান রূপে পেয়েছেন তাঁকে। জন্মানোর আগেই শিব তাঁর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে দিয়েছেন যেন।

'শিব বোলে পুত্র তোর হৈয়া ভক্ত হবে মোর

আমা বিনে না পূজিবে আন।'

একে প্রাথমিকভাবে বিধাতা নির্দিষ্টই বলতে হয়। জন্মের আগেই যেন চন্দ্রপতির ভাগ্য আদর্শ নিহিত অন্তদ্বন্দ্ব যেন নির্দিষ্ট হয়ে গেল। জীবন আদর্শ আর জীবনের প্রধান ছন্দ তাঁর নিদিষ্ট করেছেন কবিও। মাত্র ষোল বছর বয়স যখন তখনই।

'ষোল বৎসরের হৈল সাধু চন্দ্রপতি।

শঙ্করের সেবা করে একান্ত ভকতি ॥

অন্য দেবগণ যদি পূজে লোকজন।

তার সনে বিবাদ করএ সর্বক্ষণ ॥'

একে এক ধরনের সাম্প্রদায়িকতা বলে গণ্য করতে হয়। একমুখী আদর্শ এরকম ফল নিয়ে আসতে পারে। আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে যা সত্য বলে মনে হয় তার বাইরে অন্য কোনো সত্যই সম্ভব নয়- চন্দ্রপতির জেদি ব্যক্তিত্বের উৎসে এই মনোভাটি কাজ করে।

পিতা দিলেন বিবাহ। সন্তান হল ; পর পর ছটি পুত্র। মারা গেলেন পিতা। সাধারণভাবেই একটি চলমান জীবন প্রবাহ। চন্দ্রপতির মতো মানুষ অবশ্য এরকম সুখী সাধারণ নির্বিবাদ জীবন যাপন করেন না। ছয় পুত্রের বিয়ে দেবার পর একদিন তীব্র এক জীবন সমস্যার মুখে পড়লেন তিনি। শিব ডেকে পাঠালেন তাঁকে। মনসা তাঁর পূজাপ্রার্থী। ষোল বছর বয়স থেকে যে প্রবণতা ও আদর্শে স্থিত ছিলেন, শিবের অনুবন্ধ শুনে তা সচকিত হয়ে উঠল। প্রশ্ন করলেন তিনি :

'গঙ্গাজল থাকিতে কেনে অন্য জল খাই।

বট বৃক্ষ ছাড়ি কেনে সহড়াতলে যাই।।'

কোন সাহসে মনসা তাঁর পূজা আশা করেন? স্বামীর ঘর করতে না পারা এক চোখ মনসা শিবের তুলনায় অত্যন্ত হীন তাঁর কাছে। দেবী হিসেবেও নিকৃষ্ট। মনুষ্যেতর প্রায়।

চন্দ্রপতির এই ব্যবহার অহঙ্কারী, উচ্চম্মন্য, অন্য আদর্শ বা সত্য সম্পর্কে অশ্রদ্ধা তাঁর প্রকৃতিগত। স্বভাবতই তাঁর শান্তিপূর্ণ সমৃদ্ধিমান জীবনে এল ভয়ঙ্কর চঞ্চলতা। নেতার পরামর্শে চাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করতে এসে ব্যর্থ হলেন মনসা।

'ক্রোধ হইয়া বোলে চান্দ শুন ভাতার ছাড়ি।

যাচিয়া চাহিস নাকি হেমতালের বাড়ি ॥'

সুতরাং শুরু হল সংগ্রাম। চাঁদের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর প্রকৃতির মতো নিষ্ঠুর নির্মম এক দৈব শক্তি নিত্য সংঘর্ষমান হলেন।

'একদিনে ছয় জন মৈল চান্দোর নন্দন

শুনি লোকে করে হায় হায়'

পুত্ররা মারা গেল- চাঁদের আদর্শের উত্তরাধিকার থাকল না। শিব তো তাঁকে রক্ষা করলেন না! এই একটি মাত্র খেদ নিয়ে মাথায় হাত দিয়ে দুঃখ প্রকাশ করলেন খানিক। মনসা রথে ভর করে এসে বললেন-

'শুন চান্দো দুরাশয় জিয়াবো পুত্রছয়

যদি মোকে দেঅ কুলপানি'

চাঁদ একথা শুনে প্রলুব্ধ হলেন না। ছয় পুত্রের মৃতদেহ একদিকে, হাহাকার, বেদনার সারাৎসার ; অন্যদিকে লোভ, আদর্শভ্রষ্টতাকে জয় করার প্রত্যয়। চাঁদ দ্বিতীয়টিই বেছে নিলেন। বরং এটিই শ্রেয় বোধ হল। কারণ মনসা তো আর ক্ষতি করতে পারবেন না। 'আজি হৈতে বিষহরি কি করিবে মায়াধরি'। উদাসীন, সংসার বিরক্ত সন্ন্যাসীর কথা নয়- দৃঢ় চিত্ত মহৎ প্রাণ এক বীর মানুষের ভাব এখানে স্পষ্ট।

চাঁদকে স্নেহহীন বলা যায় না। পুত্রদের সঙ্গে সতী হবার জন্য পুত্রবধূরা গেলেন। মৃতদেহ চিতা থেকে চুরি হয়ে গেল মনসার মায়ায়- তাড়কা-রাক্ষসীর কার্যকুশলতায়। বধূদের অনুমৃতা হওয়া হল না। বললেন চাদ :

'রহিলেন বধূগণ আনন্দিত মোর মন

রহিল সেই ছয় পুত'

পুত্রবধূদের মধ্যে পুত্রদের স্নেহ সঞ্চার করতে পারা কম কথা নয়। চাঁদ এখানে অপত্য নহে অমলিন।

চাঁদ সহমর্মিতাতেও কম নন। বাইরে কঠোর অন্তরে কোমল তাঁর স্বভাব। অস্থিরতা তাঁর সঙ্গী- প্রতিহত স্নেহ প্রবৃত্তি বলেই মনে হয়। জগজ্জীবন তাই লেখেন 'পুত্র মরণে চান্দোর স্থির নহে মন'। উপরন্তু ছয় বিধবা পুত্রবধূকে দেখে তাঁর মনে গভীর বেদনা জাগে।

'একেত বঞ্চিল বিধি পুত্রশোক দিয়া।

দ্বিগুণ দগধে প্রাণ বিধবা দেখিয়া।।'

কন্যাসমা পুত্রবধূদের অকাল বৈধব্যের অন্যতম কারণ তো তিনি, তাঁর জেদি মনোভাব। সুতরাং পত্রশোকাতুর স্ত্রী আর এই ছয় বিধবার সামনে জীবন যাপন হল দুর্বিষহ। তা না হলে এ অবস্থায় বাণিজ্য যাত্রায় ইচ্ছা হত না তাঁর।

সনকা চাঁদের পরিকল্পনার কথা শুনে, বললেন :

'খাইবার কেহ নাই যত আছে ধন।

কি কার্যে যাইবে প্রভু দক্ষিণ পাটন ॥'

তাঁর অন্য ভয়ও ছিল পথে বিপদ হতে পারে। কিছু একটা হলে তাঁর কী হবে? চাঁদ আসলে ব্যস্ত রাখতে চেয়েছেন নিজেকে। নৌকা প্রস্তুত হল। দৈবজ্ঞ বললেন দক্ষিণ পাটন যাত্রায় বিপদ আছে। চাঁদ ভাগ্য মানেন না। দৈবজ্ঞকে বন্দী করলেন। পরীক্ষা করে দেখবেন তিনি দৈবজ্ঞ যা বলেছেন ঠিক কিনা। বলে গেলেন তাই :

'সত্য হৈলে আমি দিব পঞ্চগ্রাম।

মিথ্যা হইলে তোমায় করিব অপমান ॥'

বিবাহবাসরে সাপের আবেশে লখাই ঢলে পড়ার পর চাঁদের কান্না অন্যত্র তাঁর ব্যবহারের সঙ্গে মেলে না। বস্তুত এই কান্না আসন্ন পরাজয় অপমানের অভাস নিয়েই আসে বলে মনে হয়।

'চান্দোর ক্রন্দনে কান্দে যত সৈন্যগণ।

হায় হায় উত্তরোল বোলে সর্বজন ॥'

সনকাকে গিয়ে কি বলবেন তিনি? চাঁদের অপত্যস্নেহের এ এক প্রমাণ।

ধনলোভের সঙ্গে সঙ্গে ধনের অহঙ্কারও চাঁদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সাহো বেনের আত্মীয় পরিজন ক্রমাগত নানারকম উপহার দিতে থাকলেন। আশীর্বাদের সময় চাঁদ বললেন-

'মোর ঘরে হীরা মতি গড়াগড়ি যায়।

ঘুচাহ জঞ্জাল বালা বড় দুঃখ পায় ॥'

'শিবের প্রসাদে' তাঁর ধনের অভাব নেই। এই প্রবণতাটিকে মোটেই ইতিবাচক গুণ বলা যাবে না। মোট কথা, চাঁদ দোষে গুণে একজন অভিমানী মানুষ। সাধারণ মানুষ তিনি নন- অনেকটাই যেন মহাকাব্যিক চরিত্র। তবে তাঁর হাসি কান্না অভিমান অহঙ্কার যতই বড় মাপের হোক, তাঁর সূচনায় চেনা জগতের ভূমি ও ভূমিকাটি অস্বীকার করা যায় না।

প্রথমে পুত্র যে মারা গেছে, চাঁদ বিশ্বাস করতে চান নি। সনকার কথায় তাঁর অবিশ্বাস কারণ মেড়ঘরে কোন কিছু প্রবেশ করতে পারবে না। পরে যখন দেখা গেল অবিশ্বাস্য ব্যাপারই ঘটিয়েছেন মনসা, তখন সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছেন তিনি। পরাজয়বোধ, বেদনা, অপত্যস্নেহ, আত্মগ্লানি একসঙ্গে তাঁর মনে চেপে বসল।

'বিবাদে মারিল পুত্র ত্রিভুবনে লাজ।

বৃদ্ধকালে আর জীবনে কিবা কাজ ॥'

সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত এক পরাজিত মহৎ মানুষ। আজ মনে হচ্ছে সনকার নিষেধ মানলেই হত। ধন্বন্তরীকে বললেন তিনি থাকতে এমন হল কেন। ধন্বন্তরী জানালেন দেবতার সঙ্গে মানুষের বিবাদ অসম- মানুষের পরাজয় অনিবার্য।

'দেবতায় বাদে জিনে নরের শকতি'

ধন্বন্তরী চাঁদের অনুরোধে সাতালি পর্বত থেকে ঔষধ আনতে গেলেন। সেখানেও ব্যর্থ তিনি। তাঁর মৃত্যু বীজ জেনে 'মূল কন্ধে' আঘাত করিয়ে- শিষ্যদের হাত থেকে ঔষধ ছলনা করে কেড়ে নিয়ে মনসা ধন্বন্তরীকেও মেরে ফেললেন। সেই দুঃসংবাদ শুনে-

'হায় হায় শব্দ করে কান্দে চান্দে উচ্চস্বরে

কান্দে সাধু আউলাঞা চুল'

চাঁদের সমস্ত প্রতিরোধ সম্ভাবনাও শেষ হল।

এই সময় মনসা দেখা দিলেন। আবার তাঁর কথা ফুলজল দাও। চাঁদ এসময় যা বললেন তাতে তাঁর চরিত্রের ন্যায় ও দাঢ্য প্রমাণ হয়।

'চান্দো বোলে পদ্মা তুমি বড় দুরাচারী।

দুঃখের উপর দুঃখ দিস ঢেমন ভাতারী।।'

সাত সন্তান এর মৃত্যু- ছোট পুত্রবধূর অনন্ত যাত্রার পর এমন কথা যিনি ভাবতে পারেন তিনি মহৎ প্রাণ। মনে রাখতে হবে এক গ্রামীণ উত্তরাধিকার এই কাব্যধারার। পৃষ্ঠপোষকও গ্রামসমাজ- তাদের চাহিদা কম, রুচি অনুন্নত। তবু এই পরিমণ্ডলে তাদের মতো চরিত্র ভাবনা বাঙালির শ্লাঘার বিষয়।

সবাই ক্রমাগত নির্বন্ধ করতে থাকলেন। সমস্ত অর্জিত সম্পদ যা প্রকৃতির ভীষণ কোপে ধ্বংস হয়েছিল ঘাটে লেগেছে, সাত পুত্র বেঁচে ফিরেছেন- রূপকথার সমাপ্তি। তার মধ্যেও চাঁদ যখন মনসাকে পুজা দিতে চান না- সব দেবতাদের সনির্বন্ধ অনুরোধও অস্বীকার করার সক্ষমতা যাঁর তাঁর ব্যক্তিত্বকে বাংলার আসর সাহিত্য বেশ দক্ষতার সঙ্গেই রচনা করেছে। পূজার আয়োজন সম্পূর্ণ যখন, তখনও তাঁর ভাবনা :

'হেট মুণ্ডে রহে চান্দো দুঃখিত অন্তরে।

এতদিনে পদ্মা বাদ সাধিলে আমারে ॥'

ধ্বস্ত পরাজিত আদর্শচ্যুত চাঁদের এই আন্তরিক দুঃখ থাকায় একে রূপকথার চরিত্র বলতে পারছি না। সব দেবতাকেই পূজা করলেন তিনি। শেষে-

'নানা পুষ্প লঞা চান্দো দিল বাম হস্তে।

হাতে হাতে পদ্মাবতী বন্দিলেন মস্তে ॥'

চাঁদের মতো পুরুষ বাংলা সাহিত্যে সত্যি বিরল। মনসামঙ্গল কাব্যটি এক অর্থে ব্রতকথা জাতীয়। ব্রতকথার প্রধান চরিত্র সংকটগ্রস্ত হবার পর কোনো নির্দিষ্ট দেবতাকে পূজা করে সংকট থেকে পরিত্রাণ পায়। এই আদল মনসামঙ্গলে আছে। কিন্তু মনসামঙ্গলের

প্রধান চরিত্রটির ভূমিকা নিশ্চিত ভাবেই অন্যরকম। চাঁদ দেবতার প্রতিস্পর্ধী। এই চরিত্রলক্ষণটির জন্যই তিনি দৃপ্ত, বাতিক্রমী, স্বতন্ত্র ও বলিষ্ঠ এক উচ্চারণ।

সনকা: মনসামঙ্গল কাব্যধারায় সনকার বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত প্রভাবী। 'সনক সাধুর কন্যা' অতি অল্প বয়সে চন্দ্রপতির সংসারে এসেছেন। সন্তান জন্মেছে একে একে সাতজন। প্রথমে ছয় পুত্র- গদাপাণি, চক্রপাণি, শুলপাণি, হলধর, নীলকণ্ঠ আর সূর্যাবর। তাদের বিবাহ দেবার পর সনকার সংসার ভর ভরন্ত। এসময় স্বামীর জেদ আর ভয়ংকর দৈব শক্তির প্রকোপ- ঘরে বাইরে এই দুই বিপরীত টান ও চাপ সনকার সুখের সংসারকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল। দুঃখ করা ছাড়া তাঁর আর কিছুই করার নেই। স্বামীর বিরুদ্ধতা করা স্বপ্নেও দেখবেন না সে সময়কার গৃহবধূ। মনসার প্রতি ভক্তি করুণা ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়া কিছুই করতে পারেন না তিনি। সনকার মধ্য দিয়ে সে সময়কার এক নারীর অসহায় ভাবটাই স্পষ্ট করেছেন কবি।

এক দিন মনসা তাঁর ছয় পুত্রকে হত্যা করলেন। নিরুপায় শোকাচ্ছন্ন সনকা।

'কান্দে সোনা বানিয়ানী দুই চক্ষে পড়ে পানি

মুষ্টা হানি চূর্ণ করে হিয়া।

শোকে অচেতন মন দূরে গেল পরিধান

মস্তক হানিল শির দিয়া ॥'

এই প্রথম সনকার ক্রন্দনরত মূর্তি দেখা গেল। এই রূপ প্রায় কাহিনির শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে। লখিন্দর বেহুলা আর ছয় পুত্র তাঁর নৌবহর ফিরিয়ে এনেছেন, এই সংবাদ দুর্বলা দাসীর কাছে শোনার পর জগজ্জীবনের বর্ণনা :

'সভার আগে সোনা বানিয়ানী ধায়।

নয়ানের জলে পথ দেখিতে না পায়।।

পড়িয়া উঠিতে নারে বুকে মারে ঘাঅ।

পুত্র পুত্র বলি সোনা ঘন পাড়ে রাঅ॥'

একটি রসাল কাঠে ধাক্কা লেগে পড়ে গেছেন, সেদিকে নজর নেই! 'খসিয়া পড়িল শাড়ি তা না উঠায়'। দুঃখ আর আনন্দের বৃত্ত যখন সম্পূর্ণ- তখনও সনকার মূর্তি প্রায় একই রকম। মধ্যবতী সময় সনকা সর্বংসহা করুণ রসের প্রতিমূর্তি।

স্বামী যখন যা ইচ্ছা তাই করেন। ছয় পুত্র মারা গেল, পুত্র বধূরা অনুমৃতা হতে পারল না- মনসার চক্রান্তে। ছয়টি বিধবা ঘরে ঘুরে ফিরছে। এসময় শ্বাশুড়ির মনের ভাব অকথ্য কথন। চাঁদও এই অবস্থা সহ্য করতে পারছেন না। স্থির করলেন বাণিজ্যে যাবেন। সনকার নিরস্ত করার চেষ্টা করলেন। তাঁর কথা :

'সনকাএ বোলে প্রভু শুন গুণ মণি।

ই ধন সম্পদ দেখি তোমার নিছনি॥'

ধন সম্পদের অভাব নেই। উপরন্তু দূর সমুদ্র বাণিজ্যে বিপদ সুপ্রচুর। তার উপর আছে মনসার বিপক্ষতা। আসন্ন বিপদ থেকে স্বামীকে নিরস্ত করা ছাড়া সনকার উপায়ান্তর নেই। দুরন্ত স্বামী তাঁর কথা শুনলেন না। হঠাৎ শুনতে পেলেন চূড়ামণি দৈবজ্ঞকে বন্দি করেছেন চাঁদ সদাগর। কারণ তিনিও দক্ষিণ পাটনের প্রমাদ সম্পর্কে সাবধান করেছিলেন। সনকার শেষ বারের মতো তাঁকে নিষেধ করার চেষ্টা করলেন। বিশেষ করে বিদেশে কোনো বিপদ হলে তো তিনি জানতেই পারবেন না।

'বিদেশে মরিলে তুমি বার্তা না পাই আমি

বৃদ্ধকালে কি গতি আমার।।'

যাত্রার সময় অমঙ্গল লক্ষণ দেখা যেতে থাকল। আবার আশঙ্কিত সনকা। তাঁর অনুরোধ দৈবশক্তির সঙ্গে প্রতিস্পর্ধা দেখাবার দরকার নেই।

'ধন জনে নাই ভাল বাদ কর কত কাল

মনসাকে দেহ ফুল জল।'

মনসার নাম শুনে চাঁদের ক্ষোভ দ্বিগুণ হল। এসময় মনে হয় সনকার মধ্য দিয়ে নারীর এক চিরন্তন অসহায়তা স্পষ্ট করছেন কবি। একদিকে স্বামীর আদর্শ ও পৌরুষ, উদ্দীপনা আর বাস্তববোধ, অন্যদিকে স্ত্রীর আশঙ্কা, ভয়, দৈবকে স্বীকার করে নেওয়ার প্রবণতা । বড় আদর্শ আর ছোট বাস্তবোচিত ভাবনা- দুই প্রবণতাকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে ভয়ঙ্কর এক সমস্যা গড়েছেন কবি। এ হয়তো সমাজমনেরই দ্বন্দ্ব। সনকা সংসারের ঘেরাটোপে নারী। মনসা মঙ্গলে তাঁর হাহাকার অস্পষ্ট নয়।

চূড়ান্ত লাঞ্ছিত হয়ে চাঁদের মনে হল সনকার কথা শুনলেই হয়তো ভালো হত। এখন নিতান্ত দুর্গত চাঁদ-

‘মস্তকে চুল নাই নাই পরিধান।

কেমতে যাইব আমি চম্পলা ভুবন ॥’

এমনকি সতী সাধ্বী সনকাও হয়তো চিনবেন না। ‘চিনে কি না চিনে মোক সনকা সুন্দরী’ তাই হল। সবাই ঘুমিয়ে পড়ল প্রদীপ নিবিয়ে সনকাও শুয়ে পড়লেন এমন সময় উৎকট রূপ চাঁদ তাঁর শয়নকক্ষে প্রবেশ করলেন। মনসার দেখানো স্বপ্নে সনকা আবার সক্রিয় হলেন। বধূদের ডেকে চোর খুঁজতে লাগলেন তারা। চাঁদের সন্ধান পেয়ে সবাই মিলে মারতে থাকলেন তারা। পূত্রবধূরা মারলেন 'বাড়নার বাড়ি’ সনকা মারলেন লাথি। চাঁদ কোনোক্রমে পরিচয় দিতেই সনকার হাহাকার- বুক চাপড়াতে থাকলেন।

‘সনা বোলে বধূ তোমরা হএ দূর।

চোর নহে চোর নহে তোমার শ্বশুর॥’

আসর-সন্তোষ রচনা, গ্রাম্য হাস্যরসের মোটা দাগ কোথাও কোথাও হয়তো গায়েনদের প্রক্ষেপেও আত্যন্তিক। তবু, সনকার আর্তনাদ শুরু হতেই কাব্যাংশটি শিল্পশোভন হয়ে উঠল। দীর্ঘকাল প্রবাসে আছেন স্বামী। দৈবশক্তির প্রতি শ্রদ্ধা নেই আছে চুড়ান্ত অহঙ্কার-খেয়ালি ব্যবহার। নিত্য আশঙ্কিত এক্ নারী! উপরন্তু ছয় ছয়টি অকাল বিধবা । এদের নিয়ে যে চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার জীবনযাপনে বাধ্য তিনি- তার সঙ্গে ঘরে চোর ঢোকার দুঃস্বপ্ন মনস্তত্ত্বের বিচারেও অসঙ্গত নয়।

স্বামীকে পেয়ে সনকার সেবাযত্ন শুরু হল। তাঁর বক্তব্য- 'মরুক যায়া ধন জন তুমার নিছনি।' তপ্ত তেল দিয়ে মাথায় বসালেন, চাঁদকে নববস্ত্র পরিয়ে সুখাদ্য পরিবেশন করলেন সনকা। এমন সুখের অবসর খুব বেশি পান নি তিনি। চাঁদ বলে যেতে থাকলেন দুঃখের কথা, সনকার মনে ব্যথ্যা জাগল-এর চেয়ে সুখ আর কি হতে পারে। জগজ্জীবনের বর্ণনা :

'দুঃখের কহে কথা শুনে সনা মনে বেথা

মহাসুখে বঞ্চিল বাসহর।'

জগজ্জীবনের এই পংক্তিটি তাঁর চরিত্রানুমান ক্ষমতার পরিচায়ক।

ধন্বন্তরী-বেশে মনসা সনকাকে সন্তানলাভের পরামর্শ দিলেন। সনকার আশা পুত্র লাভ করবেন। ছয় সন্তান মারা গেছেন, নিতান্ত লাঞ্ছনার পর স্বামী কোনো ক্রমে ফিরে এসেছেন। তাই-

'সনা বোলে বাপু মোকে দেহ পুত্র।

পুত্র হৈলে হয় যেন অজর অমর ॥'

সন্তান লাভের বাসনা সনকার অস্তিত্ব রক্ষার বাসনা । মধ্যযুগে নারী পুত্রার্থেই স্ত্রী হিসাবে নীত হতেন। মনসাপূজা করেই সনকা পেলেন লখিন্দরকে।

বিদ্যালয়ে লখাই গিয়ে ফিরেছেন না দেখে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত আশঙ্কিত হয়েছেন একদিন। এই বর্ণনাটি অত্যন্ত জীবন্ত নাট্যগুণসম্পন্ন। বিদ্যালয়ের ব্রাহ্মণ, তাম্বুলির গৃহ, মালিনী, গোয়ালিনী একে একে সবার কাছে গেলেন তিনি পুত্রের সন্ধানে। কোথাও পুত্র নেই শুনে 'কপালে চাপড় মারে বানিয়ানী' কোথাও 'খসিয়া পড়িছে সনার পরিধান শাড়ি', কখনো আবার কাঁদতে কাঁদতে গেলেন তিনি। এই বিবরণে সনকার মাতৃ-হৃদয়ের উৎকণ্ঠার যে পরিচয় পাই তার তুলনা অন্যত্র কম। ছয় পুত্র মরে যে পুত্র পেয়েছেন তিনি, সেই অন্ধের নড়ি ('আন্ধলের আখি') লখাইকে চোখে চোখে রাখতেন তিনি। এই মানসিক অবস্থায় মাতৃহৃদয়ের আশঙ্কা আরও বৃদ্ধি করেছেন কবি।

ঘরে এসে দেখেন সনকা, 'কপাট মারিয়া আছে বালা লখিন্দরে'। বার বার নির্বন্ধ করার পর লখিন্দর তাকে দিয়ে শর্ত করিয়ে নিয়েছেন।

'বালা বোলে বিভা দিতে কর অঙ্গীকার।

তবে ত জননী আমি ঘুচাই দুয়ার।।'

এমন আশঙ্কার কথা সনকা আগে শোনেননি। তিনি তো জানেন মনসার স্বভাব। বিয়ের রাত্রে ক্ষতি না করে কি ছাড়বেন! উৎকঠিত মায়ের ইচ্ছা-

'দ্বার ঘুচাহ বাছা কর স্নান ভোজন।

দাসী করি দিব এক শত নারীগণ।।'

এরকম হলে হয়তো লখাইয়ের কামনার শান্তি হবে- মনসাও শাস্তি দেবার সূক্ষ্ম সুযোগ পাবেন না। মায়ের অনুভূতি কী গভীর দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন তা এখানে স্পষ্ট হচ্ছে। নাই বা হবে কেন, সনকা তো বলেই দেন :

'ছয় পুত্র মরি আমি পায়াছি রতন।

তোমার নিছনি করি যত ধন জন ॥'

পুত্রের কামনাতৃপ্তির ব্যবস্থার সময় দাসী করে দেওয়া, নারীর সম্মানের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তবে তদানীন্তন সমাজের সঙ্গে এই বিষয়টি সঙ্গতিহীন ছিল না।

সনকা এরপর পেলেন অভাবিতপূর্ব নিন্দার আঘাত। মধুসূদন দানীর স্ত্রী কোসল্যা এলেন। লখিন্দরের মামী কোসল্যা। সরোবর থেকে ফেরার পথে তার প্রতি অন্যায় আচরণ করেছেন লখাই। শুনে প্রথমে বিশ্বাস করেননি সনকা। কোসল্যাকে খুব এক হাত গাল মন্দ করলেন :

'সনা বলে শুন বেটি টেট মরু দারি নটি

না বোল শিশুকে কিছু মন্দ।'

মায়ের কাছে পুত্র কখনই বড় হয় না। পুত্রের নামে নিন্দা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। তাঁর কথা-

‘গন্ধ বানিয়ার বালা টেট নহে আলা ভোলা

বদনে দুগ্ধের আছে গন্ধ ॥’

ছেলে যেন তাঁর দুগ্ধপোষ্য এখনও । একটু আত্যন্তিক মনে হলেও সনকার মতো এক বারে ছয় সন্তান হারানো জননীর পক্ষে অবিশ্বাস্য নয় মোটেই।

একটু পরেই সনকা যুক্তি দিয়ে ভেবেছেন- পুত্র তাঁর কাছে কদিন আগেই বিয়ের বায়না করেছেন। এরকম ঘটাটা অসম্ভব নয়। সুতরাং কোনোক্রমে কোসল্যার মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করলেন সনকা।

‘যে হৈল সে হৈল মাও চুপে চাপে ঘরে যাও

পহ্রিয়া সুবর্ণ আভরণ।’

সনকা তাঁকে দিলেন বস্ত্রালঙ্কার। কোসল্যাকে এই ক্ষতিপূরণ দেওয়া তাঁর গভীর বেদনা সঞ্জাত। পুত্রের ব্যবহারে তিনি মোটেই খুশি হন নি। এ সময় সনকার মনে দুটি মনস্তাত্ত্বিক ছন্দ দেখা গেল। সন্তানস্নেহে তিনি অন্ধ আর পুত্রের অন্যায় আচরণ তাঁর ভালা লাগে নি। এই বিপরীত ধরনের মনস্তত্ত্বের টানা পোড়েনের পর যন্ত্রণা দীর্ণ সনকা স্বামীকে না বলে পারলেন না পুত্রের এই অন্যায় ব্যবহারের কথা।

পুত্রের বিয়েতে সনকা অনুমতি দিতে চান নি, কিন্তু অনুমতি না দিয়ে পারেনও নি। বস্তুত বিবাহের ইচ্ছা লখাইয়ের মনে জাগাটা মোটেই প্রকৃতিবিরুদ্ধ নয়। জননীর অপত্যস্নেহের আতিশয্যও তাঁর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবাস্তব নয়। এই দুই স্বাভাবিক-মনস্তত্ত্বের দ্বন্দ্ব সনকা চরিত্রটিকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে। বিয়ে করতে যাবার সময় লখাই বিদায়-অনুমতি নিতে যাবার সময় সনকার কথা :

‘তুমার উপর মনসার অঙ্গীকার।

বিভা রাত্রিতে তুমাক করিবে সংহার ॥

চিন্তা না করিহ বাছা পুত্রখানি।

দাসী করি দিব এক শত বান্যানী ॥'

বিবাহের উদ্যোগ যখন সম্পূর্ণ তখনও স্নেহান্ধ মায়ের আশঙ্কা দূর হল না। তিনি বিবাহকে কোন ক্রমে এড়াতে চাইলেন। মনসার সঙ্গে দ্বন্দ্ব সংঘাত তাঁর অনাকাঙ্ক্ষিত আর দ্বন্দ্ব এড়াবার প্রয়াস তাঁর। দৈবকে উপেক্ষা নয়, দৈবশক্তির সঙ্গে তীব্র সংঘাত নয়, তাঁর বাসনা সংঘাত এড়িয়ে সুখে স্বস্তিতে থাকা।মেড়ঘরে রাত্রিবাস করছেন বেহুলা লখিন্দর, দেবী মনসা যাতে কোনো ভাবেই ক্ষতি করতে না পারেন চাঁদ সে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন- সনকার কিন্তু আশঙ্কা কমছে না কোনো মতেই। সকাল হতেই চাঁদকে ডেকে তুললেন তিনি।

'মেড়ঘরে শুনি যেন কান্দে বধূখানি।

বিবাদ সাধিলে বুঝি বিষহরি কাণী ॥'

চাঁদ বিশ্বাস করলেন না। তাঁর মনে হল পুত্র-পুত্রবধূর প্রতি অহেতুক কৌতুহল এসব। স্বামীর কথা না শুনে সেখানে গেলেন। জানা গেল যা আশঙ্কা করেছিলেন তাই হয়েছে। লখাই মারা গেছেন। তখন :

'হস্তের ভৃঙ্গার সনা মারিলেন পাক।

হা হা পুত্র করিয়া ছাড়িল তিন ডাক।।'

এই আশঙ্কা অহেতুক ছিল না। স্বামী দৈবশক্তিকে উপেক্ষা করেন-অস্বীকার করেন। সনকার আশঙ্কা তাই এক অর্থে স্বামীর প্রবণতার বিরুদ্ধতা করাই। এদিক থেকে বিচার করলে সনকা চরিত্রে চাঁদ সদাগরের আদর্শ সম্পর্কে দ্বিধা, অসম্মতি আর অস্বীকৃতি ধরা পড়েছে। সামান্য হলেও সনকা এখানে স্বামীর আদর্শের সমান্তরাল হয়ে উঠেছেন।

বেহুলা: বিদ্যাধরী বেহুলা- ঊষার রূপান্তর। জাতিস্মর তিনি। ফলে পূর্বজন্মের কথা মনে আছে তাঁর। এই সূত্রে মনসামঙ্গল কাব্যধারায় তাঁর সক্রিয়তা- দুঃখ সহ্য করার বিষয়গুলি দৈব শক্তির অনুসরণ বলে মনে হতে পারে। তবু বেহুলার ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই

মানবিক উপাদানে ঋদ্ধ হয়েছে। বেহুলা চরিত্র পরিকল্পনাতে বাংলার মনসামঙ্গলের কবিদের মহত্ত্ব সৃজন, আদর্শ প্রতিষ্ঠা, সতীত্বের পরাকাষ্ঠা প্রমাণের বাসনা সঞ্চারিত হয়েছে। স্বর্গ মত্যের ভেদ দূর করার অসম্ভব এক শক্তি সঞ্চারিত করেছেন তাঁরা বেহুলার মধ্য দিয়ে, তাই মানবিক চরিত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে কিনা জানি না, বেহুলার মারফৎ বাংলা মনসামঙ্গল কাব্যধারা মহাকাব্যিক রসপরিণতি লাভ করেছে।

বেহুলাকে মনসা বিধবার ছদ্মবেশে বিয়ে করার উদ্যোগ নেবার জন্য উত্তেজিত করার পর গেলেন তিনি ছয় ঘাট সরোবরে। সেখানে যাবার ক্ষেত্রে মা মেনকা তাকে যথাসম্ভব আটকাবার চেষ্টা করলেন। মেনকা বললেন সে বড় ভয়ঙ্কর স্থান। বেহুলা উত্তর দিলেন;

‘রাজপথে সরোবর বন ঝাড় নহে।

নিরন্তর হস্তী ঘোড়া পথ দিয়া বহে ॥’

মেনকার আশঙ্কা 'ঠগ ঢামন চোর’ সেখানে হানা দিয়ে থাকে। তার সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করতেই পারে তারা। বেহুলা বললেন সঙ্গে শতসখী থাকবে। তাছাড়া পিতাকে তো ভয় করে সকলে। মেনকার শেষ যুক্তি সেখানে বড় বড় জোক আছে। বেহুলার যুক্তি : ‘আগে নামাইব আমি যত সখীগণ’ তাদের যদি কিছু না হয় তাহলে স্নান করব। বেহুলাকে মনে হয় যুক্তিনিষ্ট, লক্ষ্য সম্পর্কে অবিচল।

সরোবরে গিয়ে দেখা গেল সব ঘাটেই ব্রাহ্মণী। ইনি ছন্মবেশী মনসা। শেষে সখীরা পরামর্শ দিল: ব্রাহ্মণী স্নান করুন, আমরা 'একদিগ’ দিয়ে নামব। নামার পর সখীদের সঙ্গে ক্রীড়াচ্ছলে ‘বিধবার পায়ে পড়িল গায়ের পানি'। বিধবা ক্ষুব্ধ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে অভিশাপ দিলেন :

‘তোর পায়ের পানিতে ভরিল মোর অঙ্গে।

বিভারাত্রি স্বামী তোর যাইবে ভুজঙ্গে॥’

তীব্র অভিশাপ। যে দেবী বিয়েতে প্ররোচনা দিলেন ছদ্মবেশে, সরোবরে এনে তিনিই দিলেন তীব্র অভিশাপ। বেহুলা এসময়ও যুক্তিনিষ্ঠ- কতকাটা যেন আত্মসচেতনও। শর্ত

করে ডুব দিলেন দুজন। বিধবা ব্রাহ্মণী পেলেন বৈধব্যের সাজ। বেহুলা পেলেন এয়োতির মাঙ্গলিক। ঘাটে ছিলেন পাত্রী খুঁজতে আসা চন্দ্রপতি আর লেঙঘা। চাঁদ বুঝলেন এই নারীর বৈধব্যলক্ষণ নেই। সুলক্ষণা এই মেয়েকেই নির্বাচন করলেন তিনি।

সায়বেনের বাড়িতে গিয়ে বেহুলাকে পুত্রের জন্য নির্বাচন করার কথা ঘোষণা করলেন চাঁদ। সায়বেনেও রাজি। সেই সময় চাঁদ বললেন তিনি পাত্রীকে পরীক্ষা করবেন।

'যদি সিজাইতে পারে লোহার কলাই।

তবে কন্যার বিভা দিব দুর্লভ লখাই ॥'

বেহুলা বললেন তাঁর পিতাকে তিনি চেষ্টা করতে রাজি। বেহুলা একটু বড়াই করেই বললেন : 'কলাই সিজাবো আমি কত বড় কাজ।' সময়কালে অবশ্য বেহুলা ব্যর্থ হলেন। তিনি মুঠি খড়ি নিয়ে বসেছিলেন-'পুড়িয়া সমস্ত খড়ি হৈয়া গেল ছাই'। লোহার কলাই সিদ্ধ হলনা । এসময় বেহুলা কেঁদে উঠলেন। স্মরণ করলেন পূর্ব-জীবন, মনসার 'সত্য' করার কথা মনে করিয়ে দিলেন। মনসা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন 'সঙ্কটে করিব রক্ষা'। আজ সে কথা মনে করিয়ে মনসাকে ডাকতে থাকলেন তিনি। মনসা গেলেন অগ্নির আছে. তাঁর নির্দেশে অগ্নিদেব বেহুলার অভীষ্ট কাজ করলেন।

'পদ্মার আদেশে অগ্নি জ্বলিল আপনি।

সিজায়া লোহার কলাই হাসে বানিয়ানী ॥'

অন্যান্য মনসামঙ্গলকাব্যে প্রথমে চেষ্টা করেন সায়বেনের স্ত্রী, ব্যর্থ হন।'আড়াই হালা' ঘাসপাতা নিয়ে বেহুলা লোহার কলাই সিদ্ধ করেন। সেখানে বেহুলর মধ্যে দৈবশক্তিতে বিশ্বাস আর জগজ্জীবনের রচনায় বেহুলাকে দৈবশক্তির সহায়তা প্রমাণ করা গেছে। এই বেহুলা আদর্শায়িত বেহুলা- সমাজের আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ। বিয়ের রাত্রে অহিরাজ মনসার নির্দেশ মেনে লখিন্দরের মাথায় ছাতা ধরার ফলে লখিন্দর আবিষ্ট হলেন।

'পাইয়া বিষের তাপ ফিরিয়া দেখিল সাপ

ঢলিয়া পড়িল লখিন্দরে।'

সবাই কাঁদতে আরম্ভ করলেন। বেহুলা স্থির করলেন যাবেন তিনি কালীদহে। সখীদের নিয়ে গেলেন। শ্বশুরকে সম্ভবমতো প্রবোধ দিয়ে গেলেন। কালীদহের পূজা ভয়ঙ্কর অভিচার। 'জিহ্বা কাটি অর্ঘ' দান করে, 'কেশ কাটি চামর' ঢুলিয়ে, 'দুই চক্ষ পদ্ম ফুলে'-র প্রতিকল্প করে দেবী পূজা করলেন বেহুলা । শুধু কি তাই- 'স্তন কাটি প্রদীপ' জ্বালালেন তিনি। মনসা প্রথমে সাপের ভয় দেখালেন। বেহুলার সখীরা ভয়ে স্থান ত্যাগ করল। কিন্তু 'সুন্দরী রহিল একেশ্বর'। শেষে গলায় তীক্ষ্ণ কাটারি দিয়ে মারা যেতে চাইলেন বেহুলা । তখন মনসার কৃপা লাভ হল।

'মহামন্ত্র পদ্মাবতী করিল হুঙ্কার।

উঠিয়া বসিল বালা বণিক কুমার ॥'

বেহুলার শরীর 'খান খান' তাও মন্ত্রপুত 'নীর'এর স্পর্শে-'নৌতন হইল যেন বালীর শরীর'। অন্যান্য মনসামঙ্গল কাব্যেও এইরকম ঘটনা পাই। মনসার রাজ্যে গিয়ে বেহুলা তার সঙ্গে তর্ক করে নিয়ে এসেছেন অদ্ভুত জাদুশক্তি সম্পন্ন তরল। যাই হোক, বেহুলার এই সক্রিয়তা দৈবশক্তির সঙ্গে সহযোগিতার ফল। দৈব প্রবল ফলে মনুষ্যত্ব সামান্য আড়াল হয়েছে।

শঙ্খ সদাগরের স্ত্রী লখাইয়ের সঙ্গে রঙ্গ ব্যঙ্গ করার পর লখাই বেশ ক্ষুণ্ন হবার পর বেহুলার ব্যবহার অনেকটাই মানবিক।– 'হেট মাথা করি বালী মনে মনে হাসে'। ব্রীড়াবনত কিশোরী বেহুলাকে এখানে বেশ জীবন্ত মনে হয়। চম্পাই নগরে চৌদলে করে আসার সময় নানা রকম প্রশ্ন করেছেন বেহুলা । সে সময় তাঁর ব্যবহার নেহাৎ এক বালিকা বধূর মতো।

বাসরঘরে বেহুলা-লখিন্দর পাশা খেলছিলেন। লোকচার বলে এই খেলার আয়োজন হয়েছে। লখিন্দরের কথা :

'লজ্জা পরিহরি খেলাতে দেহ চিত।

বিভারাত্রি পাশা খেলিতে উচিত ॥'

বেহুলা রাজি নন। 'হারিলে তুমাকে আমি কি দিব অবলা' এ প্রশ্নের উত্তরে লখিন্দর কাম বাসনা প্রকাশ করলেন।

'বালা বোলে আমি দিব অষ্ট অলঙ্কার।

তুমি সে হারিলে দিবে সুরতি শৃঙ্গার ॥'

খেলতে খেলতে 'কাড়া কাড়ি করিতে পরশা গেল অঙ্গ'- লখিন্দরের কামবাসনা জাগল। ক্রমাগত কামনা প্রকাশ করলেন লখিন্দর। বেহুলা তাঁর প্রার্থনা পূরণ করলেন না। এ সময় তার সংযত শান্ত ব্যবহার বেশ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বোধ হয়। তার স্পষ্টকথা ছমাসের আগে স্বামী স্ত্রী সাক্ষাৎ সম্পর্ক হওয়া শাস্ত্রানুমোদিত নয়। উপরন্তু তিরস্কার :

'কে তোকে সজ্জন কহে সজ্জনের বুদ্ধি নহে

কর হাড়ি চণ্ডালের কর্ম।'

বেহুলাকে লখাই বললেন- 'নারীর যৌবন' ক্ষণস্থায়ী- ভাদ্র মাসের তালের মতো। বেশিদিন স্থায়ী নয়। বেহুলাও জবাব দিলেন:

'নারী আর নারিকেল আর গুয়া তাল।

কাঁচায় উত্তম নহে পাকিলে হয় ভাল ॥'

শেষে বেহুলা বললেন, আজকের রাতে মনসার তীব্র কোপের সমূহ সম্ভাবন! আজকের রাত কাটুক ('আজিকার রাত্রি প্রভু শুভে শুভে যায়') কাল সকালে তিনি স্বামীর অনুরোধ রক্ষা করবেন। কাহিনির পরিণতি আমরা জানি। লখিন্দর মারা গেলেন। বেহুলার মনে পড়ল স্বামীর সেই আকুল দেহপিপাসার কথা। অবদমিত কামনা তিনিও প্রকাশ করলে এই অবসরে। তার কথা :

'গায় তুল সুরতি দেঙ মনে হউক সুখ।

উঠিয়া সুরতি লেঅ হৃদয় ভরুক ॥'

বেহুলা এখানে সম্পূর্ণ মানবিক। তার আর্তনাদ খুবই জীবন্ত বোধ হয়।

দেহ পিপাসা না মেটায় লখাই ক্লান্ত হয়ে বেহুলাকে বললেন তাঁর ক্ষিদে পেয়েছে। এ সময় রান্না করার চেষ্টা করেছেন বেহুলা। দেবতার সাহায্য তাকে এই সঙ্কট ত্রাণে সাহায্য করেছে। বেহুলা মনসাকে ডেকেছেন, 'সঙ্কটে স্মরণ করে ঊষা বিদ্যাধরী' 'অন্নপূর্ণা রূপে পার্বতী' তাঁকে সব দ্রব্য যোগালেন। এরপর যতই বলুন কবি- 'বাপের ঘরে থাকিয়া রন্ধন ভাল জানে' এতে তার কৃতিত্ব প্রমাণিত হয়না। কারণ তিনি দৈব সাহায্য পাচ্ছেন এখানে:

'যেদিগে বাঢায় হাত সাহোর নন্দিনী।

অন্নপূর্ণা নানা দ্রব্য যোগান আপনি।।'

যাই হোক, রান্না করার পর কোনোভাবেই স্বামীকে জাগাতে পারলেন না বেহুলা। রান্নাটা কেবলমাত্র তার অসম্ভব শক্তির প্রমাণ হিসেবেই থেকে গেল। বেহুলার সক্রিয়তা প্রমাণের জন্যই সম্ভবত সমস্ত রান্না করা ব্যঞ্জন নিয়ে ভরে রাখলেন 'পাতিলে'। এরপর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। আগেই লিখেছি এই ঘটনাটিকে দৈব প্রভাব মুক্ত, প্রতীক ধর্ম নিরপেক্ষ, মানবিক ঘটনা বলে গ্রহণ করা যাচ্ছে না। কাহিনির উপান্তে বেহুলা ডোমনী বেশ ধরে এসেছেন চাঁদের গৃহে। সনকাকে নিয়ে গেছেন সেই বাসরে। সেখানে খাদ্যবস্তু ছমাস মেড়ঘরে থাকা সত্তেও নষ্ট হয়নি।

'যেই মাত্র সোনকা হাড়িতে দিল হাত।

হাড়িতে পাইল উত্তম ব্যঞ্জন ভাত ॥'

বস্তুত, বেহলাকে এইরকম অপার্থিব শক্তির সহযোগে গড়ে তুলেছেন মনসামঙ্গলের কবিরা। ফলে বেহুলাকে কখনো কখনো নীরক্ত দৈব সঞ্চালিত পুতুলধর্মসম্পন্ন প্রভাবিত চরিত্র বলে মনে হয়।

বেহুলাকে সোনেকা যখন তীব্র ভৎর্সনা করলেন, তার পুত্রের মৃত্যুর জন্য তাকে দায়ী

করলেন, তখন বেহুলার উত্তর ছিল :

'মরিল পুত্র তুমার মোর কুলক্ষণে।

আর ছয় পুত্র তুমার মরিল কেমনে ॥'

বেহুলার এ প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া সনকার পক্ষে সম্ভব ছিল না। যুক্তির বলে বেহুলা শ্বশুরকে রাজি করালেন- যাবেন তিনি স্বামীর শরীর নিয়ে। পারলে ফিরিয়ে আনবেন স্বামীকে, নচেৎ আর ফিরবেন না।

যাত্রার সুচনায় জলে ডুবে দেখলেন বেহুলা সবই শুভ। তার দৃঢ় প্রতায় : 'অবশ্য পাইব স্বামী কহিল নিশ্চয়'। এই অনন্য দৈবনির্ভরতা তাকে চাঁদ সদাগরের ঠিক বিপরীত মেরুতে স্থাপন করেছে। 'সাপের সাপুড়া', 'সুবর্ণ কাটারী' নিয়ে বেহুলা চাপলেন ভেলায়। মৃতদেহের শিরোদেশে একটি ভালো জাতের মোরগ বাঁধা হল। অনির্দেশ্যের পথে ভেসে গেলেন বেহুলা।

প্রথম বাধা- দেবী মনসা পাটনী সেজে অপেক্ষা করছিলেন। তারা ঘাট বাটোয়ার। 'গঙ্গার প্রসাদে' খেয়ে থাকেন। কিছু ভয় দেখালেন পাটনী আর তার সঙ্গীরা। আত্মহত্যার ভয় দেখালেন বেহুলা। স্ত্রী হত্যার ভয়ে মনসা চলে গেলেন।

দ্বিতীয় বাধা- মেনকার মূর্তি ধরে কান্নাকাটি। বেহুলা মনসাকে ঠকালেন ছয় বধূর নাম বলতে পারলেন না মনসা। তার কুট প্রশ্নে মনসা পথ ছাড়তে বাধ্য হলেন।

তৃতীয় বাধা- মনসা বাঘরূপে এলেন। আত্মহননের ভয় দেখালেন বেহুলা।

চতুর্থ বাধা- দেবার জন্য গোয়ালিনীর রূপ ধারণ করলেন মনসা। বেহুলা তাকে চিনে নিলেন।

পঞ্চম বাধা- দেবী মনসা রাজকন্যার বেশ ধরে অন্যায় জীবন যাপন করার পরামর্শ দিলেন। তার মায়া বেহুলা বুঝে ফেললেন। এই পাঁচটি বাধা অতিক্রম করার পর এল সত্যিকার বাধা।

দশ পাণির ঘাট পার হবার পর মধুসূদন দানীর ঘাট এল। লখিন্দরের মামা, কোসল্যাকে ধর্ষণ করার কথা এতদিনে ভোলেন নি মধুসূদন। ঘাটের করগ্রাহী, এমনিতেই প্রতিপত্তিশালী তার উপর প্রতিশোধস্পৃহ। স্পষ্ট ঘোষণা করলেন-

'জানিয়া হরিল বালা সহোদর মামী।

সেই দুঃখে তুমাক হরির আমি ॥'

মনসার কাছে আকুল প্রার্থনা করলেন বেহুলা। মনসার কৃপায় মধুসূদন দানীর চক্ষু নষ্ট হয়ে গেল। তিনি বুঝলেন বেহুলা মহাসতী। তার ক্ষমা প্রার্থনা আর চক্ষু ফিরিয়ে দেওয়ার বরদান- পার্থিব শক্তি নয়। মধ্যযুগের সাধারণ আসর-গায়েনের দল আর তাদের পৃষ্ঠপোষক, সকলেই এরকম অপার্থিব শক্তিতে বিশ্বাস রাখতেন। সেই সমবেত আকাঙ্ক্ষার চাপ ও টান বেহুলাকে আদর্শায়িত করেছে।

দক্ষিণ সহরের পর আলিস্য নগর। সেখানে গোদার ঘাট। গোদা বিচিত্র লোক- দুই পায়ে 'ধানের পুড়া'র মতো গোদ। ভাঙের নেশা করে চোখ দুটি আকাশের তারার মতো জ্বল জ্বল করছে। হাঁটা চলা অন্ধ হাতীর মতো। বাড়ির অবস্থাও তথৈবচ। বৃদ্ধা মা, দুই বিচিত্র দর্শন পুত্র আর অন্ধ-খঞ্জ দুই স্ত্রী। অপরিসীম দারিদ্র্য, অত্যধিক লোভ আর ব্যবহারের ঘৃণা উপকরণ- গোদার উপর সবই আরোপিত।বেহুলাকে দেখে হল বিবাহের লোভ। বেহুলা দেখলেন কোনো উপায় নেই, গোদাকে বললেন তাকে বিয়ে করতে রাজি তিনি।তবে স্ত্রী পুত্রদের মেরে তাড়াতে হবে।

গোদা কামুক- হিংস্র। বেহুলার কথাই শুনল। এদিকে তার ভেলা ভেসে গেল ভাটি স্রোতে। গোদা জলে নেমে সাঁতরে প্রায় ধরেই ফেলল বেহুলাকে। অগত্যা মনসার কাছে আবার প্রার্থনা:

'সত্য করিঞাছ তুমি দেবের বিদিত।

সক্ষটে করিব রক্ষা যাহ পৃথিবীত॥'

বেহুলা গোদাকে মিথ্যা লোভ দেখিয়ে ঘর জ্বালতে বলেছিলেন। এই বেহুলা নিতান্ত দুঃখী এক তরণী। অত্যাচারী পুরুষের হাত থেকে বাঁচার জন্য আর কী উপায় আছে তার? তবে কবিরা এই অবস্থাকে চূড়ান্ত ভাবতে পারেন নি। জগজ্জীবন দৈবশক্তির অপার কার্যকলাপের ঘটনা নিয়ন্ত্রণের উপায় এনে ফেললেন। বেহুলার প্রার্থনা পুরণ করলেন মনসা।

'কন্যার সাক্ষাতে পদ্মা গেল সেই ক্ষণে।

কুম্ভিরিণী রূপ পদ্মা ধরে সেইখানে॥'

গোদা মৃত্যুভয়ে বেহুলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বাঁচল। বেহুলা তার দারিদ্র্য মোচনের ব্যবস্থা করলেন।

'কন্যা বোলে তাহে গোদা যাহ তুমি ঘর।

অমূল্য রত্নে তোর ভরিবে ভান্ডার ॥'

নিঃস্ব, রিক্ত, পরবাসী, জলযাত্রী, অকাল বিধবা ('বিষম রাঢ়ি') এক তরুণীর এই ক্ষমতা আসলে আসরের স্বপ্ন পুরণ ছাড়া কিছুই নয়। এই স্বপ্ন আসলে সময় প্রতিবেশের যাবতীয় বাধাকে অতিক্রম করার ইচ্ছা। বাংলার মানুষের সামগ্রিক ইচ্ছাশক্তির এই সমাবেশ ঘটেছে বেহুলার আশ্চর্য শক্তিতে। তাতে বেহুলা আর মানবিক থাকেন নি।

শঙ্খ সদাগর বেহুলার অগ্রজ। দুজন দুজনকে চিনলেন না। শঙ্খ কুদৃষ্টিতে দেখলেন বেহুলাকে। নির্লজ্জ ঘৃণা আকাঙ্ক্ষা তার। বহুদিন গৃহসুখে বঞ্চিত মধ্যযুগের পুরুষ প্রতিপত্তিশালী ধন ও জনবলের অধিকারী শঙ্খাই সদাগর বেহুলার মতো অসহায় সুন্দরীকে অঙ্ক-শায়িনী করতে চাইবেন- খুবই স্বাভাবিক। বেহুলা প্রথমে যুক্তির বিনয়বচনে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলেন। তার সকরুণ কথা :

'তুমাকে দেখিয়ে যেন জন্মদাতা বাপ।

ক্ষেমা দেহ রতি সুখে না করিহ পাপ।।

ব্যাঘ্রের শরণ লৈলে না করে আহার।

তুমার শরণ লৈনু কর প্রতিকার ॥'

শঙ্খ সদাগর সজ্ঞানেই পাপাচারে ব্রতী। হিতবাক্যে কোনো কাজই হল না। উপরন্তু বেশ কিছু পুরাণ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি পাপাচারের সমর্থন করলেন। শেষ পর্যন্ত দৈব-চমৎকার ছাড়া আর কোনো উপায় থাকল না।

'পদ্মা বোলে অগ্নি হে মোর বাক্য ধর।

তুমি যাঞা বেলনীর সত্যরক্ষা কর ॥'

হল তাই।বেহুলার ভুরা স্পর্শ কারার আগে আগুনে পুড়ে গেল শঙ্খের 'হস্তপদ'। শঙ্খাই বুঝলেন বেহুলা সতী।বেহুলা সংসার সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেছেন এতদিনে। বুঝেছেন-

'স্বামীর অভাবে দাদা রহে যেবা ভান।

বৃথা তার জন্ম দাদা নিষ্ফল তার জীবন ॥'

এই জ্ঞান- মধ্যযুগের পুরুষপ্রধান সমাজের লোকজ্ঞান। বেহুলা সেই জ্ঞানের বশেই সতী। তার সতীত্ব সংস্কারের আদি কথা এখানে নিহিত।

'দুখ খাট স্বামী দাদা তবু স্বামীর ঘর।

প্রাণের অধিক দাদা তহু ভাই পর॥'

মায়ের জন্য সুবর্ণ অঙ্গুরি 'নিশান' হিসেবে দাদার হাতে দিয়ে পাপস্খালনের সমাজ-আদর্শ জানিয়ে গেলেন বেহুলা। শঙ্খাই বুঝলেন- 'বহিনি' এখন বড়ই নিষ্ঠুর। বেহুলার ভেলা ভেসে গেল 'দূরান্তরে'।

সামাজিক আদর্শের মুখপাত্র বেহুলা বাত্তবকে অতিক্রম করে গেলেন। তাকে রক্ষা করলেন দেবী মনসা। স্বর্গের প্রতিশ্রুতি রক্ষা হল। মর্তোর মানবী কিন্তু মানবী থাকলেন না।

শেষ পর্যন্ত বেহুলার মনে তীব্র হতাশা দেখা দিল। ঘাটে উঠে অগ্নিদাহ করার প্রস্তুতি নিলেন তিনি। যথারীতি মনসা ব্রাহ্মণীরূপে দেখা দিলেন। দেখিয়ে দিলেন মৃত্যুত্তীর্ণ হবার পথ । 'এক দিন গেলে পাবে দেবের ভূবন'। ভাটি ঘাটে নেতা কাপড় ধুচ্ছেন, তার কাছে জেনে নিতে হবে পথ। সামনে 'তিন ধার সাগরের পানি'। কোন্ পথে যেতে হবে? মনসা বললেন 'পূর্ব ধারে' যেতে হবে। তাই হল। বেহুলা প্রায় অর্ধচেতন অবস্থায় নিষ্ক্রিয়ভাবে ভাসতে ভাসতে গিয়ে পৌঁছোলেন নেতা ধোপানীর ঘাটে- সেখানে 'নেতেলা কাপড় ধোয় সুবর্ণের পাটে'। সেই জন্ম মৃত্যুর অমৃত আবর্তনের অপরূপ জগৎ। পুত্রকে মেরে রেখে

কাপড় ধোয়া শেষ করে বাঁচিয়ে স্তন্য দান করতে করতে চললেন। বেহুলা বুঝলেন তার ঠিকানা নৃত্য প্রদর্শন ।

মধ্যযুগের কবি জগজ্জীবন মর্ত্য জগতের বাধা অতিক্রম করতে করতে স্বর্গ যাত্রী বেহুলার মধ্যে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে যাবার দুর্দম সাহস, আদর্শ আর দ্বন্দ্বহীন স্বামীপ্রেম দিয়ে মোড়া উপকরণগুলি সন্নিবেশিত করলেন। আগেই লিখেছি এতে মানবী-রূপ খসে পড়ে দেবতার মতো বিদ্যাধরী- সত্তা প্রবল হয়েছে। স্বর্গে গিয়ে নাচ দেখিয়ে বেহুলা বুঝলেন দেবতাদের স্বভাব মানুষেরই মতো। শিব চাইলেন তার আলিঙ্গন। এই সময় বেহলার সংকট অভাবিত পূর্ব। শিবকে পাপ পুণ্যের ভয় দেখাতে চাইলেন বেহুলা। শিবের উত্তর-

'শিব বোলে আমি কন্যা সংসারের সার।

কে করিবে আমার পাপ পুণ্যের বিচার ॥'

বুঝলেন তিনি কি মুশকিলে পড়েছেন। দেবতারা নারদকে পাঠিয়ে পার্বতীকে ডেকে আনতে সমস্যা মিটল। বেহুলা এবার দেবী দুর্গার সামনে আর এক প্রস্থ নেচে নিলেন। মনসার সঙ্গে টেটনী বানিয়ানী বেহুলা তর্ক বিতর্ক করে স্বামী আর ভাসুরদের জীবন ফিরিয়ে, ডুবে যাওয়া নৌবহর নিয়ে ফিরলেন।দেবী মনসা প্রতিশ্রুতি নিলেন- শ্বশুরকে বুঝিয়ে পূজার ব্যবস্থা করবেন।

শ্বশুরকে দিয়ে পূজার ব্যবস্থা করার আগে ডুমনীর বেশ ধারণ করলেন বেহুলা । এর তাৎপর্য লোকাচারের দিক থেকে। অস্পৃশ্য ডুমনীর উপস্থিতি তাদের পরিবারে দুঃখের জোয়ার আনল । তাকে দেখে সনকার মনে পুত্রবধূর কথা জেগে উঠল। ভাবলেন তিনি এ তার হারিয়ে যাওয়া পুত্রবধূ । প্রশ্ন করলেন

'বেলনীর ঠান দেখি বেলনীর বেশ।

কহ সর্বস্ব ছাড়িলে কুনদেশ ॥'

বেহুলার উদ্দেশ্য ছিল শ্বশুরবাড়ির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আসা? হতে পারে। সেক্ষেত্রে তাকে সংসার-অভিজ্ঞই মনে হয়। বণিক পরিবারের বধূ ভেসে গেলেন- ডোমনী হয়ে

ফিরে আসা ছাড়া তার অন্য কোনো বাস্তব পরিণতিই তারা ভাবতে পারেন না। সনকার আশঙ্কার মুল কারণ তো তাই। বেহুলার ডোমনী-বেশ ধারণের কারণ হয়তো এইরকম। চাইছেন তিনি শ্বশুর বাড়ির মনটি বুঝে নিতে। এই বেহুলা বিদ্যধরী নন, মানবী। বস্তুত বেহুলাকে অনুসরণ করলে স্বর্গ আর মর্ত্য দৈবীশক্তি আর মানবীসত্তার আমূল দ্বন্দ্বের পরিচয় পাই আমরা । আদর্শ আর কল্পনার এই দ্বিস্তর কাঠামোটি তাকে রহস্যময়ী করে তোলে। ডোমনী বেশের মধ্য দিয়ে মর্ত্যের স্তরটি একটি মাত্রাকে স্পর্শ করেছে।

মনসাকে পূজা দেবার পর ক্রমশ সব দ্বন্দ্বের অবসান হল। বেহুলার মনে হল আর কতদিন মত্যজীবন যাপন করতে হবে। জাতিস্মর তিনি, ফলে তার পক্ষেই এই প্রশ্ন শোনা গেল প্রথম।

‘বেলনীয়ে বোলে মাগ তুমি যাহ ভাল।

মর্ত্যপুরে আমরা থাকিব কতকাল।।’

স্বর্গের রথ এল। মনসা চাঁদকে বোঝালেন এরা দুজন তার পুত্র পুত্রবধূ নন। ফেরার সময় বেহুলা দেখতে চাইলেন তার পিত্রালয়।

‘বালা বোলে তুমি রহ এই ঠাই।

যাবত মেলানি করি বাপ মায়ের ঠাই ॥’

এই সামান্য একটি আকাঙ্ক্ষা থেকে মনে হয় মর্ত্যের জীবনভঙ্গি মাটিকে মায়া বলে ভাবেননি বেহুলা। মর্ত্য ভুবনও তাকে ভোলে নি। চেনা পৃথিবীর মানুষ এমন এক আদর্শে নিষ্ট, ব্রতে সফল, তপস্যায় সার্থক, কাম্যফলবতী নারীকে রচনা করেছে- বাংলার নদী নালা খানা খন্দ কাদা মাটির ঘেরা টোপে তৈরি করেছে এক অপরূপ নারী- ভাবলে ভালো লাগে। বাংলার মানুষ ও সাহিত্য সম্পর্কে শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়।

৫.২: জগজ্জীবনের মনসামঙ্গলে হাস্যরস

বাংলা মনসামঙ্গল কাব্যধারায় হাস্যরসের অবসর খুব বেশি থাকার কথা নয়। কাব্যটি আমূল দুঃখপূর্ণ তার বেদনার আবেগ সঞ্চার করতে চেয়েছে। জগজ্জীবনও রস বৈচিত্র্য

সৃজনের জন্যই তাঁর কাব্যে এনেছেন হাস্যরস। প্রাচীন আলঙ্কারিকরা হাস্যরসকে করুণ রসের পাশাপাশি স্থাপন করলেও এই দুই মূল রসের মিশ্রণ প্রায় অসম্ভব। মানুষের চিত্তবৃত্তির একপাশে বুদ্ধি অন্য পাশে আবেগ বুদ্ধি বিচ্ছেদধর্মী- অন্য মানুষ থেকে নিজেকে পৃথক ভাবার প্রবণতা এখানে। আবেগ সংযোগধর্মী- অপরের প্রতি তা নিত্য-সহানুভূতিশীল। করুণ রস আবেগাত্মক, হাস্যরস বুদ্ধিমার্গী- বিশ্লেষণশীল। ফলে এই দুই রসের বিমিশ্রণ স্বাভাবিক নয় জগজ্জীবন তা করেন নি। তাঁর কাব্যে হাস্যরস এসেছ একটু স্বতন্ত্র অবসর খুঁজে নেবার পর। যে চরিত্রকে তিনি হাস্যকর করেছেন তাঁরা অধিকাংশই শ্রেণী চরিত্র। লোভ, বিকৃতি, দুষ্ট প্রকৃতি তাদের চরিত্রকে ক্লাউন-ধর্মীকরেছে। আর একটি কথা, এসব চরিত্র সম্পর্কে এক ধরনের সিদ্ধরস পূর্বাপর বাংলা কাব্যমোদীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তবে হাস্যরস সৃষ্টিতে প্রচলিত উপকরণ সাজানোর ক্ষেত্রে তাঁর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। কোথাও কোথাও নতুন বিষয়ও উদ্ভাবন করেছেন তিনি।

হাস্যরস সৃষ্টিতে সবটাই পুরোপুরি ব্যক্তি জগজ্জীবনের কৃতিত্ব বলে গণ্য করা যায় না আর একটি কারণে। উপস্থাপিত হাস্যরস সৃজনে কখনও কখনও তিনি রুচির সীমা অতিক্রম করে গেছেন। গ্রাম্যতা তাঁর হাস্যরসের পরিমণ্ডলে যোজনা করায় কখনো কখনো সংযমের অভাব দেখা যায়। এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তি কবি অমরের প্রোতা ও গায়েনদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। হয়তো বিষয়গুলিকে ব্যাখ্যার জন্য কিছু উদাহরণ আনছি।

গৌরীর 'বিবাহের সাজ' নিয়ে যাচ্ছিলেন নারদ। সঙ্গে বাসুয়া আর বেশ কয়েকজন ভারী। নারদ লোভী ব্রাহ্মণ। তাঁর নাকে এল সুখাদ্যের গন্ধ। অবস্থা হল মৎস্যলোভী বিড়ালের মতো।

'রসাল নাড়ুর গন্ধ মরিচের ঝাল।

সড়া মৎস্যের গন্ধে যেন পাগল বিড়াল ॥'

তাঁর জিভ থেকে লালা গড়িয়ে পড়তে থাকল ('লালচে জিভার করে সর সর পানি')। শেষ পর্যন্ত লোভ সম্বরণ করতে পারলেন না তিনি। ভারীরা বৃক্ষতলে জিরিয়ে নেবার সময় ঘুমিয়ে ঐ খাবার খেয়ে নেবার চেষ্টা করলেন।

‘মুনি বোলে বাসুয়া বচন শুন ভাই।

যতেক মনের কথা কহি তোর ঠাই ॥

ই সব ভারের সাজ খাইতে যায় মন।’

বাসুয়া নারদের মন বুঝে আনলেন সব। নারদ কলা খেয়ে ‘চচা’ ফেললেন পাত্রে। এসময় ‘কত কত করিয়া ডাকে ব্রাহ্মণের গলা’। পাতিলের সব দই, লাড়ু খেয়ে ফেললেন তিনি।দই খাওয়ার সময় তাঁকে দেখে মনে হল ব্রাহ্মণ নয় খাচ্ছেন যেন রাক্ষস। লাড়ুর পাত্রে ইট পাটকেল, দইয়ের বদলে কাদা ভরে দিলেন। সাপুড়ার ভার থেকে খেলেন সমস্ত পান।

‘গুয়া পান যত নারদ মুনি বুঢ়া।

যতেক চেবা দিয়া মুনি ভরায় সাপুড়া ॥’

নারদের এই আচরণ আসর-মনোরঞ্জক। হাস্যরসে পূর্ণ এই অংশ।

বাজে বস্তুতে ভরা ‘বিবাহের সাজ' নিয়ে যাবার সময় ভারীদের মনে হল ভার যেন গেছে- ‘ভার কেনে পাতল সমস্ত ভারী বোলে’। নারদ উত্তর দিলেন তাদের শরীরে বল বেড়েছে তাই এরকম মনে হচ্ছে।

‘মুনি বোলে নিদ্রা করি গায়ে হইল বল।

কান্ধের উপর ভার হইল পাতল ॥’

যারা আসরে আছেন, তারা সবই জানেন- ফলে অসঙ্গতি সৃষ্টি হল। তীব্র হাস্যরস সৃষ্টি হল এইভাবে।

শিব এসেছেন বিবাহে। মেনকা সমস্ত সখীদের নিয়ে চললেন বরণ করতে তখন ঘটল বিপত্তি। এয়োতিদের ছড়ানো ধান দূর্বায় সাপগুলির অসুবিধা হল- শিবের জটার সাপগুলি তাই ফোঁস করে উঠল।

‘ধান্য দূর্বা দিতে যায় জামাতার মাথার উপরে।

ফফায়া উঠিল সর্প রাইহো পালায় ডরে ॥'

তারা তখন নিয়ে এলেন 'চন্দ্র ভাদোই ঈশ্বর মূল'। সে-সবের গন্ধে শিবের কোমর বন্ধনীর সাপটি পালালো। শিবের বাঘাম্বর খসে পড়ল- তিনি দিগম্বর হলেন। গোধূলি লগ্ন- চাঁদের আলো সহসা সেই অন্ধকারে জ্বলে উঠল। হবার কথা ছিল না- কিন্তু চাঁদ তো শিবের মাথায়! এরপর এয়োতিরা শিবের গোপন অঙ্গও দেখতে পেলেন। তাদের মধ্যে হাস্যের রোল শোনা গেল। 'হাসিয়া হাসিয়া রাইহো ঢুল্যা ঢুল্যা পড়ে।'

অন্য এয়োতিরা হাসলেও মেনকার পেল কান্না। তাঁর রাগ- এ কেমন বিচিত্র বেশ বরের! রাগ তাঁর হেমন্ত ঋষিকে ঘিরে। এরকম বুড়ো বরকে নির্বাচন করার বিরুদ্ধে জাগল প্রবল ক্ষোভ।

'মর মর ঋষি তোর চক্ষু পড়ুক ফুলা।

দেখিয়া আনিলে বর উন্মত্ত বাউলা ॥'

এরপর নারদের অনুরোধে শিব মোহনমূর্তি ধারণ করলেন। সবাই শিবের সেই রূপ দেখে খুশি হলেন। শিবের বিবাহ সংক্রান্ত উক্ত মজার বিষয়টি মধ্যযুগের বহু কাব্যেই পাওয়া যায়। জগজ্জীবন এই অংশে ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করেছেন। এই অংশের হাস্যরসও খুব উচ্চ রুচির পোষক নয়।

মনসাকে ঘিরে প্রবল অশান্তিতে গঙ্গা আর দুর্গা শিবের সংসার ত্যাগ করে চলে গেছেন। শিব নারদকে পাঠালেন তাঁদের ফিরিয়ে আনতে। নারদ প্রচুর পরিমাণ লাড়ু খেয়েছেন। সমুদ্রের ধারে আসতে তাঁর বাহ্য কর্মের প্রয়োজন হল। জগজ্জীবনের মনসামঙ্গলে এ-বিষয়টি নিয়ে বেশ খানিক উৎকট হাস্যরস উপহার দেওয়া হয়েছে।

কাহিনির এই অংশ কপিলা প্রসঙ্গের পাশাপাশি উপস্থাপিত। সমুদ্র মন্থন করার বাস্তব একটি ভিত্তি তৈরি হয়েছে এইভাবে। কপিলা-পুত্র মনোহরকে স্বর্গপুরে একা রেখে চরতে গেছেন- পথে এক মহা ব্যাঘ্র তার পথ আগলাল। দেবী কপিলা বললেন ফিরে এসে তার খাদ্য হবেন। মনোহর সমুদ্র শুষে নিলেন! কপিলা এসে বাঘকে বললেন তিনি এসেছেন। শেষে তাঁর এক বাঁটের দুধ পেল মনোহর, এক বাঁটের দুধ থাকল দেবতাদের জন্য, এক

বাঁটের দুধ পেল বাঘ- এক বাঁটের দুধে সমুদ্র ভরে গেল। নারদের কাহিনিটি এরকম নাটকীয়ভাবে উপহার দিয়েছেন জগজ্জীবন। বাহ্যকর্মের পর কোথাও এক বিন্দু জল পেলেন না নারদ :

'সমস্ত সে সাগর দেখিলেন মুনিবর

রহে তাতে সমস্তেক খির।'

এইসময় দেবর্ষিকে গ্রাম্য বৃদ্ধের পর্যায়ে নামিয়ে আনলেন জগজ্জীবন। আসর-পোষিত হাস্যরসের অবকাশ তৈরি হল এইভাবে। নারদের হুঙ্কারে ইন্দ্র আকাশ থেকে বৃষ্টি আনলেন। কোন ক্রমে শৌচ হলেন নারদ। তিনি নিজেই স্বীকার করলেন 'বাহ্যের রহিল খাঁখার'। এখানেও হাস্যরস মোটেই উচ্চ স্তরের হয় নি।

লঙ্কায় বাণিজ্যে গেছেন চন্দ্রপতি। লঙ্কেশ্বরকে ভেট পাঠিয়েছেন নানা ফল। নারকেল দেখে ভয় পেলেন লঙ্কারাজ। মনসা শিরোমণি দৈবজ্ঞের ছন্মবেশ ধারণ করে রাজাকে বললেন ও ফল যেন না খান। ও আসলে বিষফল। রাজা চন্দ্রপতিকে বললেন তিনিই ফলটি খেয়ে পরীক্ষা দিন।

'ফল খাও বিদ্যমান তবে যদি বাঁচে প্রাণ

তবে আমি মিত্র বলি জানি ॥'

চেনা ফল নারকেল চেনেন না লঙ্কাবাসী। এ নিয়ে কতক কৌতুক হাস্যের পরিস্থিতি তৈরি হল। চাঁদ প্রথমে দৈবজ্ঞকে খুঁজতে বললেন। তার সামনেই এই ফল খেয়ে দেখাবেন। দৈবজ্ঞকে পাওয়া গেলনা। চাঁদ দেখালেন নারকেল খেয়ে।

'দণ্ড দুই ছিল বেলা হইল অবসান।

তথাপি সাধুর তবে নাই গেল প্রাণ ॥'

নারকেল খেয়ে গুয়াপান মুখে দিয়ে সারা বেলা লঙ্কেশ্বরের সামনে চাঁদ বসে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস হল সবার- দৈবজ্ঞ ঠিক বলেন নি। তখন সবাই মিলে মনের সুখে নারকেল খেলেন। এমন অপূর্ব সরস সুস্বাদু ফলের কথা লঙ্কাবাসী জানেন না! কূপমণ্ডুক

বঙ্গবাসী এই বিচিত্র হাস্যকরতা রচনা করেছেন সপ্তদশ শতাব্দীতে। যাই হোক, কৌতুকহাস্য রসের দিক থেকে এক হিসেবে এই অংশের রচনারীতিটি নির্দোষ।

চাঁদ সদাগরের লাঞ্ছনার পরিস্থিতি মধ্যযগের বাংলা সাহিত্যে একটি সুপরিচিত অংশ। ভরাডুবির পর চাঁদ একা সাগর জলে ভাসছেন তখন তাকে নানা রকম লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। এই পরিস্থিতিতে আসরের দিকে তাকিয়ে নতুন নতুন অংশ যোজিত হয়েছে। সব কাহিনি-বীজ বা শিকলি লেখকের মৌলিক রচনা নাও হতে পারে। তবে মূল কাঠামো কবির নিজস্ব কল্পনাসঞ্জাত। অন্যান্য মনসামঙ্গলের সঙ্গে সামান্য পার্থক্য নজরে আসছে। অংশটিতে জগজ্জীবন খুব বিস্তারে যান নি। কৃষকের জমি নিড়াতে গিয়ে আগাছা রেখে ধান কেটে ফেলার ঘটনা, শ্মশানঘাটে শ্মশানযাত্রীদের উদ্দেশ্যে আরও মড়া নিয়ে আসতে বলা- এই ঘটনা গুলি জগজ্জীবন আনেন নি। সামগ্রিকভাবে মনসামঙ্গল যারা শোনেন তাদের চোখে ধনাঢ্য অহঙ্কারী চাঁদকে সম্ভবমতো লাঞ্ছনা, কর্ম সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ না থাকার বিষয়গুলি হাসির খোরাক হয়েছে। এই সুরটি জগজ্জীবনের লেখাতেও আছে।

কোনোক্রমে খাবার জোগাড় করেছেন চাঁদ। জ্বেলেছেন আগুন। রান্না করে শিবকে উৎসর্গ করতে যাচ্ছেন এমন সময় মনসা কাকরূপে তাঁর খাবারে বিষ্ঠা ত্যাগ করলেন।

‘রন্ধন করিল সাধু বিছাইল পাত।

কাগরূপে পদ্মাবতী বর্জিলেক ভাত ॥’

এই অংশে হাস্যরসের উদ্রেক করে ঠিকই তবে রুচি এখানে উচ্চ নয়- গ্রাম্য।

কুম্ভকারদের মোট বহন করতে গেলেন চাঁদ। ‘চারিপণ কোড়ি’ মজুরি অগ্রিম পেতে চাইলেন চাঁদ। কুম্ভকাররা রাজি হলে সেই বোঝা মাথায় নিলেন চঁদ। কোমরের কাপড়ে ‘চারিপণ কোড়ি’ বেঁধে নিলেন। অনভ্যস্ত চাঁদ বোঝা বহন করছেন মনসা সেখানে বাঘ সেজে গেলেন।

‘বাঘ দেখি সাধু হইল চমৎকার।

পড়িল হাড়ির ভার হৈল চূর্ণ চার ॥’

মনসা আবার শিরোমণি দৈবজ্ঞ সেজে দেখা দিলেন কোটালের কাছে। বললেন চাঁদের কথা- 'তুমার হাটে আসিয়াছে এক বেটা চোর'। কোটাল লোক পাঠিয়ে চাঁদকে ধরে এনে লাঞ্ছনা করলেন। মুখে চুন কালি দিয়ে মাথা মুড়িয়ে ঢোল বাজিয়ে নগরের বাহিরে পাঠানো হল তাঁকে। এ লাঞ্ছনার তুলনা নেই। চাঁদের মতো অভিজাত মানুষের এমন লাঞ্ছনা- মধ্যযুগের আসরের কাছে হাস্যরসের উপাদানই বলতে হয়।

কোনোক্রমে চম্পলায় গেলেন চাঁদ। কিন্তু তাঁর ভয় সনকা তাঁকে চিনতে পারবেন না। রাত হবার পর চাঁদ নিজের ঘরে গেলেন। বসে থাকলেন নাছ দুয়ারে কাছে। প্রদীপ নিভেয়ে দিলেন সনকা- তখন চাঁদ প্রবেশ করলেন নিজের শয়নকক্ষে । এদিকে মনসা সনকাকে স্বপ্ন দেখালেন- তার ঘরে চোর ঢুকেছে। সনকা ছয় বধূকে ডাকলেন। তারা এসে প্রদীপ জ্বালিয়ে অসম্ভব লাঞ্ছনা করলেন শ্বশুরকে।

'এচড় চাপড় মারে বাঢ়নার বাড়ি।

গোপ ধরি টানে কেহো উখরাএ দাড়ি ॥'

সনকা তাঁর মাথায় লাথি মারলেন। মধ্যযুগের আসুর এই হাস্যরসের কথা নিশ্চয় শুনে আনন্দ পেত। অনুভূতি উপলব্ধির দিক থেকে দেখলে চাঁদের লাঞ্ছনা শেষ পর্যন্ত সহানুভূতি আকর্ষণ করে। ফলে হাস্যরস শমীকৃত হয়।

লখিন্দরের কন্যা খোঁজার সময় লেজ্ঘাপাত্রের মারফৎ কিছু পাত্রীর সংবাদ পেয়েছেন চাঁদ। উত্তর নগরে শঙ্খ বেনের কন্যার পায়ে গোদ :

'তাহার কন্যার রূপ কহন না যায়।

কাকড়ি সমান গোদ কন্যার দুই পায়॥'

দক্ষিণ নগরে মধু বানিয়ার বাস। তার কন্যার কলঙ্ক শোনা গোছে সাতবার ('অবিবাহে কলঙ্ক উঠিল সাতবার')। পূর্ব নগরে কংস বানিয়ার ঘর। সেখানে আরও বিচিত্র কথা শোনা গেল : 'কন্যার মায়ের কলঙ্ক উঠিল তিনবার।' এসমস্ত কথায় তখনকার পুরুষপ্রধান

সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চয় স্পষ্ট হয়। সেই সঙ্গে আসর-পোষিত হাস্যরসের পরিচয়ও আছে এখানে।

লখিন্দরের বিবাহযাত্রার সময় চাঁদের বাহিনী দেখে সবাই পালাতে থাকল উজানী নগরে। শত বছরের এক বুড়িও পালাতে লেগেছেন। তাকে সবাই নিরস্ত করার চেষ্টা করল। কিন্তু তার কথা 'এমন বুড়া আছে যে বুড়ি পাইলে কাজ ।' অংশটি বেশ হাস্য রসের। যুবতী বিধবারা পালাল না। তাদের ইচ্ছা তাদের যদি কোন সৈনিক নিয়ে যায় কি আর ক্ষতি হবে? বরং তার জীবনের দুর্বিষহ বেদনার সমাপ্তি হলেও হতে পারে। কথা তার :

'যে পাইকে লৈয়া সব তার সঙ্গে যাব।

রান্ধিয়া বাঢ়িয়া ভাত সুখে বসি খাব॥'

তখনকার আসরে এই পরিস্থিতি নিশ্চিতভাবে হাসির খোরাক যোগাত বলে মনে হয়।

উজানীর নাগরিকরা লখাইকে দেখতে পাবার পর মেয়েদের মধ্যে নিজেদের জীবন ভাবনা পতি নিন্দা-র রূপে ধরা পড়ল। এই জীবনবেদনা তাদের প্রকাশ গেল নিছক কিছু অসঙ্গতির মাধ্যমে । কারো স্বামী খোঁড়া :

'লাঠি ধরি বৈসে খোঁড়া লাঠি ধরি উঠে।

কর্ম কার্যে ভাজন নাই বোলে প্রাণ ফাটে।।'

কারো স্বামী অত্যন্ত কালো। অথচ তাঁর প্রসাধনের চেষ্টায় কোন ছেদ নেই। এই বধূ তার দুঃখের কথা বলছে এই ভাবে-

'সেরে সেরে মাখে তৈল দলা দলা খৈল।

সতত ঘসিলে নাকি অঙ্গার ছাড়ে মৈল॥'

যার স্বামী কুজো সেই বুড়োকে দেখতে লাগে নৌকার মত 'যেন নায়ের গুড়া'। তার নড়াচড়া শুরু হয় খাবার সময়! একজনের স্বামী গোদযুক্ত। কারো স্বামী বামন। এসব নিয়ে অসঙ্গতির সীমা পরিসীমা নেই। হাস্যরসের সামান্য মোটা দাগের ব্যবস্থা এভাবে

কাব্যটিতে আছে। একই কম অসঙ্গতি দেখা যায় বৃদ্ধাদের আচরণে, কথায় বার্তায়। এই সব যৌন কাতরতার প্রসঙ্গ হাস্যরসের উদ্রেক করেছে।

তাড়কা রাক্ষসীর আচরণের মধ্যেও গোদার মতো অতিশয়নের চিত্র লক্ষ করি। লখাইয়ের ছয় দাদার মৃত্যুর পর তাদের দেহ নিয়ে আটি বেঁধে নিয়ে গেছেন তাড়কা রাক্ষসী। মনসা তার কাছে গিয়ে সেই দেহগুলি চেয়ে পাঠালে তার ব্যবহার বেশ মজাদার কৌতুকাবহ। চালের উপর থেকে ছয় দেহ পাড়লেন তাড়কা। আঁটি বেঁধে তাড়কা এলেন বিচিত্র ভাঙ্গিতে।

'মৃত্যুক বান্ধিয়া বলে ঠমকে ঠমকে চলে

যায় বুঢ়ি পদ্মা দরশন।'

এই বিবরণটি জগজ্জীবনের নিজস্ব উপস্থাপনা ।

স্বর্গে নৃত্য প্রদর্শন করে বেহুলা সিদ্ধির সীমান্তে এসে বিচিত্র মুশকিলে পড়লেন। তার রূপ ও চাল চলনে অত্যন্ত লুব্ধ হলেন শিব। তার প্রস্তাব বেহুলা তার স্ত্রীর ভূমিকা নিন। বেহুলা তাঁকে পাপের ভয় দেখালেন। কিন্তু কামুক শিব বললেন :

'যম করে কন্যা পাপ পুণ্যের বিচার।

যমের উপরে কন্যা মোর অধিকার॥'

শেষে বেহুলা 'ভাঙ্গড়া' শিবের হাত থেকে উদ্ধারের জন্য সব দেবতার কাছে সাহায্য পেতে চাইলেন। শেষ পর্যন্ত সব দেবতা যুক্তি করে নারদকে পাঠালেন পার্বতীর কাছে। দেবী দুর্গা এসে শিবকে যাচ্ছেতাই বলতে লাগলেন। শিব দুর্গার প্রচণ্ড মূর্তিতে উৎকট কামুকতা ত্যাগ করলেন। দুর্গা আসছেন বুঝে বেহুলাকে তিনি খাটের নিচে লুকোতে বলেছিলেন! বিষয়টি বেশ হাস্য রসাত্মক হয়েছে। করুণ রসের পাশে এই হাস্যরসের উপস্থাপনায় জগজ্জীবনের এইসব কৌশল সাহিত্যে ন্যায় সম্মত- সার্থক।

৫.৩: জগজ্জীবনের মনসামঙ্গলে লোকাচার

লোকাচার মনসামঙ্গলে প্রাধান্য পেয়েছে। কাব্যটিই লোকাচারের ভাষ্য রচনার চেষ্টা। লোকাচার তথা folk-ritual সম্পর্কে বহুবিধ তাত্ত্বিক আলোচনার সঙ্গে আমরা পরিচিত। লোকাচার লোকব্যবহারগুলি ব্রতধর্মী, ব্রতগুলি নাট্য, অভিনয় প্রধান ও আচরণধর্মী। সমাজ, পরিবার গড়ে ওঠা বিকশিত হবার সময়কার বহুবিধ উপাদান এখানে বিজড়িত। পবিত্রতা ও লঘুত্ব- Sacred ও Profane- লোকাচর, বিশেষত লৌকিক ব্রতাচারের দুটি প্রান্ত। একটি দিনানুদৈনিক থেকে ব্রতধারী ব্যক্তির স্বেচ্ছাপার্থক্য সৃজন- exclusion ; অন্যটি ব্রত উদযাপন পর্বে ব্যক্তির পুনরায় দিনানুদৈনিক সাধারণের আবর্তে প্রবেশ- inclusion। জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল অনুসরণ করলে এমন অনেক উপকরণ সন্নিবেশ করা যায়।

সন্তান না থাকার যন্ত্রণা বহু। সন্তানহীন ব্যক্তি দুঃখিত, ম্লান, বেদনায় আপ্লুত। সন্তানহীনতাকে সমাজ নিন্দার চোখে দেখত। হেমন্ত ঋষির "আটকুড় দায়" ঘুচল দেবী দুর্গাকে কন্যা রূপে পেয়ে। খুব সহজে তা হয় নি। কবি এখানে পুরাকথার দায় মেনেছেন। জগজ্জননী মহামায়া কোনো গর্ভ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যাবেন না। অথচ হেমন্ত ঋষির পালিতা পুত্রী তিনি__ সে কথাও সাধারণ্যে প্রচলিত হতে পারে না। মেনকা তাই গর্ভ দেখিয়ে ফিরলেন হাট থেকে। হেমন্ত ঋষি গেলেন দাইয়ের বাড়ি। দাই এসে শুনতে পেলেন মেয়ের কান্না— দেখলেন আতুড়ঘরে জ্বালানো হয়েছে 'খুড়া খুড়ি আগুন'।

জন্ম সংক্রান্ত আরও কিছু লোকাচার মনসামঙ্গলে আছে। মনসার জন্ম প্রাকৃতিক উপায়ে নয়। তিনি অযোনি-সম্ভবা। তা সত্তেও পাতালে তার জাত কর্মের বর্ণনা পাচ্ছি :

'পাইয়া সে বাসুকী হইলেন মহাসুখী

পুষিলেন নিজভগ্নী করি।

করিলেন নাড়িছেদ আর করি কর্ণবেধ

নাম থুইল জয় বিষহরি ॥'

নাড়িছেদ-এর কোনো প্রসঙ্গ মনসার জন্মে থাকা সম্ভব নয়। তবু, জগজ্জীবন এখানে লোকাচারের পোষকতা করেছেন।

লখিন্দরের জন্মসংক্রান্ত লোকাচারের বিস্তৃত বিবরণ পাচ্ছি কাব্যে। গর্ভের পাঁচ মাসে সনকার সাধ ভক্ষণ হল। 'পঞ্চ মাসে পঞ্চামৃত খায় বানিয়ানী'। আতুর ঘরে আগুন রাখা। ('সূত গৃহে জ্বালা অগ্নি'), 'নাড়ীছেদ' ; 'গাছ উপাড়ি রাখে' অর্থাৎ কলাগাছ পোঁতা হয়। 'আরসি-জড়ালি'- দর্পণসহ বিভিন্ন বস্তু জড়িয়ে রাখা হয় প্রসূতির কাছে। পুত্রের জন্মের পর নবম দিনে গ্রহপূজা :

'নব দিনে নবগ্রহ পূজা চক্রবাসী।

পুত্র মুখ দেখি চান্দ পরম উল্লাসী॥'

এখানে 'চত্রবাসী' শব্দটির তাৎপর্য ভেদ করা যাচ্ছে না। পাঠক লক্ষ করবেন এখানে ছয় দিনের ষষ্ঠী ব্রতের উল্লেখ নেই। পুত্রের ছয় মাস বয়স হলে লখাইয়ের অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান হল। ('ছয় মাসে মুখে বালার অন্ন পরশাই')। পাঁচ বছর বয়স হবার পর লখাইয়ের 'কর্ণবেধ" অনুষ্ঠান হল।

শিশুদের খেলা ধুলার ইঙ্গিত পাই কাব্যটিতে। লখিন্দর খেলেন 'গুলাল' দিয়ে। 'হাতেতে গুলাল করি খেলাইতে যায়'।

বেহুলা শিশুসঙ্গীদের নিয়ে খেলছেন, সে বিবরণ দিয়েছেন জগজ্জীবন। সে খেলা 'খুটি চাটি' নিয়ে। অনেকটা যেন চু-কিৎ কিৎ বা এক্কা দোক্কা জাতীয়। পুতুল খেলার প্রসঙ্গ আছে এই সুত্রে-

'ছাড়িলেক খেলা বালী ভাঙ্গিল পুতলী।'

দুটি খেলাই শিশু বয়সে মেয়েদের মধ্যে আজও প্রচলিত আছে।

বিবাহের বিস্তৃত বিবরণ, লোকাচারের অন্যতম প্রধান অংশ। এসব স্ত্রী-আচার সমাজে শাস্ত্রাচার চালু হবার বহু পূর্ববর্তী। জগজ্জীবনের মনসামঙ্গলে পাই একটি বিশেষ স্ত্রী

আচারের কথা। সিন্দুর ছড়িয়ে মেঝেতে স্থান চিহিত করে নববধূকে ধামাল নাচতে বলা হয়। বাংলায় অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি গান : 'সোহাগ চাঁদ বদনী ধনি নাচ তো দেখি' শ্রীহট্টের ধামাইল নাচের সঙ্গে যুক্ত। জগজ্জীবনের মনসামঙ্গলে দেখছি :

'বান্ধিলে আনিয়া ঋষি সিন্দুরের আল।

তাহাতে চড়িয়া দুর্গা খেলায় ধামাল।।'

এক সময় উত্তরবঙ্গে নৃত্যটি প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়।

বিবাহের সাজ তথা অধিবাস দ্রব্য পাঠানোর রীতিটি সর্ববঙ্গীয়। নারদের মারফৎ শিব পার্বতীর গৃহে বিবাহের সাজ পাঠিয়েছেন প্রচুর। লাড়ু, লবণ, চিনি, দধি, কদলীর ভার, শঙ্খ, সিন্দুর, সুবর্ণ অলঙ্কার। বিবাহের অন্যতম স্ত্রী-আচার- বর বধূকে 'লগ্ন গাটি' বাধা হয়। রীতিটি হর পার্বতীর বিবাহে দেখা গেছে।

'পঞ্চ শব্দী বাদ্য বাজে করি পরিপাটি।

হর গৌরী দুই জনার বান্ধে লগ্ন গাটি ॥'

বেহুলা-লখাইয়ের বিবাহে শুভদৃষ্টির বর্ণনাটি চমৎকার। স্বামী প্রদক্ষিণ করে আঁচলে কুন্দ পুষ্প নিয়ে এলেন বেহুলা। ছিটিয়ে দেওয়া হল। তারপর

'ফিরি ফিরি সপ্তবার করে কন্যা নমস্কার

সমুখে মুখানি নাই তুলে।

দেখিঞা নির্মল ইন্দু হৃদয়ে আনন্দ বিন্দু

হানিয়াছে মৃণালের কোলে॥'

বর্ণনাটি অলঙ্কার-মন্ডিত। লখাই যেন চাঁদ- বেহুলা পদ্ম। সলজ্জ দৃষ্টি বিনিময়ের পর শিশিরের মতো আনন্দ বিন্দু তার সারা মুখে- মৃণালের কোলে মৃদু শিহরণ।

হর পার্বতীর বিবাহে পার্বতী শিবকে সাতবার প্রদক্ষিণ করেছেন। সেখানে শুভদৃষ্টির প্রসঙ্গ নেই। সুবর্ণ কলসে 'গঙ্গা সাগরের পানি' ভরে উপরে রাখা হয়েছে আম্র পল্লব। বেহুলা-লখিন্দরের বিবাহে সামান্য ভিন্ন। সেখানে আছে-

'সুবর্ণ কলস আনি গঙ্গা সাগরের পানি

মহুআর ডাল লৈল হাতে।'

তার পর সেই মহুয়ার ডাল জলে ডুবিয়ে দুজনের মাথায় ছিটানোর বিবরণ পাচ্ছি। উপরে বলা হর-পার্বতীর বিবাহে জল ছিটাবার প্রসঙ্গ নেই। ফুল ছেটানোর বর্ণনাটি বেহুলা লখিন্দরের বিবাহের অন্যতম স্ত্রী আচার।

'ধরিয়া পুষ্পের মুঠি দুই জনে ছিটা

ছিটি মঙ্গল উৎসব করি মহারঙ্গে।'

চলনবাতি নিয়ে জামাতা বরণ করার বিবরণটি দুই বিবাহ বর্ণনাতেই সবিস্তারে হাজির হয়েছে। শিবকে বরণ করার সময় সামান্য বিপত্তি ঘটেছিল। শিবের জটায় ছিল সাপ। নির্মঞ্ছন দ্রব্যের ধান দূর্বার স্পর্শে সাপ ফুফিয়ে ওঠে। পরে শিব মোহন মূর্তি ধরায় বরণ বরায় কোনো অসুবিধা হয় নি। লখাইয়ের ক্ষেত্রে কাজল দেখে লখাই সাপের ভয় পেয়েছিলেন। মেনকা তাকে সাহস যোগালেন।

বাসর জাগার সময় বর-বউকে পাশা খেলতে হয়। লখাই বেহুলাকে বলেছেন 'বিভা রাত্রিতে পাশা খেলিতে উচিত।' কনেদের বাড়িতে যারা ইয়ার্কি-তামাসা করার অধিকারী-তারা নানাভাবে বরকে তামাসার পাত্র করার চেষ্টা করেন। এও স্ত্রী-আচার। লখাইয়ের সম্বন্ধী শঙ্খাই সাধুর স্ত্রী তার 'শালাজ'। ফলে যথাসম্ভব মজা করেছেন তিনি আর অন্য শালাজ-রা। কাঁচা সরষের তেল চোখে ছেটানো থেকে আরম্ভ করে গায়ে জল ছেটানো-অনেক কিছুর দ্বারা জামাইকে উত্যক্ত করা হল। এক সময় লখাইও তাদের দুকথা শুনিয়ে দিলেন।

বিবাহের অন্য দিকটি সামাজিক। কন্যা দেখে পছন্দ করার পর ব্রাহ্মণ ডেকে পাত্র পাত্রীর বিবাহ স্থির করা হত। কন্যার পিতা পুত্রের পিতার কাছে তুলসী দিয়ে বিধিবদ্ধ করতেন বিবাহ প্রস্তাব। চাঁদ আর সায়বেনের মধ্যে এরকম চুক্তির পরিচয় দিয়েছেন জগজ্জীবন।

'ব্রাহ্মণ সজ্জন সাহো মহারঙ্গে বসি।

চান্দোর হস্তেতে সাহো দিলেন তুলসী ॥'

দুয়ার ধরার রীতিটি সামাজিক কৃত্য- শাস্ত্রোক্ত আচার নয়। 'সাহোর পাইক আসি ধরিল দুয়ার'। এ নিয়ে দুপক্ষের সামান্য দ্বন্দ্ব সংঘাতও হত। বিবাহের এরকম বিবাদ বিসম্বাদ হতই। হরি সাধু মণ্ডল আপ্যায়ন-সম্মান না পেয়ে চাঁদের বিবাহযাত্রীদের নাকাল করেছিলেন।

সামাজিকতা, সম্মান প্রদর্শন, আপ্যায়ন প্রভৃতিতে গুয়াপান প্রদানের রীতিটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। যে-কোনো ক্ষেত্রেই কাউকে কোনো অনুরোধের জন্য পান তাম্বুল দিয়ে তাকে বিশেষ ভাবে আপ্যায়ন করা হত। বিশ্বকর্মাকে ডেকে শিব একবার বললেন :

'ধর ধর বিশ্বকর্মা খাঅ গুয়া পান।'

বিশ্বকর্মা তাঁর জন্য তৈরি করলেন তাঁর বাহন বৃষ।

চাঁদ সদাগরও তাঁর পুত্রের বিবাহবাসর জাগরণের জন্য গড়াতে চান মেড়ঘর। ডাক পড়ল বিশ্বকর্মার। সেখানে বিশ্বকর্মাকে পুরস্কার দেবার কথা আছে, 'বিশ্বকর্মা বিদায় করে দিয়া আভরণ।' বিশ্বকর্মার সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা করেন নি চাঁদ। কারণ হয়তো উভয়ের বর্গ বা স্তর অন্য রকম।

গঙ্গার পুত্র ডাকুর-মহানন্দ। গঙ্গার সতীন-সম্ভাবনা দেখা দিল- শিব বিয়ে করতে পারেন দুর্গাকে। নারদের কাছে এই দুঃসংবাদ শুনে গঙ্গা পুত্রদের ডাকলেন। বললেন :

'ধর ধর দুই ভাই বাটার তাম্বুল খাঅ।

কনকাই নদীকে নাঅ নয়া যাঅ ॥'

এরকম পান তাম্বুল দানের ঘটনা বার বার এসেছে।

শিব কন্যা মনসাকে বলেছেন : 'বাটার তাম্বুল খাঅ পার্বতী জিয়াইঞা দেঅ।' ফলে মনসা সাপ-রূপে তাঁর সৎমাকে দংশন করেও বাঁচিয়ে দিয়েছেন। চাঁদ সদাগর নৌবহর প্রস্তুত করার জন্য ডাক পাঠালেন। কামিলা- সুতার কুন্দাইদের দলপতিকে বললেন : 'চান্দো বোলে কামিলা তাম্বুল ধর খাঅ।' নৌ যাত্রায় বের হবার আগে দৈবজ্ঞকে বললেন : 'চান্দো বোলে দৈবজ্ঞ তাম্বুল ধর খাও।' চাঁদের নৌবহর ডোবাতে হনুমানের প্রয়োজন হল। মনসা তাঁকে ডাক দিলেন। 'পদ্মা বলে হনুমান তাম্বুল ধর খাও ।' বিবাহযাত্রার সময় পাইকদের ডেকে আপ্যায়ন করলেন- লখাইকে রক্ষা করতে হবে তাদের। 'সাধু বোলে পাইকগণ ধর গুয়া পান।

বালাকে রাখিহ মোর হৈয়া সাবধান ॥'

অনুমতি না নিয়ে অন্যের বাটার পান খেলে তাকে অপমান করা হত। সনকা লখাইয়ের মৃত্যুর পর যখন বললেন :

'কাহার বাটার মুই তুলিয়া খানু গুয়া।

পড়িয়াছে পিঞ্জরা উড়িয়া গেল সুয়া ॥'

গুয়াপানের সামাজিক আদান প্রদানের রূপটি বাংলায় সুপরিচিত ছিল। শ্রীহট্ট এবং আসামে রীতিটি আজও জীবন্ত।

সতীত্ব পরীক্ষার বিবরণ মনসামঙ্গলে আছে। বেশির ভাগ কবি লিখেছেন বেহুলার পরীক্ষার কথা। জগজ্জীবন বেহুলাকে সতীত্বের ক্ষেত্রে পরীক্ষার অতীত ভেবেছেন- সেভাবেই প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন তার। সামান্য প্রায়শ্চিত্ত করার কথা ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন লখাই।

জগজ্জীবনের কাব্য দুর্গার কুমারী অবস্থায় শিবের সঙ্গে বিন্ধ্য পর্বতের মালঞ্চ বনে মিলিত হবার ব্যাপারে দুর্নাম হবার প্রসঙ্গ আছে। হেমন্ত ঋষি সমাজ-মনকে প্রবোধ দিতে, ব্যক্তিগত অবিশ্বাস দূর করাতে কুমারী পার্বতীর সতীত্ব-পরীক্ষার জন্য 'সাজ' এনেছেন।

শিব পার্বতীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন- তিনি দেবীকে রক্ষা করবেন। এবার শুরু হল অষ্ট পরীক্ষা।

(১) 'পানি ডুবি' পরীক্ষা। জলে ডুবে থাকার শক্তি দেখানো। 'ঋষির উকিল' আর পার্বতীর 'ডাকিল'। 'দুর্গার ডাকিল' বহুক্ষণ থেকে প্রমাণ দিলেন পার্বতীর সতীত্ব। মনে হয় এখানে সামান্য অসঙ্গতি আছে। 'দুর্গার ডাকিল' ডুব দিলে দুর্গার কৃতিত্ব প্রমাণ হয় না।

(২) সর্পঘট পরীক্ষা। বেদে সাপ ধরে আনল। 'দুর্গার অগ্রেতে ঘট দিলেন ভরিয়া'। দুর্গা হাত ঢোকালেন। সাপ কিছুই করল না ('হেট মুণ্ডে রহে')।

(৩) 'সাবল পরীক্ষা'। আনা হল কামারকে। 'ফালে তায়' দেওয়া হল। দুর্গা 'পাকড়ি' (শুকনো পাতা) হাতে ধরলেন সেই তপ্ত সাবল। 'ছাই হইয়া গেল পাকড়ির পাত। পাত পুড়িল দুর্গার না পুড়িল হাত ॥'

(৪) 'খুর পরীক্ষা' নাপিত খুরে শান দিল। সাতটি শানিত খুর- 'তাহাতে চটিআ দুর্গা ফেরে সাতবার।'

(৫) 'সিন্দুর পরীক্ষা'। সিন্দুরের আলের উপর 'ধামাল' নাচলেন দেবী। একে শ্রীহট্রের বিবাহ সংস্কার তথা স্ত্রী-আচার বলে ব্যাখ্যা করেছি। নব্বধূ যে সতী তার পরীক্ষা হিসেবেই সম্ভবত 'ধামাইল' নাচের আসর বসত। পা না তুলে বধূকে নাচতে হত- পায়ের চাপে পদ্ম ফুলের মতো ছক হত সিঁদুরের।

(৬) তুলা পরীক্ষা। তুলা দণ্ড এনে একদিকে তুলো রেখে অন্য পাশে দেবীকে রাখা হল। 'তুলাত অধিক দুর্গা হইল পাতল।' নারায়ণদেব বেহুলার অষ্ট পরীক্ষার শেষে এই পরীক্ষা এনেছেন। বেহুলা হাল্কা হয়ে স্বর্গে চলে গেছেন সেখানে ।

(৭) অগ্নিপরীক্ষা। জতুগৃহ রচনা করলেন হেমন্ত ঋষি। 'যতনে বান্ধিল ঋষির জোতের ঘর খানি।' তার মধ্যে দেবী অক্ষত থাকলেন।

(৮) ঘৃত কাঞ্চন পরীক্ষা। তপ্ত ঘৃতে 'সুবর্ণ অঙ্গুরি' রাখা হল। পার্বতী অঙ্গুরি তুলে আনলেন, তাঁর কিছুই হল না।

এই অষ্ট পরীক্ষার সঙ্গে তুলনীয় ময়নামতীর সতীত্ব পরীক্ষা। সেখানেও ময়নামতী পুত্র পুত্রবধূকে চমৎকৃত করেছেন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে। উত্তরবঙ্গের রচনা 'ময়নামতী গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস'। এ পরীক্ষা গুলির সঙ্গে যোগ-সাধনার সামান্য মিল থাকা সম্ভব।

৫.৪ : জগজ্জীবনের কাব্যে প্রবাদ-প্রবচন

বাগরীতির আলোচনায় বিষয়টি সামান্য বিশ্লেষণ করেছি। প্রবাদ প্রবচন বা অনুরূপ প্রকাশভঙ্গি উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে জগজ্জীবন ভাষা রীতির একটি অভিনব বুনট তৈরি করেছেন। প্রবাদ প্রবচন বা এ ধরনের প্রকাশভঙ্গি ভাষার লোকায়ত সীমাটি নির্দিষ্ট করে। মুখের ভাষার সৌন্দর্য ও ব্যঞ্জনা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই উপাদানগুলির জুড়ি নেই। বস্তুত ভাষার সার্থকতা, প্রকাশ-রীতির সাফল্য প্রবাদ-প্রবচন বাদ দিলে অসম্ভব। জগজ্জীবন দেশ ও লোকায়ত পরিবেশের ঘেরাটোপটিকে অস্বীকার করেন নি। ফলে তাঁর কাব্যভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তিতে সম্পৃক্ত হয়েছে। পরবর্তী অবসরে এ নিয়ে আলোচনা বিস্তারিত করা যাক।

কিছু কিছু প্রবাদে ভাগ্য-নির্ভরতা, নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত বাস্তবের স্পর্শ পেয়েছে। ভাগ্যকে চরম ভেবেছেন মধ্যযুগের সাধারণ মানুষ । কয়েকটি উদাহরণ দিলাম।

(১) কপালের লিখন খণ্ডাইবে কুনজন অবশ্য ফলিবে সেই ফল

(২) খণ্ডন না যায় ঊষা কপালের লেখা

(৩) আপনার সাধ্য নহে কপালের লেখা

লখাই অবশ্য একবার কপালের লেখাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তার কথাটিও প্রবাদধর্মী।

(৪) কপালের লেখা যত অযতনে হয়

আমরা দেখিয়েছি লখাই এই বিধি-বিরোধী চারিত্র্য রক্ষা করতে পারেন নি। চাঁদ সদাগর ছাড়া কাব্যের সমস্ত চরিত্রই প্রশ্নহীনভাবে ভাগ্যকে মেনে নিয়েছেন।

জগজ্জীবন কিছু প্রবাদ প্রবচন এনেছেন, যেগুলি সমাজমনের অনুগত। এগুলির মধ্য দিয়ে লোকজ্ঞানও প্রকাশ পেয়েছে। দেখাই :

(৫) ঘরে ঘরে দ্বন্দ্ব বাদ নহিবে কুশল

(৬) বিভায়ে বিবাদ দ্বন্দ্ব সর্ব দেশে হয়

(৭) রক্ষক ভক্ষক হৈলে নাহি প্রতিকার

(৮) দুখ খাট স্বামী দাদা তবু স্বামীর ঘর।

প্রাণের অধিক দাদা তবু ভাই পর ॥

(৯) জন্মিলে মরণ মাত্র আছে একবার।

আগে পাছে মরিবে এড়ান আছে কার ॥

(১০) আগে পাছে মরণ সভারে আছে প্রিয়া

(১১) দেবতা মনুষ্যে হইব নিরন্তর বাদ।

কুশলে থাকিতে কেন মনে কর সাধ ॥

রক্ষণশীল সমাজমন, ভাগ্যকে মেনে নেওয়া জীবননীতি এখানে সুস্পষ্ট। বিবাহ অনুষ্ঠানে গোলযোগ হয় এ-ও স্বতঃসিদ্ধ। স্বামীর আশ্রয়ে জীবনযাপন নারীজীবনের শেষ লক্ষ্য। বিবাহিত নারীর পক্ষে পিত্রালয় চিরস্থায়ী নীড় হতে পারে না। রক্ষক ভক্ষক হলে তার পরিণিতি অত্যন্ত ভয়াবহ। এসবকে লোকজ্ঞান বলেই ধরতে হবে।

কিছু কিছু প্রবাদ-ধর্মী বাক্য বা বাক্যাংশ দেখে মনে হয় জগজ্জীবনের রচনার প্রভাব প্রান্তিকভাবে হলেও বাংলা সাহিত্যে পড়েছিল। সমাজ ও সাহিত্যের লোকজ্ঞানের বিনিময়ের মতোই মৌখিক ভাষা আর সাহিত্যের যোগসূত্র তৈরি করেন মহৎ প্রতিভাধর

কবিরা । এখানে তেমনি সম্ভাবনা তৈরি হয়ে থাকবে। আদিদেব ধর্ম যখন তাঁর পুত্রদের ডেকে বললেন-

উপার্জিয়া খাইলে ফল দোষ কিবা আছে

তখন পুত্ররা উত্তর দেনঃ

উপার্জিয়া খাইলে ফল দোষ কিছু নাই।

এই সহজ ভাষ্যটি প্রবাদের কাছাকাছি। জগজ্জীবনের কাব্যভাষায় এরকম অনেক আছে। এ রকম কয়েকটি উদাহরণঃ

(১২) পদ্মা বোলে মাও মাসী ভিন্ন নাই জানি ।

(১৩) কাটা ঘাএ কত ঘস জামিরের রস

(১৪) প্রাণে তোর নাই সাধ প্রাণের অধিক কিবা আর

(১৫) বৃদ্ধা বোলে প্রাণ হৈতে জানি নাহি বড়

সম্পূর্ণ না হলেও এই বাক্য বা বাক্যাংশের প্রয়োগ প্রবাদধর্মী। ১৪ আর ১৫ নং উদাহরণ দুটিসামান্য পৃথক ভাবদর্শ বহন করে। প্রাণের অধিক কিছু নয়- জাতি সংস্কারও প্রাণের চেয়ে পৃথক নয়, প্রকৃত বিচারে একই রকম। আবার প্রাণেই যার সাধ নেই তার পক্ষে জাতি সংস্কার ত্যাগ করে প্রাণ রক্ষার উপদেশ অপ্রাসঙ্গিক।

কিছু বাগরীতিতে একটি বাক্যাংশ প্রবাদ বা বাগধারার আনুগত্য করছে। যেমন-

(১৬) আসিয়াছে পুত্র নাকি আন্ধলের আখি

(১৭) লক্ষপতিক দিল জান হৈল সাধু সাবধান

(১৮) কে মোর কাড়িএ লৈল আঁচলের নিধি

(১৯) পড়িল সাগরে মোর আঁচলের সোনা।

কে দিবে তুলিয়া বন্ধু আছে কুনজনা।।

(২০) কোছার মাণিক মোর কে করিলে চুরি

উদাহরণগুলিতে 'আন্ধলের আখি', 'সাধু সাবধান', 'আঁচলের নিধি', 'আঁচলের সোনা', 'কোছার মাণিক' বাংলা ভাষার বাগধারা । এসব প্রয়োগের মাধ্যমে জগজ্জীবন বেশ সার্থক।

৫.৫ : জগজ্জীবনের কাব্যে শব্দ প্রয়োগের অভিনবত্ব

জগজ্জীবন গ্রামীণ সংস্কৃতিকে সহযোগিতা করেছেন। তাঁর রচনায় গ্রাম দেশে প্রচলিত কাব্যকথার উপস্থাপনা ঘটেছে। সামান্য কিছু ক্ষেত্রে নাগরিক শিষ্টাচার ও রুচি অস্বীকৃত হয়েছে তাঁর কাব্যে গ্রামীণ মানুষের জীবন-পরিধি তাঁর রচনায় সুস্পষ্ট। আভিপ্রায়িক শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে জগজ্জীবনের প্রয়াসটি প্রাথমিকভাবে অমার্জিত অশ্লীল শব্দ আড়াল করার চেষ্টা বলে মনে হয়। একে বলতে পারি আসরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার সচেতন প্রয়াস। ভক্তি মিশ্রিত কাব্যকথা কিছুতেই যেন নিয়ন্ত্রণহীন অশ্লীল ইঙ্গিতময় না হয় ওই চেষ্টা সে কারণেই। অন্য কোনো মনসামঙ্গলে এই রীতি দেখিনি। এ থেকে মনে হয় জগজ্জীবনের রুচিটি গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রবাহে ভেসে যেতে চায় নি। তিনি সংযমের পরিচয় দিয়েছেন এক্ষেত্রে। অন্য কারণও থাকতে পারে- তবে সংযত থাকার চেষ্টাটিই প্রধান।

লিঙ্গ অর্থে পরোক্ষ-বচনের সাহায্য নিয়েছেন জগজ্জীবন। এই শব্দগুলির তাৎপর্য গায়েনরা যেন স্পষ্ট না করেন-এরকম একটি ইচ্ছা নিশ্চয় ছিল তাঁর। সামান্য কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি :

(১) শরীর: 'শরীর ধরিলা বাম হাতে'

(২) আকার: 'চন্দ্রের উজ্জ্বলে শিবের দেখিল আকার'

'শরীর ঢাকিল করতলে'

এ-সব ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ভাষণ আসরে উপস্থিত মানুষের রুচি বিকারের সম্ভাবনা তৈরি করতে পারত। আসরই অধিকারী গায়েনদের প্রভাবিত করে মঙ্গল-গানের গাম্ভীর্য নষ্ট করতে পারত। দেবতাদের প্রসঙ্গে অনুরূপ অবারিত অশ্লীলতা রঙ্গব্যঙ্গ তামাসা তৈরি

করলে জগজ্জীবনের উদ্দেশ্য আপূর্ণ থাকত। এজন্যই তিনি উক্ত প্রসঙ্গগুলির ইঙ্গিত ইশারা পরোক্ষ ভাষ্যে উপহার দিয়েছেন। কবির রুচি এখানে প্রশংসার যোগ্য।

মলত্যাগ অর্থে বর্জন শব্দের প্রয়োগও গ্রাম্য রুচি অতিক্রম করার চেষ্টা। চাঁদের লাঞ্ছনার সময় মনসা কাকরূপ ধারণ করে বার বার বর্জন করেছেন। পরিস্থিতির লঘুত্ব এড়াবার জন্যই উক্ত পরোক্ষ-বচন। দেখাই:

(৩) 'কাগ রূপে মুখেতে বর্জিল পদ্মাবতী।'

'কাগ রূপে পদ্মাবতী বর্জিলেক তাত।'

কিছু কিছু শব্দ নির্মাণের মধ্য দিয়ে জগজ্জীবন চেয়েছেন ব্যঞ্জনাগর্ভ তাৎপর্য সৃজন করতে। সে-সব শব্দের প্রয়োগ অভিনব। এসবের প্রয়োগ বিশেষার্থক। লক্ষ্য হয়তো আসর নিয়ন্ত্রণ। অন্য লক্ষ্য সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা। জগজ্জীবন মিতভাষী কবি অন্যত্রও তার প্রমাণ রেখেছেন। এরকম কিছু প্রয়োগ দেখাচ্ছি।

(৪) অকাজ: কাজ কর্ম পণ্ড করার অর্থে।

'জল মধ্যে ভাসিয়া অকাজ।'

(৫) অভন্ড: ভণ্ডামিঅর্থে।

'কাহার পুরুষে করে এতেক অভন্ড'।

প্রসঙ্গত মনে পড়ে দুটি ক্ষেত্রেই শব্দ দুটি দেবতার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম

(৪) ক্ষেত্রে মৃতদেহ হিসেবে ধর্ম ঠাকুরের আদি জলের হিল্লোলে ভেসে আসা, আর দ্বিতীয় (৫) ক্ষেত্রে দেবী দুর্গা শিব সম্পর্কে বলছেন। দেবতা সম্পর্কে নেতিবাচক উক্তি সম্ভব মতো আড়াল করার জন্য এই ধরনের আভিপ্রায়িক শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে।

আত্মসমালোচনার জন্য ইতিবাচক শব্দ নেতিবাচক ভঙ্গিকে ব্যঞ্জিত করার জন্য প্রয়োগ পাই কোথাও কোথাও। কেন এমন প্রয়োগ? সেই ব্যাখ্যায় যাবার আগে উদাহরণটি লিখছি। বেহুলার উক্তি- লখিন্দরের সর্প দংশনজনিত মৃত্যুর পর।

(৬) 'সংসার ভরিঞা মোর রহিল খিয়াতি।

স্বামীকে খাইল বালী বিবাহের রাতি॥'

খ্যাতি শব্দটি অখ্যাতি অর্থে প্রয়োগ করলেন বেহুলা । একে সুভাষণ-রীতির (euphemism) সঙ্গে তুলনা করা যায়। বাংলা ভাষায় এরকম প্রয়োগ পাই শাঁখা বাড়ন্ত, চাল বাড়ন্ত জাতীয়বিশিষ্ট তাৎপর্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। এয়োতির নারীর শাঁখা ভেঙে যাওয়া, গৃহস্থ বাড়িতে চালের অভাব অমঙ্গলজনক। তাই বিপরীত শব্দের প্রয়োগ। গুরুজনরা নতুন প্রজন্মের কাউকে এজন্যই বলে থাকেন- যাই বলতে নেই এসো। জগজ্জীবন বেহুলার অখ্যাতি প্রচার করতে চান না।

বিধিতে নিষেধ- ইতিবাচক শব্দ প্রয়োগের দ্বারা নেতিবাচক ইঙ্গিত পেলাম একটি শব্দ প্রয়োগে। চাঁদ সদাগরকে বললেন ধন্বন্তরী।

(৭) 'দেবতার বাদে জিনে নরের শকতি।'

অস্যার্থ : দেবতার সঙ্গে দ্বন্দ্বে জেতা মানুষের আয়াসসাধ্য নয়। সম্ভবত চাঁদকে ক্ষুণ্ন করতে চান নি ধন্বন্তরী।

উপরের প্রয়োগগুলির মধ্যে জগজ্জীবনের জীবনবোধের কিঞ্চিৎ পরিচয় মিলতে পারে। দেবতাদের নিন্দা, তাঁদের সম্পর্কে অশ্লীল ইঙ্গিত তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। আভিপ্রায়িক শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে সেই প্রবণতারই প্রমাণ মিলছে।

৫.৬: জগজ্জীবনের কাব্যে অলংকার প্রয়োগ

জগজ্জীবনের মনসামঙ্গলে অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্য মূলত দুই স্তরের একদিকে তিনি সাধারণ লোকজীবন থেকে উপমার উপাদান ব্যবহার করেছেন। গ্রাম জীবনের সহজ সাধারণ উপকরণ প্রয়োগে এই সব ক্ষেত্রে তিনি অন্তদৃষ্টির পরিচয় রেখেছেন। অন্যদিকে তাঁর উপমা-রূপকে চিরাচরিত ভঙ্গি ও উপকরণের সমাহার লক্ষ করি। এক্ষেত্রে সিদ্ধি অপেক্ষা কাব্য ধারার সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের প্রমাণ মিলছে। পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে অলঙ্কার প্রয়োগে জগজ্জীবন ঘোষালের বৈশিষ্ট্য দেখানো হচ্ছে।

নিচের অলঙ্কার প্রয়োগ গ্রামীণ পটভূমি-আশ্রয়ী উপাদানে সমৃদ্ধ। যথা :

১. কুম্ভ হেন কান্দিয়া করিল চক্ষু মুখ

২. রসাল লাড়ুর গন্ধ মরিচের ঝাল।

সড়া মৎস্যের গন্ধে যেন পাগল বিড়াল॥

৩. আলস্যে বাতাসে যত ভারী যায় নিন্দ।

আন্ধার ঘরেতে যেন চোরে দিল সিন্দ ॥

৪. ঋষিয়ানী বোলে জামাতা নহে বাদিয়ার পো

৫. পান হেন পাতল পদ্মার লাগ পায়

৬. গঙ্গার বচনে দুর্গা দেবী কোপে জ্বলে।

পছিয়া বাতাসে যেন আনল উথলে॥

৭. গঙ্গাজল থাকিতে কেনে অন্যজল খাই।

বট বৃক্ষ ছাড়ি কেনে সহড়াতলে যাই॥

৮. জলের উপরে চান্দো টেপা মাছ ভাসে

৯. পানি খাইঞা হইল তার হাঁড়ি হেন পেট

১০. ঘর হৈতে বাহির করে যেন ভাদুরিয়া বেঙ্গ

১১. তৈল খৈলে নিত্য ঘসে পাতিল যেন মুখ

১২. উবুর হৈয়া সুহে কুজা যেন নায়ের গুড়া

১৩. দুই পায়ে দুই গোদ যেন ধানের পুড়া

১৪. গোদের উপরে আচুল গোটা গোটা বেল

১৫. গুবাক তুল্য কাছে থুঞা মনে মনে খাও

১৬. খসিয়া পড়িল যেন আকাশের বাজ

১৭. কাঁচা বেল ডালিম্ব খাইতে লাগে কস।

কলিকা কমলে কি ভ্রমরা পায় রস ॥

কাঁচা দুগ্ধ খায় যেন পানির সমান।

আউটিয়া খাইলে যেন মধু করে পান ॥

পাকা ঘায়ে কাঁটা দিলে গলিয়া গুখায়।

কাঁচা ঘায়ে কাঁটা দিলে বাড়িয়া সে যায় ॥

১৮. নারীর যৌবন কন্যা ভাদরের তাল।

জীবন যৌবন কন্যা না রহে সর্বকাল ॥

১৯. নারী আর নারিকেল আর গুয়া তাল।

কাঁচায় উত্তম নহে পাকিলে হয় ভাল ॥

২০. সাক্ষাতে সুন্দরী তুমি মহাকালের ফল।

ভিতরে কুৎসিত কাল বাহিরে উজ্জ্বল ॥

২১. দেখিঞা তুমার রূপ প্রাণ নহে স্থির।

কাষ্ঠের শরীর হৈলে হয় চারিচির ।।

২২. লাগিল দুর্দিন বালা পাড়ে কাল নিন্দ।

আন্ধার ঘরেতে যেন চোরা দিল সিন্ধ।।

২৩. মহাদূত ভয়ঙ্কর যেন তাল তরুবর

২৪. বিষ খায় ধন্বন্তরী যেন পিয়ে পানি

২৫. মৃত্যুর সঙ্গতি কেনে জিয়ন্তেই যায়

২৬. আকাশের তারা যেন গোদার দুই চক্ষ

২৭. অতি মন্দ মন্দ গোদা ফিরে নিরন্তরে।

আন্ধল হস্তিনী যেন চলে ধীরে ধীরে ॥

২৮. ছিপ খান দেখি গোদার যেন বৃক্ষ নাড়া

২৯. ডুলি হেন খোলই লঞা ফিরে

৩০. বাহিরে না পড়ে তার পানি

৩১. মদন সাগরে মোর ধরহ কাণ্ডার

৩২. কেহো কিছু বলিলে অরণ্যে বাঘা গাজে

৩৩. যাহার সড়ার বাসে শৃগাল না ছাড়ে পাশে আজি গরজে অজগর সাপ

৩৪. চক্ষুদান নাহি বালার দেখিত না পায়।

পদ্মাকে বলিয়া পড়ে বেলনীর পায় ॥

৩৫. উজানিতে চলে ডিঙ্গা যেন ভাটি মুখে

৩৬. পর্বত সমান দেখ উজানীর ঘাট

৩৭. শূন্যতে ধরে পাক যেন কুম্ভরের চাক

৩৮. বাদা বাদি করিয়া বাহিয়া দিল নায়।

চৈত্র মাসেতে যেন হুড়ুক বহ বায় ॥

৩৯. দেখিল শাশুড়ী মাও আর রাড়ি ছয় জাও অস্থি চর্ম মাত্র হৈয়া সার

৪০. সরোবরে জোক আছে যেন হস্তী শুন্ড

উক্ত অলঙ্কারগুলি চেনা জগতের উপাদানে তৈরি, এসবের উৎস সংস্কৃত বা পূর্বতন কোনো সাহিত্য নয়। গঙ্গার বেদনাপূর্ণ মুখ চোখ কুম্ভ সদৃশ (১) মেনকার চোখে সাপ

দিয়ে বাঘের ছাল বাঁধা যে জামাতা তাকে মনে হতেই পারে 'বাদিয়ার পো', (৪) হাল্কা ক্ষীণ মনসার রূপ 'পান হেন', (৫) শিবের তুলনায় মনসা শ্যাওড়া গাছ চাঁদ সদাগরের এই ভাব, (৭) জল খেয়ে চাঁদ সদাগরের পেট হল হাঁড়ির মতো, এই উপমা, (৯) কুৎসিত চেহারায় বৃথা প্রসাধন আসলে হাঁড়ির কালো অংশকে তেল-খোল দিয়ে ঘসার মতো, (১১) কুঁজো স্বামীকে দেখে নৌকার 'গুড়া'র মতো ঠেকা, (১২) গোদকে ধানের 'গুড়া'র মতো ঠেকা, (১৩) গোদের উপরকার আঁচিলকে বেলের সঙ্গে তুলনা, (১৪) লখাইকে কোচড়ের গুয়া ভাবা, (১৫) নারীর যৌবনকে ভাদ্র মাসের তাল ভাবা- ক্ষণকালে তার উপস্থিতি, ক্ষণ স্থায়িত্ব বোঝাবার জন্য এই তুলনা, (১৮) যমদূতকে তালগাছ বলা, (২৩) গোদার ছিপ গাছের মতো, (২৮) গোদার মাছ রাখার 'খোলই' বিরাট ডুলির মতো, (২৯) শিবের গর্জন বাঘের মতো, (৩২) লখিন্দরের মৃতদেহের দুর্গন্ধে শেয়াল ঘুরে ফিরত- আজ অজগরের মতো ডেকে উঠছেন, (৩৩) উজানীর ঘাট পর্বতাকার, (৩৫) আনন্দে বৈঠা ঘোরানো কুম্ভরের চাকের মতো, (৩৬) অস্থিচর্ম সার সনকা আর ছয় জা-এর কথা, (৩৯) এই আঠেরোটি উপমা তুলনায় গ্রাম্য পরিবেশের পরিচয় পাই আমরা । জগজ্জীবন ঘোষালের নাগরিক পরিবেশের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় না থাকুক এসব উপমা যথেষ্ট ভাব-প্রকাশক সন্দেহ নেই।

কখনও কখনও অবশ্য উপমাগুলিকে রীতির আনুগত্য করতে হয়েছে। নিদ্রার সঙ্গে অন্ধকার পেয়ে চোরের ঢোকা- এই উপমাটি বেহুলার মেড়ঘরের ভয়াবহ পরিণতির পক্ষে নিশ্চয় সঙ্গত বোধ হয়। (২২ নং) কিন্তু নারদ নিয়ে যাচ্ছেন শিবের পাঠানো অধিবাস-উপহার ভারীর বৃক্ষতলে ছায়ায় বাতাসে ঘুমিয়ে পড়ায় একই উপমা প্রয়োগ করার বিষয়টি (৩ নং) খুব সঙ্গত বলে মনে হচ্ছে না।

কিছু উপমার মধ্যে অভিনবত্ব আছে। সাধারণ তুচ্ছ জীবনপরিধি থেকে তুলে আনা উপকরণকে এমন চমৎকারভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে কবির কৃতিত্ব অবশ্যই স্মরণযোগ্য। লোভী নারদ নাড়ুর লোভে যে আচরণ করেছেন তা পচা মাছের লোভে গন্ধ পেয়ে ছট ফট করা বেড়ালের মতো-তুলনাটি চমৎকার। (২) গঙ্গার কথায় দেবী দুর্গার ক্ষোভ পশ্চিমা বাতাসে বেড়ে ওঠা আগুনের মতো (৬) এই উপমায় 'পছিয়া বাতাস' শব্দটি উত্তরবঙ্গের

বিশেষত মাহদহে ‘পছিয়া’ শব্দটি পশ্চিমা বাতাসের আঞ্চলিক ব্যবহার হিসেবে প্রসিদ্ধ। উচ্চ কল্পনাশক্তির সাহায্যে জগজ্জীবন আঞ্চলিক উপভাষার শব্দ প্রয়োগ সার্থকতা লাভ করেছেন। চাঁদকে তার সতী পুত্রবধূরা প্রচুর লাঞ্ছনার পর ঘর থেকে বাইরে ছুঁড়ে দিয়েছেন ভাদ্র মাসের ব্যাঙের মতো, উপমাটি (১০) প্রায় এই রকম। ‘ভাদুরিয়া বেঙ’ নিছক সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা। বেহলাকে লখিন্দর বিরক্ত হয়ে মাকাল ফলের সঙ্গে তুলনা করেছেন (২০), বাইরে বর্ণাঢ্য ভিতরে কালো। উপমাটি অভ্রান্ত। মাকাল যারা দেখে নি তারা এর রসগ্রহণ করতে পারবেন না। একই ধরনের উপমা চাঁদকে টেপা মাছের মতো জলে ভাসতে থাকার কথা (৮)য়। টেপা মাছের ব্যবহার না জানলে এর রস অনুভব করা যাবে না।

কখনও কল্পনাশক্তি আর রচনাশক্তির তুঙ্গ সিদ্ধি ঘটে ব্যঞ্জনার সাহায্যে। কবি যা বললেন শ্রোতা বা পাঠককে তা বুঝে নিতে হবে সৃজনশীল কল্পনার দ্বারা। বেহুলার ভাসানযাত্রা দেখেলের মানুষ যখন ভাবে মৃতদেহের সঙ্গে বেঁচে থাকা মানুষ চলেছে কেন? তখন সেই প্রশ্নে বিরোধাভাসের ইঙ্গিত (২৫)। গোদার গৃহ কুটিরে বৃষ্টিজল পড়ে ভিতরেই যেন বেশি। জগজ্জীবন যখন লেখেন বাইরে জল যেন পড়েই না তার (৩১)-এ তো অতিশয়োক্তি। সাধারণ ভাষার মোড়কে এই প্রকাশ শৈলী অভিনবত্বে যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করছে। জন্মদেশের কাছাকাছি এসে নৌকার দাঁড়ি-মাঝির দল উত্তেজিত হয়ে দ্রুত নৌকা চালাচ্ছে। ভাটিতে নৌকা যেমন যায় তাদের উজান যাত্রাও হল তেমনি (৩৫)। পরস্পর জেদ যাচ্ছে তারা, মনে হচ্ছে যেন চৈত্র মাসের ঘুর্ণাবর্ত বাতাস এসে পড়ল। (৩৮) অতি সামান্য ইঙ্গিতে গভীর ভাবপ্রকাশক এই জল যাত্রীদের বর্ণনা।

লখাই বেঁচে উঠলেন, তবে তাঁর চক্ষুতে দৃষ্টি নেই। মনসা ভ্রমে বেহুলার পায়ের দিকেই এগিয়ে গেলেন তিনি। নাটকীয়ভাবে পরিবেশিত ভাসানগানের বস্তু এখানে সুস্পষ্ট (৩৪)। বর্ণনাটির দুই পংক্তির শেষ শব্দ ‘পায়’। প্রথম অর্থ অক্ষমতা, না পায় বলতে অক্ষমতা, দ্বিতীয় পংক্তির শেষ শব্দ পায় অর্থাৎ পায়ে। যমক অলঙ্কারটি ফুটে উঠল সাধারণ ভাষাভঙ্গিকে অবলম্বন করে।

কয়েকটি উপমা বা অলঙ্কার সংস্কৃতসাহিত্যের আনুগত্য করেছে। তেমন অলঙ্কৃত বিবরণ থেকে কিছু উদ্ধার করছি :

৪১. রাহু যেন চন্দ্রকে গরাসে

৪২. মিলিল আসিয়া মোকে সোনার কমল

৪৩. কাম জিনি বালার মুরতি

৪৪. দেখে অচেতন তনু পাষাণের প্রায়

৪৫. স্বামীর চরণ ধরি কান্দে বানিয়ানী।

মন্দাকিনী ধারা যেন চক্ষে পড়ে পানি ॥

৪৬. প্রদীপ নিভাইল যেন অন্ধকার ঘর।

চন্দ্রমা অভাবে যেন রাত্রি ভয়ঙ্কর ॥

৪৭. সুবর্ণ সমান কান্তি জ্বলে চন্দ্র মুখী

৪৮. আকাশের ঘনঘটা যেন বিজুলির ছটা বালী মন্দ মন্দ মুখে হাসে

৪৯. নিশি লিপ্ত দিনকর উঠিল আকাশে

৫০. কোকিল জিনিয়া ধ্বনি

৫১. গজের গমন শীঘ্রগতি

৫২. চাহে কটাক্ষ নয়ানে যেন মদনের বাণে

৫৩. সভাত আসিয়া দেবী অগ্নিহেন জ্বলে

৫৪. জিনি কুচ কুম্ভ করী মধ্য খিনি করি অরি

৫৫. যেন কমলের কলি দেখিয়া ধাইল অলি কামশরে বালা জর জর

৫৬. বেলনী সুন্দরী চলে চলিতে বিজুলি পড়ে মূর্ছিত হইল ত্রিভুবন

৫৭. উদিত অরুণ জিনি অধর বিম্ব ছটা।

তিমির বিজলি জিনি সিন্দুরের ফোটা।।

৫৮. পুত্র মোর অনুপাম যেন মদনের কাম

৫৯. তুমা বিনা পুরী খান চন্দ্র হীন যেন রাত্রিখান কার মুখ না দেখিনু ভাল

কখনও কখনও জগজ্জীবনের কোনো কোনো অলঙ্কৃত বাগবন্ধের ফারসি শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করি। যেমন নিম্নলিখিত রচনাংশ :

'ছাড়িলে কামান দেব পুরিয়া সন্ধান।

সুজান ধানুকি যেন হানিলে নিশান॥'

এখানে 'কামান' অর্থ অগ্নি-উৎক্ষেপক যন্ত্র নয়। 'কামান' শব্দের আদি অর্থ ধনুক অর্থের প্রয়োগ ঘটেছে এখানে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে ভারতচন্দ্রের কাব্যভাষায় কামান শব্দের অর্থে প্রয়োগ লক্ষ করি। একে বাংলা কাব্য ভাষার নিজস্ব ধারাবাহিকতা হিসাবে গণ্য করতে হবে।

৫.৭: অনুশীলনী

১। জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল কাব্যের দেবচরিত্র গুলি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল কাব্যের মানব চরিত্র গুলি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩। মনসা চরিত্র চিত্রণে জগজ্জীবনের কৃতিত্বের পরিচয় দিন।

৪। জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ সদাগর চরিত্রের পরিচয় দিন।

৫। সনকার মাতৃ হৃদয়ের ব্যাকুলতা কতটা চিত্রিত হয়েছে তার পরিচয় দিন।

৬। জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল কাব্যে বেহুলা চরিত্রটি বিচার করুন।

৭। জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল কাব্যের হাস্যরসের পরিচয় দিন।

৮। জগজ্জীবনের কাব্যে লোকাচার প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

৯। টীকা লিখুন- জগজ্জীবনের কাব্যে প্রবাদ-প্রবচন।

১০। জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল কাব্যে শব্দ প্রয়োগ ও অলংকার প্রয়োগের অভিনবত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৫.৮: গ্রন্থপঞ্জি

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস- শ্রী সুকুমার সেন, প্রথম খন্ড।

২. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস- শ্রী সুকুমার সেন, দ্বিতীয় খন্ড।

৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (প্রথম খন্ড) প্রথম পর্ব- ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৪.বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত- ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস- ক্ষেত্রগুপ্ত।

৬. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১ম পর্যায়) শ্রী ভুদেব চৌধুরী।

৭. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস- ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য।

৮. বাংলা সাহিত্য পরিচয়- ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

৯. জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল – অচিন্ত্য বিশ্বাস।

একক ৬ । শিবমঙ্গল বা শিবায়ন কাব্যের পরিচয়

বিন্যাসক্রম

৬.১ : দেবতা শিবের উৎস

৬.২ : প্রাচীন সাহিত্যে শিব প্রসঙ্গ এবং শিবায়ন কাব্যের উদ্ভব

৬.৩ : শিবায়ন কাব্যের বৈশিষ্ট্য

৬.৪ : শিবায়ন কাব্যের কাহিনী

৬.৫ : শিবায়ন ও মঙ্গল কাব্যের পার্থক্য

৬.৬ : শিবায়নের কবিগন

৬.৭ : শিবায়নের শ্রেষ্ঠ কবি রামেশ্বরের পরিচয়

৬.৮ : রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কবি প্রতিভা

৬.৯ : অনুশীলনী

৬.১০ : গ্রন্থপঞ্জি

৬.১: দেবতা শিবের উৎস

শিব সম্বন্ধীয় আলোচনার সূচনাতেই আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য ''ভারতীয় যেসকল প্রাগবৈদিক দেবতা পরবর্তী হিন্দু সমাজে ও নিজের প্রতিষ্ঠাতা স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাদের মধ্যে শিবই সর্বপ্রধান।'' প্রাগবৈদিক শিব দেবতার মূল রূপ নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। বাংলার লোকো জীবনে বৃষভধ্বজ শিব প্রথমেশ অপেক্ষা

গঞ্জিকাসেবী,পরস্ত্রীতে আসক্ত কৃষ্ণ-শিবেরই প্রাধান্য বেশি। এই শিব গবেষকদের মতে অস্ট্রিক সংস্কৃতি সঞ্জাত কৃষি দেবতার প্রতীক। আর্য ও আর্যেতর সংস্কৃতি সমন্বয় এর যুগে পৌরাণিক মহেশ্বর ও কুচনীরূধুপমুগ্ধ বৃদ্ধ শিব একাত্ম হয়ে যান । এখনো লোকায়ত জীবনে, নানা ব্রত কথায় ,শিবের গাজনের এই অনার্য শিবের প্রভাবই বাংলাদেশে বেশি। কাব্যের শিবায়ন এ নরখন্ড ও দেব খন্ড নেই। শিবায়ন কাব্যে কৈলাস বাসি শিবের ঘর-গৃহস্থালির কথা বিবৃত। কোনো তাঁর পূজার প্রচার করেছেন, এরকম কাহিনী শিবায়ন নেই।'মৃগলুব্ধ' ধরনের ব্রতকথা জাতীয় আখ্যানে শিবের কথা আছে।চণ্ডী ও মনসামঙ্গলের দেবখন্ড লৌকিক শিবের ঘর-গৃহস্থালির বর্ণনা আছে যা বাঙালি চরিত্র সংসারের প্রতিরূপ ।মঙ্গলকাব্য হিসেবে শিবায়ন কে ধরা যায়না এর কাহিনী ও অন্য। মঙ্গলকাব্যের মতো এতে বিষয় বৈচিত্র নেই।

মঙ্গলকাব্য শিবায়ন প্রভৃতি অর্বাচীন সাহিত্যে শিব চরিত্রের পৌরাণিক রুপটি পাওয়া যায়। পরিপূর্ণ দেবশক্তি সম্পন্ন রূপে নয় , মর্ত্যলোকের মানব রূপে এই শিবের আবির্ভাব। পৌরাণিক ও লৌকিক দেবতার কাহিনী ও বৈশিষ্ট্য মিশে আছে এই শিবের মধ্যে। পৌরাণিক কাহিনী মূলত শিবপুরাণ, শাক্তপুরাণ থেকে নেওয়া হয়েছে। আর লৌকিক শিব উঠে এসেছেন লোকসমাজ থেকে। বিভিন্ন পুরাণে শিবের বিভিন্ন রূপ। বামন পুরাণ এ তিনি মেঘ বাহন। ঋকবেদে পঞ্চ জন বা পঞ্চ জাতী ছিল।এই পাঁচটি জাতির উপাসিত বলেও শিবকে পঞ্চানন বলেও শিবকে মনে করা হয়। তন্ত্র শাস্ত্রে তিনি অর্ধনারীশ্বর, সদাশিব, মৃত্যুঞ্জয়, নীলকণ্ঠ, বর্ণনার সাদৃশ্যে বৈদিক দেবতা রুদ্রকে শিবরূপে গ্রহণ করা যায়। রুদ্র ধ্বংসের দেবতাউগ্র হিংস্র পশু তুল্য । সেই বজ্রবাহু রুদ্রদেবতাকে রোগমুক্তি সন্তান লাভের আশায় প্রীত করার জন্য বৈদিক ঋষিগন স্তব গাণ গাইতে শুরু করলেন। ধিরে ধিরে ভয়ঙ্কর দেবতা রুদ্র হলেন শিব বা কল্যাণময়। হলেন মঙ্গলের দেবতা। যজুর্বেদ এর সময় থেকে আর্য শিব অন্ত্যজ শ্রেণীর পূজা লাভ করেছেন। তারপর থেকেই নানা জাতি নানা শ্রেণীর শিবকে বহুরূপে আরাধনা করে চলেছে ।সর্বত্যাগী মহাযোগী শিব নানা ধর্মগ্রন্থের সাহিত্যে বিচিত্রভাবে চিত্রিত হয়েছেণ. মহাভারতে ,সমুদ্রমন্থনের বিষপান করে শিব নীলকণ্ঠ। তারপর থেকে তিনি গাঁজা,

ভাঙ,ধুতুরায়, আবিষ্ট। কখনো শ্মশানচারী, কখনো কিরাত। যুদ্ধ করেন অর্জুনের সাথে। কখনো সংসারের দারিদ্র মোচনে তার হাতে ভিক্ষাপাত্র।

বিভিন্ন পুরানে শিবকে কামুক এবং কিছু শিথিল রূপে অঙ্কন করা হয়েছে। মঙ্গলকাব্যে,শিবায়নে শিবের সঙ্গে কোচ রমণী ও বাগদীনির যে চিত্র আছে, তাতে তারই প্রভাব লক্ষ করা যায়। এভাবেই শিবের সঙ্গে নিম্ন জাতির মানুষের একটা সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়েছে। লোক কাহিনীতে শিব ক্রমশ বাংলার নিতান্ত আপনজন হয়ে উঠেছেন। গাজনে ,চড়কে জড়িয়ে আছেন শিব ।মঙ্গলকাব্যের হরগৌরী সংসার জীবনে কবিগন বাংলার গৃহস্থের সংসারকেই তুলে ধরেছেন।

৬.২ : প্রাচীন সাহিত্যে শিব প্রসঙ্গ এবং শিবায়ন কাব্যের উদ্ভব

'কানু বিনা গীত নাই'-এ প্রবাদটি আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত। এ প্রবাদের স্রষ্টা কে বা কারা এবং কখন সৃষ্টি করেছিলেন তাও সঠিক সন-তারিখ নির্ণয় করে বলা সম্ভব নয়। তবে একথা জোর দিয়েই বলা যেতে পারে যে, বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির সূচনালগ্নেই বাঙালি গ্রাম্য কবিরা প্রাণের দেবতা রাধাকৃষ্ণকে নিয়ে অজস্র ছড়া ও গান মুখে মুখে রচনা করেছিলেন। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব ভিক্ষুকের দল ঘরে ঘরে গিয়ে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ছড়া ও গান পরিবেশন করে চাল-পয়সা আদায় করতেন। আর এই সময়ে গ্রামে গ্রামে গায়কের দল রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ছড়া বা গানগুলিকে পালার আকারে সাজিয়ে তা আসরে আসরে জমিয়ে পরিবেশন করতেন। সর্বপ্রথম পঞ্চদশ শতকে ছাতনার কবি বড়ু চন্ডীদাস লোককবিদের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ছড়া ও গান এবং গায়েনের দলের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পালা (ছড়া ও গান-এর) সংগ্রহ করে ছন্দোবদ্ধ কাব্যে রূপ দেন। এই কাব্য-ই হল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। বাংলাসাহিত্যে প্রথম লৌকিক প্রেমের কাব্য। বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণ বিধয়ক পদাবলী সারা ভারতবর্ষের মানুষের কাছে সমাদৃত। আজও আমাদের দেশে রাধাকৃষ্ণকথা নিয়ে কত ছড়া, গান, কাব্য, কবিতা, গল্প

প্রভৃতি রচিত হচ্ছে। আজও ভাট-ভিখারি বা বৈষ্ণব ভিক্ষুকের দল রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক দুকলি কিম্বা চারকলি ছড়া বা গান গেয়ে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করে বেড়ান।

সুতরাং 'কানু বিনা গীত নাই'- এ প্রবাদ যেমন এ দেশের মানুষের মুখে মুখে বহুকাল ধরে ঘোরাফেরা করছে ঠিক তেমনি আরেকটি প্রবাদও বহুকাল ধরে এ দেশের মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত আছে- 'ধান ভানতে শিবের গীত' । এদেশে রাধাকৃষ্ণের মন্দির, শিবের থান গ্রামে গ্রামে চোখে পড়ে। নর-নারীরা শিবের উপাসক হন। কারো কারো বাড়িতে কুলদেবতা বা গৃহদেবতা রূপে শিব পূজা পায়। ঘরে ঘরে কিম্বা থানে থানে পুজোর সময় মানত রাখে, ছড়া বা গান গায়। ছড়া বা গান-ই পূজোর মন্ত্র। রাঢ় অঞ্চলে শিবের উপাসকের মুখে মুখে এখনও নিম্নোক্ত ছড়াগুলি শোনা যায়-

১. 'গাঁয়ে গাঁয়ে ভোলা বাবা ঘুরে।

ছাল্যা মায়া ভক্তিভরে পূজে।।

ধন পাবে জন পাবে সবে।

পূজ ভবে ভোলাবাবা যবে।।'

২. 'শিব পূজা কর মাগো সবে মিলে।

জড়া শাঁখা ঘড়া ধন নিবে-তুলে।।

যদি কর শিবে হেলা পাবে ঠেলা।

পূজ শিবে যাবে সবে দুখের খেলা।।'

রামেশ্বর শিবসঙ্কীর্তন যাদের পৃষ্ঠপোষকতায় (রামসিংহ ও তার পুত্র যশোমন্ত সিংহ) লিখেছেন তারা সকলেই মেদিনীপুরের অন্তর্গত কর্ণগড়ের রাজা। এখনও গাজন পরবে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর জেলায় উপরোক্ত ছড়াগুলি শিবের উপাসকদের মুখে মুখে শোনা যায়। রামেশ্বরের শিবসঙ্কীতর্ন-এ 'শিব-মহিমা কীর্তন' 'গৌরী-শাঁখারী সংবাদ', 'শাঁখাপরার উদযোগ' প্রভৃতি অংশগুলি রচনার সময় হয়তো এই ছড়াগুলি শুনে থাকতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথ এক সময় বাংলাদেশের ছড়া সংগ্রহের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। বহু বিচিত্র ধরণের ছড়া সংগ্রহ করেছিলেন। 'ছেলেভুলানো ছড়াঃ ২'-প্রবন্ধে সংগৃহীত ৩৭ নং ছড়াটি উল্লেখ করা যেতে পারে-

'শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দ্র।

গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়ে গোবিন্দ।।

ক্ষীর খিরসে ক্ষীরের নাড়ু মর্তমানের কলা।

নুটিয়ে নুটিয়ে খায় যত গোপের বালা।।

নন্দের মন্দিরে গোয়ালা এল ধেয়ে।

তাদের হাতে নড়ি, কাঁধে ভাড়-নাচে থেয়ে থেয়ে।।'

শিব নাচছেন। ব্রহ্মা আর ইন্দ্রও নাচে মত্ত। এই 'নৃত্যরত' শিবের কথা বাঙালিদের কারো অজানা নয়। কিন্তু ছড়ায় যে বিষয়টা উঠে এসেছে তা হল গোপ বা গোয়ালা জাতির জীবন-জীবিকার কথা 'হাতে নড়ি, কাঁধে ভাড়'। আর আছে বাঙালিদের প্রিয় খাদ্য ক্ষীর, ক্ষীরের নাড়ু ও মর্তমানের কলা খাওয়ার কথা।

লোককবিরা শিব ঠাকুর এবং তাঁর পরিবারকে অতি আপনজন ভেবেছেন। আর একালের কবি রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে 'গ্রাম্যসাহিত্য' প্রবন্ধে বলেছেন-

"যাহা হউক, মোটের উপর হরগৌরী এবং রাধা কৃষ্ণকে লইয়া আমাদের গ্রাম্য সাহিত্য রচিত। তাহার মধ্যে হরগৌরীর কথা আমাদের ঘরের কথা। সেই হরগৌরীর কথায় আমাদের বাংলাদেশের একটা বড়ো মর্মের কথা আছে। কন্যা আমাদের গৃহের এক মস্ত ভার; কন্যাদায়ের মতো দায় নাই। কন্যা- পিতৃত্বং খলু নাম কষ্টম্। সমাজের অনুশাসনে নির্দিষ্ট বয়স এবং সংকীর্ণ মণ্ডলীর মধ্যে কন্যার বিবাহ দিতে আমরা বাধ্য। সুতরাং সেই কৃত্রিম তাড়নাবশতই বরের দর অত্যন্ত বাড়িয়া যায়, তাহার রূপগুণ অর্থ-সামর্থ্যে আর তত প্রয়োজন থাকে না। কন্যাকে অযোগ্য পাত্রে সমর্পণ করা, ইহা আমাদের সমাজে নিত্য নৈমিত্তিক দুর্ঘটনা। ইহা লইয়া দুশ্চিন্তা, অনুতাপ, অশ্রুপাত, জামাতৃপরিবারের সহিত

বিরোধ, পিতৃকুল ও পতিকুলের মধ্যবর্তিনী বালিকার নিষ্ঠুর মর্মবেদনা, সর্বদাই ঘরে ঘরে উদ্ভুত হইয়া থাকে। একান্নপরিবারে আমরা দূর ও নিকট এমনকি নামমাত্র আত্মীয়কেও বাঁধিয়া রাখিতে চাই; কেবল কন্যাকেই ফেলিয়া দিতে হয়। যে সমাজে স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত পুত্র কন্যা প্রভৃতি সকলেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় তাহারা আমাদের এই দুঃসহ বেদনা কল্পনা করিতে পারিবে না। আমাদের মিলনধর্মী পরিবারে এই একমাত্র বিচ্ছেদ। সুতরাং ঘুরিয়া ফিরিয়া সর্বদাই সেই ক্ষতবেদনায় হাত পড়ে। হরগৌরীর কথা বাংলার একান্নপরিবারের সেই প্রধান বেদনার কথা। শরৎসপ্তমীর দিনে সমস্ত বঙ্গভূমির ভিখারি -বধূকন্যা মাতৃগৃহে আগমন করে, এবং বিজয়ার দিনে সেই ভিখারি ঘরের অন্নপূর্ণা যখন স্বামীগৃহে ফিরিয়া যায় তখন সমস্ত বাংলাদেশের চোখে জল ভাসিয়া আসে।

এই-সকল কারণে হরগৌরী সম্বন্ধীয় গ্রাম্য ছড়াগুলি বাস্তব ভাবের। তাহা রচয়িতা ও শ্রোতৃবর্গের সেই-সকল কাব্যে জামাতার নিন্দা, স্ত্রীপুরুষের কলহ ও গৃহস্থালীর বর্ণনা যাহা আছে তাহাতে রাজসভার বা দেব ভাব কিছুই নাই; তাহাতে বাংলাদেশের গ্রাম্য কুটিরের প্রাত্যহিক দৈন্য ও ক্ষুদ্রতা সমস্তই প্রতিবিম্বিত। তাহাতে কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানা পুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহাদের শিখররাজি আমাদের আমবাগানের মাথা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। যদি তাহার নিজ নিজ অভ্রভেদী মূর্তি ধারণ করিবার চেষ্টামাত্র করিতেন তাহা হইলে বাংলার গ্রামের মধ্যে তাহাদের স্থান হইত না।" (লোকসাহিত্য, বিশ্বভারতী, বৈশাখ ১৪১৯ ব. পৃষ্ঠা নং ৯৯-১০০)

বাঙালির হৃদয় সিংহাসনে হরগৌরীর দাম্পত্য জীবনের কথা চিরকালের সম্পদ হয়ে উঠেছে যার লেখনীতে তিনি হলেন চন্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী। মুকুন্দ চক্রবর্তী বাস্তববাদী কবি। বাস্তবের মুখোমুখি হয়েই কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী হর-গৌরীর দাম্পত্য জীবনের ছবি আঁকতে গিয়ে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেননি। শিব ভবঘুরে ভিখারি। আবার তিনি সব দিন ভিক্ষা করতে বেরোয় না। বাড়িতে বসে থাকেন। ঘরে বসে কত রকমের খাবার খাবেন তার একটা তালিকা বলে দেন স্ত্রী গৌরীকে। অলস স্বামীর এ হেন আচরণে গৌরী ক্ষুব্ধ। একদিকে অভাব-অনটন, অন্যদিকে বাউন্ডুলে ও অলস স্বামীকে নিয়ে গৌরী সংসার জীবনে বেশ বিপাকে পড়েছেন। দাম্পত্য জীবনে নিত্য-কলহ লেগেই আছে।

ষোড়শ শতকের একটি জীবনী কাব্যেও শিব ঠাকুরের কথা আছে। শিবের গীত সেকালেও যে একশ্রেণির ভিক্ষুকেরা ঘরে ঘরে গেয়ে বেড়াতেন- তা বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এর মধ্যখণ্ডে (৮ম অধ্যায়-এ) উল্লেখ আছে-

'একদিন আসি এক শিবের গায়ন।

ডমরু বাজায় গায় শিবের কথন।।

আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে।

গাইয়া শিবের গীত বেটি নৃত্য করে।।

শঙ্করের গুণ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।

হইলা শঙ্কর মূর্তি দিব্য জটাধর।।

এক লাফে উঠে তার কান্ধের উপর।

হুঙ্কার করিয়া বোলে মুঞি সে শঙ্কর।।

কেহো দেখে জটা, শিঙ্গা, ডমরু বাজায়।

বোল বোল মহাপ্রভু বোলয়ে সবায়।।

সে মহাপুরুষ যত শিব গীত গাইল।

পরিপূর্ণ ফল তার একত্র পাইল।

সেই সে গাইল শিব নির-অপরাধে।

গৌরচন্দ্র আরোহণ কৈল যার কান্ধে।।

বাহ্য পাই নাম্বিলেন প্রভু বিশ্বম্ভর।

আপনি দিলেন ভিক্ষা ঝুলির ভিতর।।'

সপ্তদশ শতকের নাথ সাহিত্যেও শিবের কথা আছে। 'গোরক্ষ বিজয়'-এ গাঁজা-ভাঙ নেশাখোর শিবের প্রসঙ্গ ছড়া জাতীয় গানে গানে চিত্রিত হয়েছে। আবার রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণে' শিবকে চাষী রূপে দেখা হয়েছে।

'আহ্মার বচনে গোসাঞি তুমি চাষ চষ।

কখন অন্ন হএ গোসাঞ্জ কখন উপবস।।

ঘরে অন্ন থাকিলে পরভু সুখে অন্ন খাবে।

অন্নের বিহনে পরভু কত দুঃখ পাবে ।।'

শিবায়ন কাব্য রচিত হয় সপ্তদশ শতকে। প্রথম শিব ঠাকুরের সাংসারিক জীবন কাহিনি আখ্যান কাব্যে রূপ পেল সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে রামকৃষ্ণ রায়ের শিবায়ন বা 'শিব-মঙ্গল'এ। এর আগে প্রাচীন সাহিত্যে শিবঠাকুরের কথা গাজনের গানে, শৈব ভিক্ষুকের ছড়ায়, মঙ্গলকাব্যের পালায় কিছু কিছু পেয়েছি। কোনো ভাবেই কাব্যের মূল কাহিনি জুড়ে শিব ঠাকুরের মাহাত্ম্যকথা নেই, কিম্বা শিবের জীবন চিত্র অঙ্কনে পূর্ণতা নেই। সপ্তদশ শতকেই প্রথম শিবঠাকুর কাব্যের মূল চরিত্র হয়ে উঠেছে এবং শিবঠাকুরকে নিয়ে স্বতন্ত্র কাব্যরচনার সুত্রপাত ঘটে। শিবায়ন বা 'শিব-মঙ্গল' কাব্য রচিত হয়। শিবায়ন কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবি হলেন রামকৃষ্ণ রায় (সপ্তদশ শতকে) এবং রামেশ্বর ভট্টাচার্য (অষ্টাদশ শতকে)। তবে শিবায়ন কাব্যের জনপ্রিয় এবং বাঙালির হৃদয় সিংহাসনে যিনি সুপ্রতিষ্ঠিত তিনিই হলেন অষ্টাদশ শতকের কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য । এই প্রসঙ্গে কবিশেখর কালিদাস রায় এর মন্তব্য উল্লেখ করতে পারি- 'রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে শিবের গানও আছে। মহাযানী বৌদ্ধগণ শিব পূজাও করিতেন। বৌদ্ধসাহিত্যে শিবের স্থান বুদ্ধ বা ধর্মের নিচে। শিব ধর্মেরই আজ্ঞাবহ। শিব ছিলেন চাষবাসের দেবতা। বৌদ্ধ সাহিত্যিকগণ শিব দিয়া চাষ করাইয়াছেন। বৌদ্ধসাহিত্যে শিব তাঁহার পত্নীর সহিত ঘরে অন্নাভাব লইয়া কেবল কলহ করেন এবং ভিক্ষা করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করেন। শিবের এই চিত্র পরবর্তী হিন্দু কবিগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৭শ শতাব্দীতে রামকৃষ্ণ দেব ও ১৮শ শতাব্দীতে

রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাহাদের শিবায়ন গ্রন্থে বৌদ্ধ কবিদের পরিকল্পিত ভিক্ষুক গৃহস্থ শিবের জীবন-চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন।"

৬.৩ : শিবায়ন কাব্যের বৈশিষ্ট্য

পৌরাণিক শিবের মাহাত্ম্য বর্ণনাই যদি 'শিবায়ন' কাব্যের বিষয়বস্তু হত,তবে এটিকে আর মঙ্গলকাব্য বলা সঙ্গত হত না। এটি হত তবে বাংলা পুরাণ অথবা পুরাণের অনুবাদ কিংবা সারসঙ্কলন। কিন্তু শিবায়ন কাব্যের কাহিনী বিশ্লেষণ করলে আমরা পৌরাণিক শিব ছাড়াও অপর এক লৌকিক শিবের সন্ধান পেয়ে থাকি। মঙ্গলকাব্যের লক্ষণযুক্ত এই কাহিনীটির জন্যই 'শিবায়ন' কাব্য মঙ্গলকাব্য বলে অভিহিত হবার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

যাবতীয় মঙ্গলকাব্যের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে 'শিবায়ন' কাব্যকেই সর্বাপেক্ষা অর্বাচীন বলে মনে হলেও,সম্ভবত শিবায়ন কাব্যের উদ্ভব ঘটেছিল চৈতন্যপূর্ব যুগেই। চৈতন্য-জীবণীকার বৃন্দাবন দাস তৎকাল প্রচলিত 'শিবের গায়েন'-এর কথা উল্লেখ করেছেন এবং শিবের গান শুনে স্বয়ং মহাপ্রভু যে শংকর মূর্তি ধারণ করতেন, এই দুর্লভ সংবাদটি বৃন্দাবন দাস আমাদের জানিয়ে গেছেন। এ থেকে পরোক্ষভাবে আমরা শিবের অসাম্প্রদায়িক চরিত্রেরও একটি পরিচয় পেয়ে থাকি। বস্তুত বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে এবং বৈষ্ণবোত্তম চৈতন্যদেবের মনে শিবের এই মর্যাদাবোধ হেতু শিবকে আমরা 'জাতীয় দেবতা'র আসনে স্থান দিতে পারি।

পূর্বে শিবের উদ্ভব বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে যে প্রাগার্য, অনার্য ও আর্য ধারণার সংমিশ্রণের কথা বলা হয়েছে, তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাব। এ বিষয়ে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন- "গৌতম বুদ্ধের জীবনাদর্শ হইতে পৌরাণিক শিবের পরিকল্পনা হইয়াছিল, সেইজন্য বাংলার বৌদ্ধগত পৌরাণিক শৈব ধর্মমতের মধ্যে নিজের আদর্শেরই সন্ধান পাইল। জৈন তীর্থঙ্করের জীবনাদর্শ ও গৌতম বুদ্ধ এবং এই পৌরাণিক শিবের আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র ছিল না সেইজন্য এই বিরাট জৈন সম্প্রদায়ও ক্রমে নব-প্রতিষ্ঠিত শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিলীন হইয়া গেল। এইভাবে দেখিতে পাই, খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পর হইতে বাংলার শৈবধর্ম এক বিরাট সম্প্রদায়ে পরিণত হয়।" বাংলার সর্বসম্প্রদায়ের

নিকট গ্রহণযোগ্য এই 'জাতীয় শিবই বাংলার যাবতীয় সম্প্রদায়ের মঙ্গলকাব্যসমূহের দেবখণ্ডে মর্যাদার আসন লাভ করেছেন। তবে 'শিবায়ন" কাব্যে শিবের এক স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে বলেই এত সব মঙ্গলকাব্যে শিবকাহিনী বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও পৃথক শিবায়ন কাব্যের সার্থকতা রয়েছে।

৬.৪: শিবায়ন কাব্যের কাহিনী

বাংলার শিব বিষয়ক কাহিনীগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১)মৃগলুব্ধ কাহিনী ২) শিবায়ন কাব্য -প্রথম শ্রেণীর কাব্যে পর্যায়ের অংশ পৌরাণিক আদর্শ প্রধান।

মৃগলুব্ধ-

মৃগলুব্ধ কাব্যের এপর্যন্ত জ্ঞাত কবি রতিদেব। এর বিষয়বস্তু নিম্নরুপ । প্রথমে দেব দেবী বন্দনা ও আত্মপরিচয় বর্ণনার পর মধু কৈটভ বধ এর গল্প আছে। শিব মুনিপত্নীকে লঙ্ঘন করায় শিবের শাপে শিবের লিঙ্গচ্যুতি,ভ্রষ্ট লিঙ্গের প্রভাব ইত্যাদি ঘটনা হরগৌরী সংবাদে ব্রতের আকারে বিবৃত। রাজা মুচুকুন্দ ও রানী রুক্মিণীর কথোপকথনে মূল উপাখ্যানটি বর্ণিত। একদিন রাজা মুচুকুন্দ শিবচতুর্দশীর পুজো সাঙ্গ করে রানী রুক্মিণীর কাছে ব্রত কথা শোনেন। রানীর গল্প এরকম-বিদ্যাধর চিত্রসেন একদিন ইন্দ্রের সভায় নৃত্যের সময় হরিণ শিকারের দৃশ্য দেখে তালভঙ্গ করেন। তাকে নরলোকে ব্যাধ জীবন-যাপনের অভিশাপ দেন। ভদ্রসেন মৃগের সাক্ষাৎ লাভ করলে চিত্রসেনের শাপমুক্তি হবে- এ নির্দেশও ইন্দ্রের ছিল। সারাদিন হরিণ খুঁজে ব্যর্থ, শ্রান্ত ,অবসন্ন, উপবাস ক্লিষ্ট, ব্যাধ চিত্রসেন রাত্রিতে আত্মরক্ষার জন্য বেল গাছে ওঠে ।সেদিন ছিল শিবচতুর্দশী। চিত্রসেন গাছে ওঠার সময় একটি সজল বিল্বপত্র বৃক্ষের তলায় শিবলিঙ্গের উপর পড়ে। শিব তখন পরিতুষ্ট হয়ে ব্যাধকে বর দিতে আসেন ।ব্যাধ তার কাছে পরদিন সকালে পশুর লাভের বর পায়। পরদিন ভদ্রসেন মৃগ ব্যাধের জালে আবদ্ধ হয়। এদিকে ভদ্রসেনের সঙ্গিনি মৃগী কিছুতেই তাকে ত্যাগ করে যেতে চায়নি। নিজের প্রাণ বিপন্ন

করেও স্বামী মৃগটীকে উদ্ধারের জন্য কৃত সংকল্প। এমন সময় ব্যাধ চিত্রসেন সেখানে উপস্থিত হন।

মৃগী বলেন জীব হত্যার তুল্য পাপ নেই। কেবল শিবরাত্রি ব্রতে সেই পাপমোচন সম্ভব এমন অনেক কথা বলে মৃগী তাকে ধর্মউপদেশ দিলেন।মৃগীর বাক্যে চিত্রসেনের জ্ঞানোদয় হয়। চন্দ্রভাগা তীরে শিবমন্দিরে আরাধনা করে চিত্রসেন পাপমুক্ত হন। ভদ্রসেন ও তাঁর পত্নী মৃগীও শিবলোক পেলেন। রুক্মিণীর এই কথা শুনে মুচুকুন্দের শিবরাত্রি ব্রত উদযাপিত হয়। পরদিন সকালে চন্দ্রভাগা তীরের শিব মন্দিরে পূজা শেষ করে রাজা লোকান্তরিত হয়ে শিবলোক প্রাপ্ত হন।

লৌকিক শিবায়ন কাব্য সমূহের গল্পাংশে দেবমাহাত্ম্য কীর্তনের চেয়ে লোক জীবনাশ্রিত গল্পরস আছে। প্রাথমিক অংশে পৌরাণিক কাহিনী আছে। ইন্দ্র সভায় শিবের দ্বারা নমস্কৃত না হয়ে দক্ষ প্রজাপতি ক্ষোভ,শিব হীন দক্ষ যজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ,দক্ষের বিড়ম্বনা , গৌরীরূপে হিমালয় ও মেনকার ঘরে সতীর পুনরায় জন্মগ্রহণ,পার্বতীর সাধনা ও শিবকে পতিরূপে লাভ ইত্যাদি কথা প্রসঙ্গের শেষেই আরম্ভ হয়েছে বাঙালির লোকায়ত গল্প। অবশ্য এই অংশে মৃগলব্ধ অনুযায়ী বাধ্যকথা শিবরাত্রি মাহাত্ম্যের বর্ণনাও রয়েছে সংক্ষিপ্ত আকারে। শিবায়ন এর মুখ্য গল্প এরকম-

গাহস্থ্যজীবনে পার্বতীর বড় দুঃখ ভিক্ষান্নে সংসার আর চলে না।মহাদেবকে তিনি কৃষক হওয়ার পরামর্শ দেন। বিশ্বকর্মা চাষের জোয়াল,লাঙল,মই তৈরি করে দিলেন। কুবেরের ভান্ডার থেকে এলো বীজ ধান।ক্রমে শিবের কৃষিকর্ম সার্থক হয়ে উঠল- বসুন্ধরা হল শস্যপূর্ণা। আনন্দে নিজের দারিদ্র্য লাঞ্ছিত পরিবারের কথা ভুলে গেলেন।শিব ঘরে আসেন না পার্বতী দুঃখ-দুর্দশা অবধি নেই। নারদের কথায় শিবকে জব্দ করার জন্য তিনি উঙানি মশা,মাছি,ডাঁশদের পাঠালেন। শিবের পাকা ধানে পোকা পড়ল কিন্তু শিব নির্বিকার। অবশেষে মোহিনী বাগদিনীরূপে দেবীও মহাদেবকে বিভ্রান্ত করলেন। শিবের মন এবার টলল। বাগদিনীররূপে পাগল ভোলানাথ। ঠিক সেইসময় পার্বতীর ঘরে ফিরে এলেন।শিবও অনেকদিন পরে ঘরে এলেই পার্বতী সধবার ভূষণ শাঁখা চাইলেন শিবের কাছে। শাঁখা পড়লেই স্বামী আর বিমুখ হবেন না এই বিশ্বাসেই গৌরীর শাঁখা পড়ার

অভিলাষ। শিব ভিখারি পাবেন কোথায় অর্থ যে গৌরীকে শাঁখা পড়াবেন। দুঃখে পার্বতী পিত্রালয়ে চলে গেলেন।হিমলয় গৃহে তখন দুর্গোৎসব।শিব শঙ্খ বণিকের বেশে শ্বশুরালয়ে উপনীত হন। পরে পার্বতী বিশ্বনাথের কাছে নারীর শ্রেষ্ঠ ভূষণ শঙ্খ পরিধান করে মহাকালী রূপে আবির্ভূত হন।হরপার্বতীর বিবাদ মিটে গেল,তাঁরা ফিরে এলেন কৈলাসে।

৬.৫: শিবায়ন ও মঙ্গল কাব্যের পার্থক্য

(ক) মঙ্গলকাব্যের মতো শিবের পূজা ও মাহাত্ম্য প্রচার শিবায়ন কাব্যে দেখা যায় না। কোন অনিচ্ছুক ব্যক্তি কে ভয় বা প্রলোভন দেখিয়ে শিবভক্তের পরিণত করার প্রথানুগ বৈশিষ্ট্য শিবায়ন কাব্যে বিরলদৃষ্ট। কোন শাপভ্রষ্ট দেব-দেবীর সাহায্যে পূজা প্রচারের পরিকল্পনা এখানে দেখা যায় না।

(খ) অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে নায়কের বাণিজ্য বাদ শিকার পেশার পরিচয় পাওয়া যায়।এখানে কৃষিজীবি বৃদ্ধ দরিদ্র শিব নীতিহীন ধূলিমাখা মর্ত্যমানব মাত্র।

৬.৬: শিবায়নের কবিগন

শিবায়ন কাব্যে আছে দুটি ধারা- একটি চট্টগ্রামে প্রাপ্ত মৃগলুব্ধ মূলক উপাখ্যান, বা শিবমাহাত্ম্য কাহিনী, অন্যটি শিবপুরাণ নির্ভর শিবায়ন কাব্য।

চট্টগ্রাম থেকে প্রাপ্ত শিবমাহাত্ম্য জ্ঞাপক কাব্যের সংখ্যা দুটি। একটি দ্বিজ রতিদেবের ‘মৃগলুব্ধ’, অন্যটি রামরাজার ‘মৃগলুব্ধ সংবাদ’। দুটিরই প্রকাশকাল ১৩২২ বঙ্গাব্দ। আবিষ্কারক আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ। তাঁর সংগ্রহে ছিল আরো একটি নাম পরিচয়হীন পুঁথির অংশ বিশেষ। দীনেশচন্দ্রের মারফৎ রঘুনাথ রায় নামে আরও এক কবির নাম পাওয়া যায়, যদিও তাঁর অস্তিত্ব পুঁথি সমর্থিত নয়।

রতি দেব:

করিম সাহেবের মতে, রতিদেব অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের কবি। রতিদেব চট্টগ্রামের চক্রশালা পরগনার অন্তর্গত সুচক্রদন্ডী গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কবি আত্মপরিচয় দিয়েছেন এইভাবে-

'পিতা গোপীনাথ মাতা মধুমতী।

জন্মস্থান সুচক্রদন্ডী চক্রশালা খ্যাতি।।'

রতিদেবের নামে প্রচলিত দুখানি পুঁথির (একটি অনুলিখিত ১২০৩ ও অপরটি ১২১৩তে)সন-তারিখ এবং ভাষা ও রচনাবলী ভিত্তিতে তাঁর যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত স্থাপন। কাব্যে আছে-

'রস অঙ্ক বাউশশী শাকের সময়।

তুলা মাসে সপ্তবিংশতি গুরুবার হত্র।।'

অর্থাৎ ১৫৯৬ শকাব্দের কার্তিক মাসে (১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে) এই কাব্য রচিত হয়। রামরাজার মৃগলুব্ধ সংবাদের দুখানি পুঁথির একটি ১১৪২ মাঘীসনে এবং অপরটি ১১৯৬ মাঘীসনে অনুলিখিত।

রাম রাজা:

রামরাজার ব্যাক্তি পরিচয় মাত্র ভনিতাতেই সমাপ্ত- "শংকর কিংকর রামরাজা"। ড.সুকুমার সেনের মতে, কবির নাম শিশুরাম রায়। কারণ 'শংকর কিংকর রামরাজ গাএ'। তবু শেষ পর্যন্ত সবই অনুমান, অনুমান করিম সাহেবের কবিকে মগ বংশদ্ভুত বলে প্রমানের প্রচেষ্টা পর্যন্ত। বিপরীতভাবে রতিদেবের কাব্যে পারিবারিক পরিচয় বিস্তৃত- পিতা গোপীনাথ, মাতা মধুমতী, জ্যৈষ্ঠ ভাই দুজন রামচন্দ্র ,নারায়ন ইত্যাদি। জন্মস্থান চন্দ্রশালা বা পটিয়া বাকলা গ্রাম।

রামরাজা ও রতিদেবের কাব্যের বিষয়বস্তু একইপ্রকার ,ঘটনা বিন্যাসেও সাদৃশ্য বর্তমান। বলা হয় রতিদেব রামরাজার অনুকরণকারী। তবু কথা ঠিক, রামরাজা অপেক্ষা রতিদেবের কাব্যে কাহিনী অনেক সংহত এবং প্রসাদগুণ মণ্ডিত। তুলনা করলেই তা ধরা পড়ে-

প্রথমোক্ত কবির কাব্যে সতীহারা মহাদেবের বিলাপ-

'আপ্ত বিস্মরিলুম মুঞি তোহ্মার বাপের শাপে।

সেই হেতু তোহ্মা লয়ি ভ্রমি শোকতাপে।।'

আর রতিদেবের হাতে যমদ্বারের চিত্র-

"যমের দক্ষিণদ্বার অবিশ্রাম হাহাকার

যেন ডাকে সমুদ্রের জল।

সদাএ ঘোর অন্ধকার নিশিদিন কাটমার

রাত্রিদিন করে হাহাকার।।'

রামেশ্বর ভট্টাচার্য (চক্রবর্তী) :

শিবায়ন শাখার সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য। ভারতচন্দ্রের অর্ধশতাব্দী আগে এবং কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের দেড়শত বৎসর পর কবি আবির্ভূত হন। পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রজ্ঞান, বাস্তবতায়, দৈনন্দিন জীবনের চিত্রাঙ্কনে, পরিহাসরসিকতায় তাঁকে প্রায় মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের মতো সমকক্ষ কবি বললে অত্যুক্তি হয় না।'ভব্যকাব্য ভদ্রকাব্য' প্রণেতা রামেশ্বর মুকুন্দের মতো কবি প্রতিভার অধিকারী নন। ভারতচন্দ্রের মতো রচনা বৈদগ্ধ্যও তাঁর ছিলনা। অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগলক্ষণ তাঁর কাব্যে পরিপুষ্ট।

উনিশ শতকের শেষ ভাগে রামেশ্বরের শিবায়নের 'বঙ্গবাসী' সংস্করনের সম্পাদক ঈশানচন্দ্র বসু, আধুনিক সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীলাল হালদারের শিবায়নের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্করন শিবসঙ্কীর্তন বা শিবায়ন ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয় শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী তাঁদের সম্পাদকীয় ভূমিকায় রামেশ্বর সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য দিয়েছেন, তা থেকে কবি জীবনী সম্বন্ধে মোটামুটি সমস্ত কথাটাই জানা যায়।

রামেশ্বর কাব্যের মধ্যে নিজ গ্রামের নাম উল্লেখ করেছেন 'সাকিম বরদাবাটি যদুপুর গ্রাম'। রামেশ্বরের কোনো বংশধর নেই। সম্ভবত তিনি নিঃসন্তান। কবির পিতামহ গোবিন্দ চক্রবর্তী ছিলেন বেদজ্ঞ পণ্ডিত। কবির দুই পত্নী- সুমিত্রা ও পরমেশ্বরী।

রামেশ্বর শিবায়নে নানাস্থানে রাজারামসিংহ তার পুত্র যশোবন্ত সিংহের প্রতি জানিয়েছেন তাঁর শ্রদ্ধা ও প্রশস্তি-

'রাজা রামসিংহ সুত যশোমন্ত নরনাথ

তস্য পোষ্য দ্বিজ রামেশ্বর।'

মোগল আমলে বর্ধমান-মেদিনীপুর-হুগলি অঞ্চল শোভাসিংহ নামক এক দুর্দান্ত জমিদারের হাতে আসে। তাঁর মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হেমন্ত সিংহ সিংহসনে বসেন। রামেশ্বরের সঙ্গে এই রাজার মনোমালিন্য হওয়ায় কবি মেদিনীপুরের কর্ণগড়ের সামন্ত রামসিংহের আশ্রয়ে রাজসভায় পুরাণ পাঠক হন।

রামেশ্বরের শিবায়ন কাব্যে পুরাণের ঘনিষ্ঠ অনুকরণ আছে। কিন্তু শিবায়ন এর ঘটনা বিন্যাসে কবি মৌলিক। তৃতীয় পালার মাঝামাঝি থেকে রামেশ্বর অনুসরণ করেছেন লৌকিক শিবের কাহিনী। শিবের মোহনমূর্তি ধারণ- হরগৌরী বিবাহ ও তৃতীয় পালার বিশেষ আকর্ষণ। হরগৌরীর নানা তত্ত্বকথা আলোচনা ,রাম নাম মাহাত্ম্য ও হরিনাম মাহাত্ম্যের ঘোষণায় চতুর্থ বালা সমাপ্ত হয়েছে।পঞ্চম ও ষষ্ঠ পালায় জাগরন অংশটি বর্ণিত। ষষ্ঠ পালায় মহাদেবের কৈলাস ত্যাগ ও কৃষিকার্য গ্রহণ ও সমস্ত পালায় বাগদিনী বেশী মহামায়ার সঙ্গে শিবের মৎস্য ধরার পরিচয় আছে। কিন্তু যথার্থ লৌকিক কাহিনী আছে ষষ্ঠ পালায়।ষষ্ঠ পালায় মহাদেব কৈলাস ত্যাগ করে কৃষকরূপে অবতীর্ণ।সমস্ত পালায় বাগদিনী বেশিনী মহামায়া সঙ্গে শিবের মাছ ধরার ও শিবকে ছলনা করে দেবীর কৈলাসে প্রস্থান বর্ণিত। শিবেরও কৈলাস যাত্রার কাহিনী এই পালায় পাওয়া যায়।

জাগরন পালায় নারদের প্ররোচনায় পার্বতীর স্বামীর কাছে শাঁখা পরার বাসনা, শিবের সে ব্যাপারে দারিদ্র্যজনিত অক্ষমতা জেনে দেবী সাভিমানে চলে যান পিত্রালয়ে। এরপর শিব গৌরীকে শাঁখা পরিয়ে পত্নীর মানভঞ্জনের চেষ্টায় সফল হন। হর-পার্বতীর মিলনে কাব্যটি সমাপ্ত। এটাই লৌকিক কাহিনীর ধারা। এই লোকায়ত কাহিনী কোন পুরাণে নেই। কেবল নন্দিকেশ্বর পুরাণের কিছু অংশে শিবের কৃষিকাজের বর্ণনা আছে। ধর্মমঙ্গলেও শূন্যপুরাণে অংশে শিবের চাষবাসের বর্ণনা আছে। পূর্ব ভারতের নিষাদ যুগ

থেকে(অস্ট্রিক)ধান্যক্ষেত্রের দেবতারূপে ক্ষেত্রপাল ধরনের কোন কৃষিদেবতার পূজা তদানীন্তন আর্যেতর কৃষকসমাজে প্রচলিত ছিল।এইজন্য মধ্যযুগীয় লৌকিক বাংলা সাহিত্যের একটা বড় অংশে ধানের এত বিচিত্র রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়।

পার্বতী কৃষিকার্যে নিরত মহাদেব কে উত্যক্ত করার জন্য ডাঁশ মশা পাঠালেন। এই মশা-

'সূক্ষ্ম বটে শরীর সামর্থ্যে নহে ত্রুটি।

হাতি পারা জন্তুকে হারাতে পারে দুটি।।'

মহাদেব কি ফিরিয়ে আনার সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে পার্বতী বাগদিনী বেশ ধরে মহাদেবের ধানক্ষেতে উপস্থিত হন। ডাঁশ মশা,মাছি,জোঁক পাঠিয়ে মহামায়া যা করতে, পারেননি শুধু বাগদিনী বেশ ধরেই পার্বতী মহাদেবকে বশীভূত করলেন তাঁর মনমোহিনী রূপে-

'কামিনী কটাক্ষ শরে

অস্থির করিলা ভূতনাথে।'

শিবের মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়েছে যে এই মোহিনীরুপা নারী তাঁর স্ত্রী। তাই ভৃত্য মহাদেবকে বলেন- 'মোর মনে হেন লয় কদাচিত হবে তোর মামী।'

বাক্যচ্ছলে মহামায়া নিজ পরিচয় দিলেও শিব বাগদিনীকে সাঁগা করার জন্য উৎসুক। শেষে মহেশ্বর হাটু জলে নেমে জল সেঁচে মাছ ধরলেন-

'সোলশাল রোহিত মৃগাল ধরে তাড়্যা।'

শিবকে বাসর নির্মাণ করতে বলে ছদ্মবেশিনী দেবী কৈলাসে ফিরে নিজ মূর্তি ধরলেন। এদিকে বাসর সাজিয়ে অপেক্ষা করতে করতে হতাশ।গৌরি সক্রোধে ছেলেদের দিলেন করা হুকুম-

'তোর বাপ বাগদি হঅ্যছে ছাড়্যা মোকে।

তার ঠাঞি যাস নাই ছুঁস নাই তাকে।।'

নারদের প্ররোচনায় দেবী মহাদেবের কাছে শঙ্খ পরার অভিলাষী। দেবীর শাঁখা পরার বাসনায় মহাদেব ব্যঙ্গের সুরে বললেন-

'ভিখারির ভার্যা হৈয়া ভূষণের সাধ।'

ব্যাপার এত দূর গড়াবে তা শিব বোঝেননি। দেবী পিত্রালয়ে চলে গেলেন। শাঁখারির ছদ্মবেশে হিমালয় শ্বশুর বাড়িতে পৌঁছে শাঁখারি শিব পার্বতীর হাতে শাঁখা পড়ালেন। শেষে ধ্যানের তালিকা দিয়ে গীত শেষ করলেন রামেশ্বর।

রামেশ্বরের শিবায়ন পন্ডিত ব্যক্তির রচনা হলেও হরপার্বতীর লৌকিক লীলায় গ্রাম্য ধুলোট উৎসব ও গাজনের রঙ্গরসে ভরপুর।এই কাব্যকে মধ্যযুগের একমাত্র শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি কাব্য বললে ভুল হবে। দরিদ্র শিবের ঘর-সংসার ও তার বর্ণনা বাস্তব।দেবি রণচণ্ডী মূর্তিতে বাগদিনী সংস্পর্শের অপরাধে খোদ মহাদেবকেও ঘর থেকে ভাগিয়ে দিতে প্রস্তুত কিন্তু ঘটনার মধ্যে জমাট ভাব নেই। নারদ ও ভীম চরিত্র ও লোকায়ত ভাবনার স্পর্শে অনেকটাই লৌকিক। কোন কোন স্থানে কবি ভারতচন্দ্রের মতোই সরস-

'তিন ব্যক্তি ভোক্তা এক অন্ন দেন সতী।

দুই সুতে সপ্তমুখ পঞ্চমুখ পতি।।

তিন জনে একুনে বদন হইল বার।

গুটি গুটি দুটি হাতে যত দিতে পার।।'

বিবাহের পর কন্যা বিদায়ের পূর্বে শাশুড়ি জামাতা শিবকে যা বলেছেন তা বাঙালির মর্মকথা-

'কুলীনের পোকে আর কি বলিব আমি।

বাছার অশেষ দোষ ক্ষমা কর তুমি।।

আঁটু ঢাক্যা বস্ত্র দিয়ে পেট ভরা ভাত।

প্রীত কর যেমন জানকী রঘুনাথ।।'

এক যুগের সম্পন্ন গৃহস্থের চিত্রটি কবি লেখনীর এক আচঁড়ে মূর্ত।

কবির কিছু কাব্যবিন্যাস প্রশংসনীয়-

১) দিনে হও ব্রহ্মচারী রাতে গলাকাটা।

২) হাঁড়ির মুখের মতো মিলি গেল সরা।

৩) পুঞ্জি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল।

৪) মরণ অধিক দুঃখ মাগ্যের বাখান।

৫) নামের নিমিত্তে লোক নানা কর্ম করে।

রামেশ্বরের অনুপ্রাসগুলিও তাঁর কারুকলার পরিচায়ক-বিশেষত তাঁর কাব্যেঃ

১)খঞ্জন গঞ্জন আঁখি অঞ্জন রঞ্জিত।

কটাক্ষে কন্দর্প কত কোটি মূরছিত।

২) কর্জ কর কত্যায়ানী কুবেরের কাছে।

কবির শিবায়নের কেন্দ্রীয় চরিত্র শিবশক্তি। কিন্তু রামেশ্বর ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মের অনুরাগী।

‘শুদ্ধভাবে হরিনাম সদা সেই স্মরে।

বন্দ তার পাদপদ্ম মস্তক উপরে।।’

গ্রামীণ জীবন ও সংস্কারের পটভূমি অঙ্কনে রামেশ্বরের কর্তৃত্ব অনস্বীকার্য।

রামচন্দ্র কবিচন্দ্র:

জনগোষ্ঠীর হৃদয়ে স্বীকৃত সম্মান না পেলেও শিবায়ন কাব্য ধারার স্মরণীয় ব্যক্তি রামচন্দ্র রায় কবিরত্ন। দুখানি মাত্র পুঁথির ভিত্তিতে তাঁর কাব্য সম্পর্কে পরিচয় লাভ। তার মধ্যে একটি খণ্ডিত এবং খুবই অর্বাচীন কালের লিপিকৃত রামচন্দ্রের প্রথম পুঁথিটির আবিষ্কারক বিশ্বকোষ পর্যায়ের তত্বাবধায়ক নগেন্দ্রনাথ বসু। ১৩০৬ বঙ্গাব্দে মৃণালকান্তি ঘোষের সহযোগিতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় তাঁর এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার

সূত্রপাত। পুঁথিটির লিপিকাল ১০৯১ বঙ্গাব্দ। ১১ শ্রাবণ (১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দ) কিন্তু পরবর্তী গ্রন্থ সম্পাদক ড.দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য এই তারিখ মানতে অনিচ্ছুক। দ্বিতীয় পুঁথিটির আবিষ্কারক কবির বংশধর শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল রায়। তাঁর পুঁথিটির লিপিকাল ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ (১৭২৬ খ্রিস্টাব্দ)। পুঁথিটি প্রমানিক এবং পূর্ণাঙ্গ।

কবির পূর্বপুরুষের আদি বাসস্থান হাওড়া জেলার আমতার কাছে দামোদরের তীরে অবস্থিত রামপুর গ্রাম। তাঁরা দক্ষিণ রাঢ়ীর কায়স্থ বংশীয় , কৌলিক উপাধি দেব পরে ‘রায়’ উপাধি ধারণ। শিবায়নের আর এক কবি রামকৃষ্ণ রায়ের পুঁথি থেকেই জানা যায়, কাব্য রচনার পূর্বেই রামকৃষ্ণ ‘কবিচন্দ্র’ খ্যাতি অর্জন করেন- ‘শ্রীকবিচন্দ্র বিরচিতা শিবসঙ্গীত পুস্তক সমাপ্ত’(পুষ্পিকা)। কবির পিতার নাম কৃষ্ণ রায়। পিতামহ যশশ্চন্দ্র রায় মাতা রাধারদাসি ,মাতামহ সূর্যমিত্র পিতার পান্ডিত্যের দুর্লভ উত্তরাধিকার রামকৃষ্ণ অর্জন করেন। সম্ভবত পরিণত যৌবনেই তাঁর কাব্য রচিত হয়।

বাড়িতে রক্ষিত দলিল-পত্রাদির ভিত্তিতে পাঁচুগোপাল বাবুর অনুমান, কবির জন্ম ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দেরও আগে। কিন্তু গ্রন্থ সম্পাদকদ্বয়ের মতে ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দের দিকে কবির জন্ম, মৃত্যু ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দে। মৃত্যুর কারণ বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরামের রসপুর গ্রামের কবি গৃহদেবতাকে বলপূর্বক হরণ শোকে-লজ্জায়-অপমানে কবির মৃত্যু হয়।

রামচন্দ্রের কাব্যের নাম লিপিকরের বিচারের ‘শিবসংগীত’। কিন্তু মুদ্রিত কাব্যের মধ্যে শিবমঙ্গল এবং শিবায়ন নামটিও মাঝে মাঝে চোখে পড়ে-‘রামকৃষ্ণ দাস গান শিবের মঙ্গল’, ‘রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন’। কাব্যটির কাহিনী দীর্ঘায়ত, মোট ২৬ টি পালায় বিভক্ত। প্রথম তিনটি পালায় সৃষ্টিতত্ত্ব, কাল বিভাগ ও তীর্থ মাহাত্ম্যের বিস্তারিত বর্ণনা, চতুর্থ ও পঞ্চম পালায় সতীর দেহত্যাগ ও দক্ষযজ্ঞ বিনাশ ,ষষ্ঠ -সপ্তম –অষ্টম পালায় তারকাসুর বধ ,মহাদেবের তপভঙ্গ ,মদনভস্ম, পার্বতীর তপস্যা, মহাদেবের গৌরী লাভের ইচ্ছা পর্যন্ত বর্ণিত ।নবম থেকে বিশ পর্যন্ত পালায় হরগৌরীর বিবাহ, মনসা উপাখ্যান, সমুদ্র মন্থন, বলি রাজার কাহিনী রাজার কাহিনী, সগর রাজা ও গঙ্গার কাহিনী আছে। বাকি ছটি পালাতে আছে ত্রিপুরাসুর ও তারকাসুর আখ্যান, শিব দুর্গার

ঝগড়া,অন্ধকের গল্প, অন্ধকবধ, পরশুরাম ও রাবণের কথা, বাণ রাজের কন্যা ঊষা ও কৃষ্ণ-নন্দন অনিরুদ্ধের মিলনের কাব্য সমাপ্ত হয়েছে।

রামচন্দ্রের সুবিশাল কাব্যটির মধ্যে মোটামুটি ভাবে তিনটি ধারা লক্ষণীয়- প্রথমত ,মন্বন্তর -সৃষ্টির রহস্য প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত ধারা। দ্বিতীয়ত, শিব কাহিনী এবং তার আনুষঙ্গিক পৌরাণিক উপকাহিনীর ধারা। তৃতীয়ত, লৌকিক শিবায়ন শ্রেণীর রঙ্গধামালি। পৌরাণিক প্রজ্ঞা ও লৌকিক ভাবনায় প্রকাশ থাকলেও দেখা যায় চিরায়ত পুরাণের প্রতি কবির ঝোঁক বেশি। শৈব শাক্ত পুরাণের সঙ্গে বৈষ্ণব পুরাণ পাঠের অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। হরিহরের মিলন প্রচার ছিল তাঁর কাব্যে অন্যতম উদ্দেশ্য – 'হরিহর দোঁহে এক শরীর অভেদ'।তবু সামগ্রিকভাবে ব্রহ্মের প্রতি এবং মীননাথ-গোরক্ষনাথ- চৈতন্যদেব - নিত্যানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশে কবি ছিলেন অকুণ্ঠিত।

শিবায়ন কাব্যধারার মধ্যে রামচন্দ্রের কাব্যটির প্রধান লক্ষণীয় বিশেষত্ব , প্রচলিত লৌকিক শিব কাহিনী ছেড়ে যথাসম্ভব পৌরাণিক কাহিনীর অনুসরণ। এই কাব্যধারায় অপর দুই কবি রামেশ্বর এবং শংকর কবিচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর স্বাতন্ত্র্যের একটি অন্যতম কারণ এখানেই নিহিত। হরগৌরীর বিবাহ প্রসঙ্গ ছাড়া দেবীর বাগদিনী রুপে শিবকে ছলনা,শিবের কুচনী পাড়ায় যাত্রা প্রভৃতি লৌকিক কাহিনী রামচন্দ্রের কাব্যে একেবারেই লক্ষণীয় নয়। তাঁর কাব্যের রুচি সমুচিত, সংহত এবং রীতিমত প্রশংসনীয়। পুরাণের আবহে নানা নীতি, তত্ত্ব ও দর্শনের পটভূমিতে বহু উপকাহিনী পরিব্যপ্ত।এই বিদগ্ধ কাব্য যতখানি উপলব্ধির বিষয়, ততখানি উপভোগের নয়।

রামকৃষ্ণের কাব্যের দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিশেষত্ব ভাষা, শব্দ সম্পদ এবং ছন্দ ব্যবহারে নিপুণতা। যেমন কৃষ্ণ প্রশস্তি বন্দনা-

'নীপ সমীপ নব নীরদ

তড়িতলতা তথি অঙ্গ।

রাধা অঙ্গে অঙ্গ অবলম্বন

পীতাম্বর তিরিভঙ্গ।।'

কুমারসম্ভব কাব্য অনুসরণে রতিবিলাপ অংশও-

'অনাথ করিয়া মরে যাও প্রভু কোথাকারে।

আর না দেখিব চান্দমুখ।।'

পান্ডিত্যের প্রতিবাদীতায় রচনা ভঙ্গি মাঝে মাঝে যে বেশ নীরস এবং তত্ত্ব মুখ্য হয়ে উঠেছে, এ কথা অনস্বীকার্য। কবি রামেশ্বরের কাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বাংলা গদ্য ব্যবহারের প্রথম প্রয়াস এখানে দেখা যায়। পয়ার- ত্রিপদীতে কাব্য ঘটনা বলতে বলতে তিনি পরিচ্ছন্ন অন্বয় এবং স্বাভাবিক বাক্যবিন্যাসে গদ্য ব্যবহার করেছেন। যেমন-'মহিষ পর্বতে গিয়া পূর্ব গল্পের কথা ক্রৌঞ্চকে কহিতেছেন ,অবধান করহ।' 'অথবা পার্বতী ভাগীরথী স্নান করিতে গেলেন, এমন সময় শংকর মনের দুঃখে নারদ কে কহিতেছেন, অবধান করহ' ইত্যাদি। বাংলা সাধু গদ্যের প্রথম স্রষ্টায় সম্মান তাকে দেওয়া যায়।

শংকর কবিচন্দ্র:

সপ্তদশ শতকের শিবায়ন কাব্য ধারায় স্মরণীয় হয়ে আছেন শংকরকবিচন্দ্র ।কবি কৃষ্ণ রামের মতো শংকরের কবি প্রতিভা বহু কাব্য সৃষ্টিতে বিভক্ত। শিবায়ন ছাড়া ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত, শীতলা মঙ্গল, প্রভৃতি কাব্যেরও তিনি রচয়িতা ।সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিষ্ণুপুরের এক ব্রাহ্মণ কবির জন্ম হয়। গ্রামের নাম পানুয়া। বিষ্ণুপুর রাজ গোপাল সিংহের তিনি ছিলেন সভাকবি। আবার এই বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ এর রাজত্বকালে (১৭০২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে) তিনি রামায়ণ পাঁচালি রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়।

শঙ্করের শিবায়ন কাব্যের পুরো পুঁথি পাওয়া যায়নি ।তবে প্রাপ্ত 'মচ্ছধরা পালা' এবং মাখনলাল মুখোপাধ্যায় উল্লিখিত 'শঙ্খপরা পালা'টি তাঁর রচনার বলে জানা যায়। মচ্ছধরা পালাটি শিবায়ন এর লোক প্রচলিত কাহিনীর প্রথম লিখিত রূপ বলা যায়। কৃষাণ ও জালিক শিবের প্রথম পূর্ণাঙ্গ চরিত্রাঙ্কনের কৃতিত্ব শংকর কবিচন্দ্রের প্রাপ্য। বাগদিনী বেশিনী দেবীর বর্ণনা-

'বাগ্দিনী বেশ করি উভ করি খোঁপা।

পুষ্পমালা তাতে সোভে সুবর্ণের ঝাঁপা।।

কান্ধেতে ঘুনসি জাল ইসাদের কড়ি।

পরিপাটি কান্ধে সাজে মচ্ছের চুপড়ি।।'

পালাটির মধ্যে ভণিতা পাওয়া যায় একাধিক নামে -শ্রীকবিকঙ্কণ, শ্রীকবিশংকর, সুকবিশংকর,দ্বিজ কবিচন্দ্র প্রভৃতি। লিপিকর প্রমাদে কখনো কখনো 'কবিচন্দ্র' 'কবিকঙ্কনে' রূপান্তরিত হয়েছে।

৬.৭: শিবায়নের শ্রেষ্ঠ কবি রামেশ্বরের পরিচয়

মধ্যযুগের কাব্য-কাননে যারা স্বমহিমায় কবিত্ব শক্তির ঝঙ্কারে দেশবাসীর হৃদয়ে চিরতরে স্থান করে নিয়েছেন, 'শিবসঙ্কীর্তন' বা 'শিবায়ন' কাব্যের কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি আবার 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী' কাব্য প্রণেতা। এযুগের বাঙালি পাঠক-শ্রোতার মনের জগতে তাঁর কবি-ব্যক্তিত্ব আজও সুপ্রতিষ্ঠিত। আজকের দিনে সমাজ বাস্তবতার নিরিখে, মূল্যবোধের নিরিখে ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ- এদের কবি ব্যক্তিত্বের সঙ্গে রামেশ্বর ভট্টাচার্যকে একাসনে বসিয়ে বাঙালির হৃদয় রাজ্যে চিরকালীন স্থান দিতে হবে। কেননা রামেশ্বর ভট্টাচার্য একই যুগে আবির্ভূত হয়ে যুগোত্তীর্ণ কাব্য রচনায় সফল হয়েছিলেন। কারণ সে যুগের বাঙালিরা কৈলাসবাসী দেবাদিদেব মহাদেবকে ধ্যানগম্ভীর কিম্বা রুদ্ররূপী সংহার মূর্তি কিম্বা ছাইভস্ম মাখা ভিখারি রূপে দেখতে চাননি; যা দেখতে চেয়েছিলেন আমাদের পানাপুকুরের ধারে চেনা কোনো এক পাড়াগাঁয়ের চাষী রূপে। ভদ্রবৃত্তি গ্রহণ করে সমাজে যিনি ভদ্রভাবে বাঁচার স্বপ্নে বিভোর হবেন। রুক্ষ-কঠিন মাটি চিরে ফলাবেন কৃষিফসল। দারিদ্র্যপীড়িত বাঙালির চিরকালীন আকাঙ্ক্ষা পেট ভরে দু-মুঠো অন্ন খাবেন। বাঙালির এই চির আকাঙ্ক্ষাকে মর্যাদা দিয়ে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির সুর কবি রামেশ্বরের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে- 'পেট ভরা ঢের করা দশ হাতে খাবে'। যা বহু পরে (১৭৫২) ভারতচন্দ্র রাজসভায় বসে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে এক দারিদ্র্যপীড়িত

খেয়াঘাটের মাঝি পাটনীর চির আকাঙ্ক্ষিত বর প্রার্থনায় সমগ্র বাঙালির প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির জগতে পূর্ণতা এনে দিয়েছিলেন – 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।'

যুগের নিরিখে মানবতার ধর্ম প্রতিষ্ঠায় উভয়েই বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। দেবতাদের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা সাধারণ নর-নারীদের চাওয়া-পাওয়া ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকেই মর্যাদা দিয়েছিলেন। রামেশ্বর 'শিবসঙ্কীর্তন' এবং ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনার মধ্য দিয়েই প্রথম আধুনিকতার সূত্রপাত করেছিলেন, যা উনিশ শতকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে কেন্দ্র করে বাংলা গদ্য সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার হাওয়া পুরোদমে বইতে শুরু করে।

রামেশ্বর ভট্টাচায অষ্টাদশ শতকের কবি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় রামেশ্বর ভট্টাচার্যের জীবনের ইতিহাস খুব বেশি জানা যায় না। 'শিবসঙ্কীর্তন' কিম্বা 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী'- যে কাব্যই পড়ি না কেন, তাতে তাঁর জন্ম সন এবং কাব্যরচনার সাল-তারিখ সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারি না। যদিও রামেশ্বর শিবসঙ্কীর্তন কাব্যের শেষে রচনাকালজ্ঞাপক হেঁয়ালির ঢঙে শ্লোক ব্যবহার করেছেন। প্রদত্ত শ্লোকের ওপর ভরসা করেই কাব্যের রচনাকাল নির্ণয় করতে হয়। অনেক সময় তাঁর জীবন সম্পর্কে আশ্রয়দাতা রামসিংহ এবং পুত্র যশোমন্ত সিংহের রাজত্বকালের সময়বর্গের ইতিহাস থেকে খুঁজে বের করতে হয়। কারণ এই যশোমন্ত সিংহ ঐতিহাসিক ব্যক্তি। আর রামেশ্বর বার বার যশোমন্ত সিংহের কথা উল্লেখ করেছেন এবং এই যশোমন্তের রাজত্বকালেই 'শিবসঙ্কীর্তন' কাব্য রচনা সমাপ্ত করেছিলেন। এ বিষয়ে যোগীলাল হালদারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব- "যশোমন্তসিংহ মেদিনীপুরের রাজা ও কর্ণগড় নিবাসী রাজা রামসিংহের পুত্র। এই যশোমন্তসিংহ ঢাকার ডেপুটি গভর্ণর সরফরাজ খানের প্রতিনিধি সৈয়দ ঘালিব আলির দেওয়ান হইয়া ঢাকায় গমন করেন। ইহা ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দের ঘটনা বলিয়া আমাদের মনে হয়। সৈয়দ ঘালিব আলির শাসন সময়ে তৈজসপত্রের মূল্য অত্যধিক হ্রাস পায়। এই সময় টাকায় আটমণ হিসেবে চাউল বিক্রীত হইত। নবাব শায়েস্তা খাঁ ঢাকা সহরের পশ্চিম দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঘোষণা করেন যে, যে নবাবের আমলে টাকায় আট মণ চাউল বিক্রীত হইবে তিনি উক্ত দ্বার উন্মুক্ত করিতে পারিবেন। সায়েস্তা খাঁর এই নির্দেশ অনুযায়ী

সৈয়দ ঘালিব আলি ঢাকা সহরের পশ্চিম দুয়ার উন্মুক্ত করেন। ইহার অল্পকাল পরে সরফরাজ খান আপন জামাতা মুরাদ আলি খানকে ঢাকার প্রতিনিধি করিয়া পাঠান। মুরাদ আলির সহিত মতদ্বৈত হওয়াতে যশোমন্ত সিংহ পদত্যাগ করিয়া স্বগৃহে চলিয়া আসেন (১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে)।"[রামেশ্বরের শিবসঙ্কীর্তন বা শিবায়ন, ক. বি. প্রকাশিত, ভূমিকা অংশ, প্রকাশকাল-২০১২, পৃষ্ঠা নং-৩]

আরো স্পষ্ট করে বলেছেন- (যোগীলাল হালদার) "১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে রাজা যশোমন্তসিংহ কম্মত্যাগ করিয়া 'ঢাকা' হইতে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার অল্পকাল পরেই রাজা রামসিংহ স্বর্গারোহণ করিলে তদীয় সুযোগ্য পুত্র যশোমন্ত সিংহ রাজ্যাধিকার করেন। রামেশ্বরও যশোমন্ত সিংহের সভাপণ্ডিতের কাজপ্রাপ্ত হইলেন। এই সময় তিনি শিবসঙ্কীর্তন রচনা আরম্ভ করেন বলিয়া আমাদের মনে হয়। কবি যখন যদুপুরে বাস করিতেন তখন তিনি সত্যনারায়ণের কথা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা সত্যনারায়ণের কথার মধ্যে কবি যে ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন তাহা হইতে জানিতে পারি। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে, ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দের পর ১০/১৫ বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৭৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রামেশ্বর শিবসঙ্কীর্তন পালা রচনা করেন।" (ঐ, পৃ-৫)

প্রাচীন কাব্যের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, কবিরা কাব্য রচনাকালে নিজের পরিচয়, কাব্য রচনাকাল, বংশপরিচয় ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতেন। মঙ্গলকাব্যে গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ-অংশে, অনুবাদ কাব্যে আত্মবিবরণী অংশে কবিরা নিজেদের পরিচয় লিপিবদ্ধ করতেন। কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য ও এদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। কাব্যে নিজের বংশপরিচয় সম্পর্কে দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন-

'ভট্টনারায়ণ মুনি সন্তান কেশর কণী

যতিচক্রবর্তী নারায়ণ।

তথ্যসুত কৃতকীর্তি গোবর্ধন চক্রবর্তী

তস্য সুত বিদিত লক্ষ্মণ।।

তথ্য সুত রামেশ্বর শম্ভুরাম সহোদর

সতী রূপবতীর নন্দন

সুমিত্রা পরমেশ্বরী পতিব্রতা দুই নারী

অযোধ্যানগর নিকেতন।।

পূরর্ববাস যদুপুরে হেমৎসিংহ ভাঙ্গে যারে

রাজা রামসিংহ কৈল প্রীত।

স্থাপিয়া কৌশিক তটে বরিয়া পুরাণ পাঠে

রচাইল মধুর সঙ্গীত।।'

কবি রামেশ্বরের এই আত্মপরিচয় থেকে যে বংশ পঞ্জিকা বা বংশ পরিচয় উঠে এসেছে তা হল রামেশ্বর ভট্টাচার্য ভট্টনারায়ণ বংশের কেশর কণীর কুলে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম লক্ষ্মণ চক্রবর্তী, মাতা হলেন রূপবতী। এক ভাই, তাঁর নাম শম্ভুনাথ। দুই পত্রী- সুমিত্রা ও পরমেশ্বরী। কবির পূর্বনিবাস ছিল যদুপুর গ্রামে। বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে হেমৎসিংহের সঙ্গে সংঘাত শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত কবি পরাস্ত হয়ে পালিয়ে আসেন কর্ণগড়ে। কর্ণগড়ের রাজা রামসিংহের আশ্রয় লাভ করেন এবং রাজা রাম সিংহ তাঁকে কাঁসাই নদীর তীরে অযোধ্যানগরে বসবাসের জায়গা দেন। কবির পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে রাজা রামসিংহ তাঁকে পুরাণ পাঠে নিযুক্ত করলেন এবং শিবমহিমার গীত লেখার অনুরোধ করেছিলেন। কবি তাঁর অনুরোধে 'শিবসঙ্কীর্তন' কাব্য লেখা শুরু করেছিলেন এবং শেষ করেছিলেন রাজা যশোমন্ত সিংহের আমলে।

১. 'যশোমন্ত সিংহ সিংহবাহিনীর দাস।

সে রাজসভায় হৈল সঙ্গীত প্রকাশ।।'

২. 'আরাধিয়া গৌরীহর রামেশ্বর মাগে বর

যশোমন্ত সিংহের কল্যাণ।'

যে রাজসভায় বসে শিবসঙ্কীর্তন কাব্য রচনা করেছিলেন কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন-

'শম্ভুরাম ভায়ার ভরণকর প্রভু

পদছায়া দিয় দয়া ছেড় নাঞী-কভু।।

গৌরী পার্বতী সরস্বতী স্বসাত্রয়।।

দুর্গাচরণাদি করি ভাগিনেয় ছয়।।

ভাগিনার পুত্র কৃষ্ণরাম বন্দ্যোঘটি।

এ সকলে সুকুশলে রাখিবে ধূর্জটি।।

সুমিত্রার শুভোদয় পরেশীর প্রিয়।

পরকালে প্রভু পদতলে স্থান দিও।।'

আগেই বলেছি কবির এক ভাই-এর কথা-যার নাম শম্ভু। কবির তিন ভগিনী হল গৌরী, পার্বতী ও সরস্বতী। ছয় ভাগনের মধ্যে একজনের নাম হল দুর্গাচরণ। এক ভাগনার পুত্রের নাম কৃষ্ণরাম বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কবি তাঁর দুই স্ত্রীর নাম উল্লেখ করলেও তাদের কোনো সন্তান-সন্ততির কথা উল্লেখ করেননি।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য কোন্ দেবতার উপাসক ছিলেন তা নিয়ে সমালোচকদের বিস্তর মতভেদ দেখা দিয়েছে। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে রামেশ্বর ভট্টাচার্যকে মহামায়ার উপাসক বলেছেন। অন্যদিকে লোকসংস্কৃতি গবেষক আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর 'বাংলা মঙ্গল-কাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে জানিয়েছেন- "যশোবন্তের রাজধানী কর্ণগড় মেদিনীপুর শহর হইতে তিন ক্রোশ দূরবর্তী। এখনও তাহার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, এইখানে যশোবন্ত প্রতিষ্ঠিত মহামায়ার মন্দির ছিল, তাহাতেই কৰি রামেশ্বর যোগাসনে বসিয়া শিবমন্ত্র জপ করিতেন।"

রামেশ্বর শক্তির উপাসক না শৈব ছিলেন এ নিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা বড়ই মুশকিল। আবার কাব্যের স্থানে স্থানে হরিভক্তির কথা আছে। অর্থাৎ তিনি যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তার প্রমাণ-

'হরিভক্তি দেয় রামেশ্বরে।।'

কিম্বা 'হরি ভক্তি সিদ্ধি হয় নাহি থাকে কোন ভয়

পরিচয় নানা উপাখ্যান।'

এমনকি নিজেকে বৈষ্ণব বলতে দ্বিধাও করেননি-'বিচারিয়া বলিল বৈষ্ণব রামেশ্বর।' আমার মনে হয় রামেশ্বর ধর্মসমন্বয়ের মধ্য দিয়ে মানবধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। এই উদার মানবধর্ম চৈতন্যভক্তি থেকে গ্রহণ করেছিলেন। 'চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্ত পরায়ণঃ - চৈতন্যের এই মহাবাণী জীবনে গ্রহণে করেছিলেন। ধর্মান্ধতা, অস্পৃশ্যতার যুগে দাঁড়িয়ে রামেশ্বর সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন-

'হরিভক্তি এমন চন্ডাল যদি হয়।

সবাকার বন্দনীয় তার পদদ্বয়।।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র শুদ্ধজাতি।

হরিভক্তি যদি হন বিলক্ষণ অতি।।'

আসলে রামেশ্বর হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলতা বা গোঁড়ামি দূরে সরিয়ে উদার মানবতার ধর্মাদর্শে দীক্ষিত হয়ে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করেছেন। 'সবর্বদেবের বর্ণনা' অংশে রামেশ্বর সব দেবতাদের স্মরণ করার মধ্য দিয়ে সামাজিক জীবনে সর্বধর্মমানবতাবোধের আদর্শকে আরো সুদৃঢ় করেছেন। উদ্দাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন-

'ত্রিভুবনে যেখানে যে আছে দেবদেবা।

সংক্ষেপে সবার পায় শত শত সেবা।।'

তখন মনে হয় কবি নির্ভীক, উদার মানববাদীর বড় পূজারি।

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের ছিল অগাধ পান্ডিত্য জ্ঞান। বিশেষ করে 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী' ও 'শিবসঙ্কীর্তন' কাব্য রচনায় তিনি ভাষা ও শব্দ ব্যবহারের যে বৈচিত্র্য প্রদর্শন করেছেন তা এককথায় অনবদ্য। পান্ডিত্য ধরা পড়েছে সমাজ-অভিজ্ঞতায়। 'শিবসঙ্কীর্তন' কাব্যে লোকায়ত জীবন দর্শন গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে প্রদর্শন করেছেন। আবার দেশের পুরাণ গ্রন্থের প্রতিও ছিল তাঁর অসীম ভক্তি-শ্রদ্ধা। ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পুরাণশাস্ত্র সম্পর্কেও যথেষ্ট ধারণা ছিল। শিবসঙ্কীর্তন কাব্যের স্থানে স্থানে তা গ্রহণ করেছেন।

শিবসঙ্কীর্তন কাব্যের কাহিনী ও চরিত্র নির্মাণে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। কাহিনি নির্মাণে অতিলৌকিক ও অলৌকিকতাকে যতটা সম্ভব পরিহার করবার চেষ্টা করেছেন। শিব, গৌরী, মেনকা, ভীম ও নারদ সবই যেন রক্তমাংসের জীবন্ত চরিত্র হয়ে উঠেছে।

৬.৮ : রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কবি প্রতিভা

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব হলেন রামেশ্বর ভট্টাচার্য। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান অতুলনীয়। অবক্ষয়ের যুগে জন্মগ্রহণ করেও ন্যায় ও নিষ্ঠার সঙ্গে যুগের যুগধর্মকে পেছনে ফেলে ভদ্র এবং রুচিশীল সংস্কৃতির পরিচয় দিয়েছেন। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র। বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির পাঠক মাত্রেই একথা জানেন যে ভারতচন্দ্র অবক্ষয়ের যুগে আলোর দিশারী, 'নূতন মঙ্গল' কাব্যের উদ্ভাবক।

'নূতন মঙ্গল আসে ভারত সরস ভাষে

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায়।'

নতুনত্বের সুর কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে নবমানবতা বোধের ইঙ্গিতে। দারিদ্র পীড়িত শ্রমজীবী মানুষের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি ও ভালোবাসা হল নবমানবতা বোধের মূলমন্ত্র অবক্ষয় যুগে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরী পাটনী, হরিহোড়ের মতো সৎ-নির্লোভ চরিত্রের অনুসন্ধান করেছেন। আমি বলি এই সময়ে (অবক্ষয় যুগে) কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য নীরবে নিভৃতে গ্রামের শান্ত-স্নিগ্ধ-সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে 'ভবভাব্য ভদ্রকাব্য' শিবসঙ্কীর্তন

পালা রচনা করেছিলেন। সে যুগের সমাজে কৃষিকাজ সম্মানজনক বৃত্তি বলে গণ্য হতো। উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ থেকে অন্ত্যজ চণ্ডাল সকল সম্প্রদায়ের মানুষ কৃষিকাজ জানতেন। এই সত্যকে সামনে রেখেই ভদ্রসমাজে নতুন ভাবে বাঁচার স্বপ্নে গাজা-ভাঙা নেশাখোর ভিক্ষুক শিবের হাতে লাঙ্গল ধরিয়ে দিলেন-

'হৈল হালপ্রবাহ শিবের শুভক্ষণে'।

কৃষিভিত্তিক সমাজ কাঠামোর স্বপ্নে কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য পুরাতন অবক্ষয় যুগের অবসান এবং আসন্ন সম্ভবনাময় নতুন যুগের সূচনা করতে চেয়েছিলেন। এই জন্যেই কাব্যের বহুস্থানে সগর্বে ঘোষণা করেছেন-

'ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর।'

স্থূল, কুরুচিকর সংস্কৃতির দরুণ তখন পুরাতন ঐতিহ্যবাহী সাহিত্য-সংস্কৃতি (মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, বৈষ্ণব পদাবলী) রচনার পথ রুদ্ধ হয়ে এসেছে। সমাজ-সভ্যতায় প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার প্রসার ঘটেনি, অথচ সে যুগেই রামেশ্বর ভদ্র-রুচিশীল বাঙালি পাঠক-শ্রোতার মনোজগতের কাব্য "শিবসঙ্কীর্তন" রচনা করেছিলেন-যা আজকের দিনে ভাবতে অবাক লাগে। ভারতচন্দ্রের মতো যুগোর্তীর্ণ কবি, মানবতাবোধের উদ্ভাবক। আর 'ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর' এতো মানবতা বোধের মূলসুর।

রামেশ্বর ছিলেন মানব প্রেমিক কবি। চৈতন্য প্রবর্তিত মানবধর্মের দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাই পাপ পঙ্কিল অবক্ষয় যুগে দাঁড়িয়ে মানবতার ধর্ম প্রতিষ্ঠায় সামিল হয়েছিলেন। জাতির প্রতি, সমাজের মানুষের প্রতি ভালোবাসার মধ্য দিয়ে তিনি সমাজে নব মানবতার ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

'ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র শুদ্ধজাতি।

হরিভক্ত যদি হন বিলক্ষণ অতি।।'

এমনকি জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার উর্ধেব উঠে মানবতার ধর্মকে সমাজের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঘোষণা করেছিলেন-

'শৈব শাক্ত বৈষ্ণব সভার সেব্য শিব।

বিশেষতঃ বন্দিবেন বৈষ্ণবের জীব।।'

অষ্টাদশ শতকের ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে বাঙালি নর-নারীদের পারস্পরিক মিলন সংহতি ও ধর্ম সমন্বয়ের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তব রূপ দেবার প্রচেষ্টায় যারা আজীবন ব্রতী-ছিলেন-তাঁদের মধ্যে অন্নদামঙ্গলের কবি ভারতচন্দ্র, শাক্তপদাবলীর রূপকার রামপ্রসাদ ও শিবায়নের কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের নাম সর্বাগ্রে করতে হয়। আমি বলি যে যুগে (অষ্টাদশ শতক) আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল--সে যুগেই ভারতচন্দ্র ঈশ্বরী পাটনীর মতো সৎ নির্লোভ চরিত্রকে ('আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে') অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে মানবতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, যুগসন্ধিক্ষণের টালমাটাল সময়ে ধীর, স্থির চিত্তে রামপ্রসাদ ধর্মসমন্বয়ের সঙ্গীত ('কালী হলি মা রাসবিহারী / নটবর বেশে বৃন্দাবনে।') উচ্চারণ এর মধ্য দিয়ে বাঙালিদের নতুনভাবে বাঁচার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন, আর সে যুগেই ব্রাহ্মণ কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, গোঁড়ামি, স্থূল রুচি ('ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র শুদ্ধজাতি') দূরে সরিয়ে আপামর ভদ্র-রুচিশীল বাঙালি তথা দেশবাসীকে 'ভদ্রকাব্য' উপহার দিয়েছিলেন--যা আজকের দিনে সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে ইতিহাস বলেই মনে হয়। এরা বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। একাধারে শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, সঙ্গীতজ্ঞ ও সমাজ-সংস্কারক। প্রগতিশীল সংস্কৃতির জন্মদাতা। আজকে এদের একাসনে বসিয়েই শ্রদ্ধার সঙ্গে আমাদের স্মরণ করতে হয়।

আসলে কবি রামেশ্বর হলেন অত্যন্ত বাস্তববাদী মানুষ বাস্তব মাটির সংসারে দাঁড়িয়ে চরিত্রের সন্ধান করেছেন। দেবাদিদেব মহাদেবকে হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন ভিক্ষার ঝুলি। শিব গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা মেগে যে চাল-পয়সা আদায় করেন তাতেও তাঁর সংসার নির্বাহ করা সম্ভব হয়নি। তাই সংসারে স্বামী অশান্তি লেগেই ছিল। 'হর-গৌরীর কলহ' অংশে তারাই প্রতিফলন দেখা যায়।

শিব যখন রেগে বলেন-

'ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করী খাব নাই ভাত।

যাব নাই ভিক্ষায় যেকরে জগন্নাথ ।।'

তখন আমাদের কাছে আপনা-আপনি এসে ধরা দেয় অভাবের সংসারের শিবকে নিয়ে রঙ্গ-রসিকতা করেছেন। পাড়ার ছেলেদের দিয়ে ছাইভস্ম, ধূলাবালি ছুঁড়ে হাসি-ঠাট্টা, ও ব্যঙ্গ-বিদ্রপে মজেছিলেন

'কেহ বলে এ এল শিব বুড়া কাপ।

কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ।।'

আর রামেশ্বর ভট্টাচার্য ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ বা রসিকতা না করে ভিক্ষুক শিবের হাতে হাল-জুয়াল ধরিয়ে দিয়েছেন। আর শিবও সে যুগের হাওয়া, সংশয়, দোলাচল কাটিয়ে জীবিকার ক্ষেত্র পরিবর্তন করে সমাজে বাঁচার আশ্বাসে ভদ্রবৃত্তি (চাষবাস) গ্রহণ করেছেন। স্ত্রীর পরামর্শ মেনেই মাঠে লাঙ্গল নিয়ে চাষবাসের কাজে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন। শিবের যোগ্য সহধর্মিণী গৌরী। সমাজে- ভদ্রভাবে স্বামীকে বেঁচে থাকায় পরামর্শ দিয়েছেন। চাষের কাজে ভীমকে নামিয়েছেন। আসলে গৌরী হয়ে উঠেছেন আমাদের ঘরের গৃহিণী।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁর 'শিবসঙ্কীর্তন' বা 'শিবায়ন' কাব্যের কাহিনি ও ঘটনা লোকঐতিহ্যের ওপর নির্ভর করে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং লোকায়ত জীবনের ছায়া যে শিবায়ন কাব্যে থাকবে- এটাই স্বাভাবিক। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ, বার-ব্রত ও কৃষিকে কেন্দ্র করে সেকালের সমাজে জনমানসে যে সংস্কার-বিশ্বাস প্রচলিত ছিল- কবি তা ব্যাপক সমাজ অভিজ্ঞতার নিরিখে প্রকাশ করেছেন। কয়েকটা উদাহরণ দিলেই তার প্রমাণ মেলে।

ক. 'শিবসঙ্কীর্তন' কাব্যের 'হিমালয়ে গৌরীর জন্মলাভ' (৩য় পালা) অংশে হিমালয়ের গৃহে গৌরীর জন্ম হওয়ার সাথে সাথে সেকালের নর-নারীরা অজস্র লোকসংস্কার পালন করেছেন।

'দেখিয়া কন্যারমূর্তি হিমালয় কৃতবীর্তি

আপনে জানিয়া করে দান।

লোচনে প্রেমের ধারা কহে কেহ মোর পারা

ত্রিভুবনে নাহি ভাগ্যবান ।|

লইয়া বান্ধব জনে বাদ্যগীত কোলাহলে

করিল কৌলিক মহোৎসব।'

একালের সমাজেও সন্তান-সন্ততির জন্মকে ঘিরে অজস্র সংস্কার চোখে পড়ে।

খ. কাব্যের 'গৌরীর অধিবাস'-এ বিবাহ-সংস্কার রীতির নানান লোকাচারের কথা উঠে এসেছে। যেমন-

'মহীগন্ধ শিলা ধান্য দুর্বা পুষ্প ফল।

ঘৃত দধি দুগ্ধ দিল সিন্দুর কজ্জল।।

রোচণা সিদ্ধার্থ স্বর্ণ রূপা তাম্র আদি।

চামর দর্পণ দীপ দিল যথাবিধি।।

বন্দিল প্রশস্ত-পাত্র সূত্র বান্ধি করে।

ষোড়শ মাতৃকা পূজা করে তারপরে ||'

গ. কৃষিকে কেন্দ্র করে জনমানসে যেসব সংস্কারে প্রচলিত ছিল- তার বিস্তৃত পরিচয় কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য কাব্য মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন-

'বৃষ কান্দে বাসব বরিষে নাই বাড়া।

তেঞি হাভাতিয়া চাষী হয় লক্ষ্মীছাড়া।।

হাল কামাঞের দিন হর দেন বল্যা।

গাছি মারা হুড়া গাছি পাড়ে রাখে তুল্যা।।'

কাব্যে ‘শাঁখা পরার জন্য গৌরীর সজ্জা’ এবং ‘শঙ্খ পরিধান আরম্ভ’ অংশেও গৌরী হাতে শাঁখা পরার সময় কবি রামেশ্বর যেসব সংস্কারের কথা উল্লেখ করেছেন তা তো আপামর বাঙালি নারীর সংস্কার বলেই মনে হয়।

মধ্যযুগে ভারতচন্দ্রের মতো রামেশ্বর ভট্টাচার্যকে ছান্দসিক কবি বলে হয়তো অভিহিত করা যাবে না। কিন্তু পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ রচনায় কাব্যের কোনো কোনো স্থানে অসাধারণ কারুকার্য দেখিয়েছেন। আর এই কারুকার্য মণ্ডিত হয়েছে তাঁর ভাষা ব্যবহার ও সুরের বৈচিত্র্যে। এখন ‘হরগৌরীর রঙ্গ’ অংশের কিছুটা উদ্ধৃত করে এর সত্যতা যাচাই করব।

‘সুন্দরী সুধান শিবে সত্য বল শূলী।

কারে মাইরা ধন হইরা পুরাইলে ঝুলি।।

গল্যা ভইরা মালা যার কপাল জুড়্যা ফোটা।

দিনে হও ব্রহ্মচারী রাতে গলাকাটা ।।

ভাল জান ভারভুর ভুলাইতে লোক।

ভাব নাই ভজনে কটিকে বান্ধা থোপ।

জ্ঞানদাতা গদাধর গায় ত্রিভুবনে।

গরিষ্ঠ গৌরব গেল গৌরীর কারণে ।।

পরদারে পরধনে প্রবৃত্ত যে জন।

তার পরিত্রাণ নাই তোমার বচন।।’

অনুপ্রাস বহুল হলেও, সুরের মাধুর্যে আর শব্দের বৈচিত্রে ভাষা মধুর ও প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে। এই ভাবেই সমগ্রকাব্যে ভাব অত্যন্ত প্রাঞ্জল এবং ছন্দবৈচিত্যময় হয়ে উঠেছে পয়ারের ঝংকারে আর ত্রিপদী ছন্দের সুর-লয়ে।

মন্তব্য

সুতরাং রামেশ্বর ভট্টাচার্য মধ্যযুগের একজন বিখ্যাত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত কবি। অসাধারণ পাণ্ডিত্যে এবং সমাজ-অভিজ্ঞতার নিরিখে তিনি হর-গৌরীর আখ্যানকে ভাবে-ভাষায় কাব্যরূপ দিয়েছেন যা কালের গর্ভে পাঠকদের হৃদয়ে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

৬.৯ : অনুশীলনী

১। শিবায়ন কাব্যে শিবের উৎস সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। শিবায়ন কাব্যের উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩। শিবায়ন কাব্যের বৈশিষ্ট্য গুলি উল্লেখ করুন।

৪। শিবায়ন কাব্যের কাহিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

৫। বাংলা অন্যান্য মঙ্গল কাব্য গুলির সঙ্গে শিবায়ন কাব্যের পার্থক্য কোথায়?- আলোচনা করুন।

৬। শিবায়ন কাব্যের বিভিন্ন কবিদের সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৭। শিবায়ন কাব্য ধারার শ্রেষ্ঠ কবি কে? তাঁর পরিচয় ও কবি প্রতিভার পরিচয় দিন।

৬.১০ : গ্রন্থপঞ্জি

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস- সুকুমার সেন

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত- ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত- ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৪। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস- ক্ষেত্র গুপ্ত

৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা- শ্রী ভূদেব চৌধুরী

৬। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস- ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য

৭। বাংলা সাহিত্য পরিচয়- ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়

৮। শিবসঙ্কীর্তন বা শিবায়ন-ড. দয়াময় মণ্ডল

একক ৭ । রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবসঙ্কীর্তন বা শিবায়ন কাব্য

বিন্যাসক্রম

৭.১ : শিব সংকীর্তন বা শিবায়ন কাব্যের রচনাকাল

৭.২ : শিব সংকীর্তন বা শিবায়ন কাব্যের কাহিনী

৭.৩ : শিব সংকীর্তন বা শিবায়ন কাব্যের সমাজচিত্র

৭.৪ : শিব সংকীর্তন বা শিবায়ন কাব্যে পৌরাণিক ও লৌকিক প্রভাব

৭.৫ : রামেশ্বরের শিব সংকীর্তন কাব্যের চরিত্র-চিত্রন

৭.৬ : রামেশ্বরের শিব সংকীর্তন কাব্যে হাস্যরস

৭.৭ : অনুশীলনী

৭.৮ : গ্রন্থপঞ্জি

৭.১: শিব সংকীর্তন বা শিবায়ন কাব্যের রচনাকাল

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ রচনা হল শিবসঙ্কীর্তন বা শিবায়ন কাব্য। এই কাব্যটি ছাড়াও সত্যনারায়ণের পাঁচালী লিখেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যাঁরা কাব্য রচনা করেছিলেন- তাঁদের অধিকাংশ কবিই হেঁয়ালিতে কাব্য রচনাকাল জ্ঞাপক শ্লোক ব্যবহার করেছেন। আসলে রামেশ্বর ভট্টাচার্য ছিলেন শিক্ষিত-ভদ্র রুচিসম্পন্ন এবং সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় অভিজ্ঞ পন্ডিত। গ্রন্থের শেষে 'গীতসমাপণ' অংশে হেঁয়ালির ঢঙে লেখা একটি কালজ্ঞাপক শ্লোক থেকে তাঁর গ্রন্থের রচনাকাল নির্ণয় করা সম্ভব-

'শকে হৈল্য চন্দ্রকলা রাম কৈল্য কোলে।

বাম হৈল বিধিকান্ত পড়িল অনলে।।

সেই কালে শিবের সঙ্গীত হৈল্য সারা।

অবনীতে আল্য যেন অমৃতের ধারা।।'

অর্থাৎ ১৬৩২ শকাব্দ (১৭১০-১১) হল গ্রন্থের রচনাকাল। এই অভিমত প্রকাশ করেন আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়। আবার আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের এই অভিমত অনেকে মেনে নেয় না। সুখময় মুখোপাধ্যায় লিখেছেন- "শ্লোকটির দ্বিতীয় ছত্রে 'অনল' শব্দের আঙ্কিক অর্থকে আচার্য রায় উপেক্ষা করেছেন। সুতরাং, তাঁর এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যায় না। (মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম)

ক্ষেত্রগুপ্ত রামেশ্বরের শিবায়ন কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে বলেছেন- "অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি শিবায়ন বা শিবসঙ্কীর্তন লিখেছেন।" ('বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস')

সমাজ চিত্র

সাহিত্য হল সমাজজীবনের দর্পণ। যে কালে দাঁড়িয়ে সাহিত্যিক তাঁর সৃষ্টিশীল জগতে বা সাহিত্যের আঙিনায় যা সৃষ্টি করেন-তাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে কাল ও সমাজ আপনা-আপনি এসে ধরা দেয়। এটাই হল সৃষ্টির নিয়ম। দেশ-কাল-সমাজকে উপেক্ষা করে স্রষ্টা কখনও সাহিত্যের জগতে বিচরণ করতে পারেন না। তাই প্রাচীন ও মধ্যযুগে রচিত চর্যাপদে, মঙ্গলকাব্যে, অনুবাদ সাহিত্যে, পদাবলী সাহিত্যে, জীবনীকাব্যে, আখ্যানকাব্যে ও গাথা-গীতিকায় তৎকালীন সমাজ জীবনের বাস্তব চিত্র উঠে এসেছে। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবসঙ্কীর্তন'এর ব্যতিক্রম নয়। কেননা রামেশ্বর হলেন সচেতনশীল সমাজ অভিজ্ঞ কবি। গ্রামীণ সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা তার দীর্ঘদিনের। সমাজে বাস করে যা তিনি নিজের চোখে দেখেছেন 'শিবসঙ্কীর্তন' বা 'শিবায়ন' কাব্যে তারই বাস্তব রূপ দিয়েছেন। পুরাণের কাহিনী ও ঘটনা অপেক্ষা লৌকিক ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করেই

শিবমাহাত্ম্য কথা পরিবেশন করেছেন। কৈলাসবাসী শিবের গার্হস্থ্যজীবন কাহিনি বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে তৎকালীন পরিপার্শ্বিক সমাজজীবনের বহু কথা উঠে এসেছে। যেমন-

ক. জীবন-জীবিকার (বৃত্তি) কথা

খ. খাদ্য

গ. পোষাক-পরিচ্ছদ ও অলংকার

ঘ. আসবাবপত্র

ঙ. ধর্মকর্ম ও দেবদেবী

৬. পারিবারিক ও সামাজিক জীবনাদর্শ

ছ. আমোদপ্রমোদ-খেলাধুলা

জ. সামাজিক সংস্কার-বিশ্বাস ইত্যাদি।

ক. জীবন-জীবিকার (বৃত্তি) কথা : কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য 'শিবসঙ্কীর্তন' বা শিবায়ন কাব্যে অষ্টাদশ শতকের নিম্নমধ্যবিত্ত ও অন্ত্যজ সমাজের সামাজিক জীবন ভাবনার পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। সেকালের মানুষের জীবন-জীবিকার কথা তুলে ধরেছেন এই ভাবে-

১. ব্যাধ জাতি : এরা অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মানুষ। বনে-জঙ্গলে পশু-পাখি শিকার করে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতেন। তার প্রমান মেলে কাব্যের 'ব্যাধের মৃগয়ায়' অংশে

'একদিন সেই ব্যাধ প্রবেশিয়া বনে।

বধিল বিস্তর পশু বিস্তর সন্ধানে ।।'

২. শাঁখারি : এরা গ্রামে গ্রামে ঘরের কুলবধূদের হাতে শাঁখা পরিয়ে অর্থ উপার্জন করে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করেন।

'মাধব দাবুড়ি দেয় থাক মাগী ঠেঠা।

এ হাতে পরাবে শঙ্খ শাঁখারীর বেটা।।'

৩. ব্রাহ্মণ : সেকালের সমাজে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় উচ্চবর্ণের জাতি হিসেবে পরিগনিত। আজও এরা সমাজে উচ্চবর্ণের মানুষ বলে বিবেচিত হন। এদের আদি জাত-বৃত্তি হল পূজো অর্চনা করা। এদের সমাজের পুরুষরা কেউ কেউ দেবস্থানের পুরোহিত হতেন-

'পুরোহিত-পুরঃসর পূজা সজ্জা লয়্যা।'

ব্রাহ্মণ ছাড়াও বৈষ্ণব, চণ্ডাল প্রভৃতি জাতির কথা উল্লেখ আছে।

১. 'পালা সাঙ্গ হৈল আশীর্বাদ অতঃপর ।

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দয়া করহ শঙ্কর।।'

২. 'অভক্ত ব্রাহ্মণ সে চণ্ডাল হৈতে দীন।

হরিভক্ত চণ্ডালের সে দ্বিজ অধীন।।'

৩. 'হরিভক্তি এমন চণ্ডাল যদি হয়।

সবাকার বন্দনীয় তার পদদ্বয়।।'

সেকালে এক শ্রেণির মানুষ ছন্নছাড়া, ভবঘুরে এবং ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতেন। শিবের ভিক্ষাবৃত্তির মধ্য দিয়েই তা প্রমান মেলে-

'ভ্রুকুটি করিয়া ভাল ভাল ভূমিতলে।

ভবন ভবন ভিক্ষা দেহি বলে।।'

এছাড়াও কৃষকরা চাষবাস করে জীবন-জীবিকা চালাতেন। শিবকে ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে চাষবাস করে জীবিকা নির্বাহের পরামর্শ দিয়েছেন সহধর্মিণী গৌরী-

'চষ ত্রিলোচন চাষ চষ ত্রিলোচন।

নহে দাসদাসী আদি ছাড় পরিজন।।'

খ. খাদ্য : 'শিবসঙ্কীর্তন' কাব্যে রামেশ্বর ভট্টাচার্য অজস্র খাদ্যদ্রব্যের কথা উল্লেখ করেছেন। বাঙালির প্রিয় খাদ্য ভাত ও নানা ধরণের তরিতরকারির কথা আছে।

১. 'আঁঠু ঢ্যাকা বস্ত্র দিবা পেট ভরা ভাত।

প্রীত কৈর যেমন জানকী রঘুনাথ।।'

২. 'জামাই ভাতের দিন ভাত দিতেছিনু।'

৩. 'লম্বোদর বলে শুন নগেন্দ্রের ঝি।

সূপ হৈল সাঙ্গ আন আর আছে কি।

দড়বড় দেবী আন্যা দিল ভাজা দশ।

খাইতে খাইতে গিরিশ গৌরীর গান যশ।।'

৪. 'সুক্তা খায়্যা ভোক্তা চায়্য হস্ত দিল শাকে।

অন্নপূর্ণা অন্ন আন রুদ্রমূর্তি ডাকে।।'

আর আছে নানা ধরণের শাক সব্জি, ফল-মূল খাওয়ার প্রসঙ্গ_-

'চাষা দিল শশা ফুটি আলু শাক কচু।

করলা কুমড়া কচি কাচকলা কিছু।।'

সেকালের বাঙালিরা পেট ভরে দই, দুধ, ঘোল, মন্ডা, মিঠাই প্রভৃতি খাবার খেতো। এছাড়াও ঘি, মধু ছিল প্রিয় খাদ্য। উৎসব-অনুষ্ঠানে ক্ষীর, পিঠে, পায়েস ভোজন করতেন। 'শিবসঙ্কীর্তন' কাব্যে এইসব খাদ্যদ্রব্যের কথা উঠে এসেছে-

'মাল্য মলয়জ দিয়া মুখে দেই মিঠা।

দুগ্ধ দধি ঘৃত মধু ক্ষীর খণ্ড পিঠা।।'

এখনও বাঙালিরা পেট ভরে মণ্ডা, মিঠাই, পায়েস, ক্ষীর ও পিঠে প্রভৃতি খাবার খায়। সেকালে মেয়েরা পান, সুপারি ও কর্পূর খেতো। পানের সঙ্গে খেতো লবঙ্গ ও এলাচির দানা।

১. 'কত নারী গলে ধরি মরি মরি বল্যা।

কপূর তাম্বুল তার মুখে দিল তুল্যা।।'

২. 'কর্পুর তাম্বুল খাল্য এলাচি লবঙ্গ।

বিধুমুখী বিম্বাধরে বাজাইল রঙ্গ।।'

সেযুগে ভবঘুরে, ছন্নছাড়া, সংসার উদাসী সাধু-সন্ন্যাসীর দল গাঁজা, ভাঙ, আফিং প্রভৃতি নেশা জাতীয় খাদ্যদ্রব্য খেতেন। 'শিবসঙ্কীতর্ন' কাব্যে তার প্রমাণ মেলে-

১. 'গাঁজা-ঝাড়া তিতা তাজা ভিজাইয়া তাকে।

মহিষমর্দিনী বাট্যা দিল মুহূর্তেকে।।'

২. 'দার-চিনি চন্দনি চন্দন চাঞিচুয়া।

মরিচ আফিং হিঙ্গ হরীতকী গুয়া।।'

গ. পোষাক-পরিচ্ছদ ও অলংকার : রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁর শিবায়ন কাব্যে দরিদ্র শিবের গাহস্থ্য জীবনের কাহিনি যে ভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে সেকালের দারিদ্যপীড়িত বাঙালির পোষাক-আসাক বা বেশভূষা যে অতিসাধারণ মানের সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। শিব ভিখারি। গায়ে মাখেন ছাইভস্ম, কপালে লেপেন চন্দনের ফোঁটা। বাঘছাল পরে ঘরে ঘরে ভিক্ষা মেগে বেড়ান।

'ব্যাঘ্রছাল-বসন বেষ্টিত কটিদেশ।

হাতে মাটা মাথে জটা যোগিনীর বেশ।।

স্বামীর সহিত সঙ্গ করা নিরন্তর

চিতা ভস্ম চন্দনে চর্চিত কলেবর।।'

আসলে সেকালে ছন্নছাড়া, সংসার উদাসী যোগী পুরুষরা বা ভিখারি দল এই ধরণের বেশভূষায় সজ্জিত হতেন। সেকালে পুরুষরা ধুতি, লুঙ্গি, গামছা পরে ঘুরে বেড়াতো। শীতবস্ত্র হিসেবে চাদর, গামছা পরতো। আর মেয়েরা সুতির শাড়ি, শিলিক শাড়ি ও পাটের বস্ত্র পরিধান করত। তবে বিয়ের সময় মেয়েরা সুন্দর বেশভূষার ও সাজ-পোষাকে সজ্জিত হতো। 'গৌরীর অধিবা'-এ তার প্রমাণ মেলে-

'সুন্দরী সুন্দর বস্ত্র অলঙ্কার পরা।

পাবর্বতী পুরট-পীঠে আরোহণ হল্যা।।'

সুন্দর সুন্দর পোষাকের সঙ্গে মেয়েরা সোনা-রূপার অলংকার পরতো। শাঁখারির কাছে গৌরী যখন হতে শাঁখা পরতে গেছেন -তখনও সুন্দর পোষাকের অঙ্গে সোনা-রূপা অলংকার পরিধান করেছেন-

'শঙ্করীকে কিঙ্করী বসায়্যা বরাসনে।

বিশেষ করিলা বেশ পরম যতনে ।।

অঙ্গরাগে এমন উদ্ভূত হৈল ছবি।

পারে নাই তুল্য হৈতে প্রভাতের রবি।।

সুন্দরী সুন্দর বস্ত্র অলঙ্কার পরা।

শাঁখারী সমীপে আল্য ঝলমল করা।।'

উপরোক্ত বর্ণনার মধ্যে আমাদের ঘরের কথা চেনা কোন বাঙালি কুলবধূ হাঁটু ঢাকা কাপড় পড়ে সারা অঙ্গে সোনা রূপার অলঙ্কার জড়িয়ে যেন শাঁখারী কাছে দুহাতে মঙ্গল শাঁখা পরতে ছুটে এসেছেন।

'সুন্দরী সুন্দর বস্ত্র অলংকার পরা।

শাঁখারী সমীপে আল্য ঝলমল করা।।'

ঘ. আসবাবপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র : রামেশ্বরের শিবায়ন কাব্যের বাঙ্গালীদের ব্যবহৃত অজস্র আসবাবপত্র ও অস্ত্রশস্ত্রের কথা উল্লেখ আছে ভাত রান্নার পাত্র (হাঁড়ি), ঘটি, থালা (ভোজনের) বর-কন্যা অধিবাসের থালা, মাটির পাথেরা খপরা (ভিক্ষার পাত্র) সরা, ভাণ্ড ইত্যাদি লোকতৈজস ও আসবাবপত্রের বিবরণ আছে।

১. 'তিনজনে একেবারে বার মুখে খায়।

এই দিতে এই নাই হাড়ি পানে চায়।।'

২. 'উৎকট চর্ব্বণে ফিরা ফুরাইল ওদন।

এক কালে শূন্য থালে ডাকে তিন জন।।'

৩. 'নন্দী আস্যা বস্যা গেল শঙ্করের থালে।

সমগ্র সামগ্রী দেবী দিলা এককালে।।'

আর উল্লেখ আছে বসার পিঁড়ি, বর কন্যা বসার বরাসন, বসার মাচিল্যা, ঘুমোবার জন্য খাটিয়া ও পালঙ্কের কথা-

১. 'পূর্ব্ব দুঃখে পার্বতী পূরিল পূর্ণকাম।

উচ্চ পিঁড়া হৈতে বুড়্যা পড়্যা বলে রাম।।'

২. 'অচল আচান্ত হইয়া বৈসে বরাসনে।

কৃতাঞ্জলি করে নতি কৃষ্ণের চরণে।।'

কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় উঠে এসেছে কৃষিকাজের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম-এর কথা। অর্থাৎ চাষবাসের জন্য হাল, জুয়াল, ফলা, পাসী প্রভৃতি কৃষিযন্ত্রপাতি সেকালে কৃষকরা ব্যবহার করতেন।

১. 'বিশাই বুঝিয়া কার্য্য কৈল সাবধান।

লাঙ্গল-জোয়াল-ফাল করিল নির্ম্মাণ।

হলধর পাশী মারা পুরাইল ফাল।

আড় চাল লাঙ্গলের যুড়্যা রাখে আল।।'

শিবায়ন কাব্যে চোখে পড়ে অজস্র অস্ত্রশস্ত্রের কথা যেমন - কাটারি, টাঙ্গি, ত্রিশূল, শর, ধনু, কুঠার ইত্যাদি।

১. 'কুঠারে কাটিতে কর করিল উদ্যাম'।

২. 'কেহমারে শেল শূল কুঠার তোমর।

ডাবুষ পট্টিশ টাঙ্গি ছত্রিশ আতর।।'

ঙ. ধর্মকর্ম ও দেবদেবী : রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ন কাব্যে সেকালের মানুষের ধর্মচর্চা ও দেবদেবীর পুজো অর্চনার বিস্তৃত পরিচয় রয়েছে। গ্রন্থের শুরুতেই গণেশ বন্দনা রয়েছে। এর পরেই রয়েছে শিব, চন্ডী নারায়ণী, ও চৈতন্যের বন্দনা গান। লোকদেবী ষষ্ঠী ও মনসার বন্দনা গান গেয়েছেন-

'ষোড়শ মাতৃকা ষড়ানন যষ্ঠী দেবী।

মনসা দেবীরে দণ্ডবৎ হয়্যা সেবি।।'

রাধা-কৃষ্ণকে উপাস্য দেবতা হিসেবে সেকেলের মানুষ পূজো করতো। সেকালে বাঙালির ঘরে ঘরে শারদীয়া উৎসবের ধুম পড়ে যেতো। নর-নারীরা নাচে গানে-মহাধূমধামে পার্বতীর পুজো দিতেন। 'হিমালয়ের শারদীয়া পূজা' অংশে তার প্রমাণ আছে-

'শরতে শারদা পূজা সবাকার ঘরে।

নৃত্য গীত আনন্দিত সকল নগরে।।'

যাগ-যজ্ঞ, জপ-তপ, চন্ডীপাঠ, পাঁচালি গান, নাচ প্রভৃতি মণ্ডপে মণ্ডপে পরিবেশিত হত। কোথাও কোথাও পুজোর সময় ছাগ, মেষ, মহিষ প্রভৃতি পশুবলি দেওয়া হত।

'সবর্ব গৃহে সবের্ব দেখে গীত বাদ্য নাট।

যত ঋষি সবে আসি করে চন্ডীপাঠ।।

ষোড়শোপচারে পূজা পরিপাটা করি।

নানা পুষ্প নানা ফল বিল্বদল ভরি।

নানা জাতি পিষ্টক লড্ডুক নানাবিধ।

পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্নঘৃত মধু দধি।

ছাগ মেঘ মহিষ অশেষ বলিদান।

জপ পূজা যজ্ঞ হৈল অশেষ বিধান।।'

রামেশ্বর ভট্টাচার্য সর্বধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। সকলের ধর্মচর্চা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পর্কে তার উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে 'শিব-মহিমা কীর্তন'- অংশে

'শৈব শাক্ত বৈষ্ণব সবার সেব্য শিব।

গঙ্গাধরে ঘৃণা করে গুরুদ্রোহী জীব।।'

চ. পারিবারিক ও সামাজিক জীবনাদর্শ : শিবসঙ্কীর্তন কাব্যে হর গৌরী পারিবারিক জীবনের নিখুঁত চিত্র ফুটে উঠেছে। অভাবের সংসার। তার উপর স্বামী গাঁজা-ভাঙ-নেশাখোর বাউন্ডুলে। ছাইভস্ম মেখে নন্দী-ভিঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ান। ভিক্ষাবৃত্তি-ই হল বাঁচার সম্বল-

'ভ্রূকুটি করিয়া ভাল ভাল ভূমিতলে।

ভবন ভবন ভিক্ষা দেহি দেহি বলে।।'

শিব ঝুলি ভর্তি চাল-ডাল এনে স্ত্রীর হাতে দেন। গৌরী ছেলেমেয়েদের খাওয়ার জন্য রান্নায় বসেন। রান্নার শেষে খাবার পরিবেশন করেছেন। হিঁসেল ঘরে সে এক দারুন দৃশ্য-

'তিন জনে একেবারে বার মুখে খায়।

এই দিতে এই নাই হাড়ি পানে চায়।।'

কখনও বা 'উৎকট চবর্বণে ফিরা ফুরাইল ওজন।

এক কালে শূন্য থালে ডাকে তিনজন।।'

তবুও গৌরী হিসেল ঘরে খাবার পরিবেশন করতে গিয়ে ধৈর্য্য হারাননি। ক্ষোভে, ঘণায় হিঁসেল ঘরে খাবার ফেলে পালিয়ে যাননি। সহধর্মিণী প্রশংসায় পঞ্চমুখ স্বামী শিব-

'প্রেয়সীকে প্রশংসিয়া বলে বিশ্বনাথ।

সত্য সতী তুমি অতি ধন্য দুটী হাত।।

অল্প রান্ধ্যা এত অন্ন কোথা হতে আন।

কেমন হস্তের গুণ কিবা মন্ত্রজান।।'

এতো দাম্পত্য প্রেমের অমলিন ছবি। যার রূপকার হলেন ব্রাহ্মণ কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য।

মানবজীবন বড়ই বিচিত্র। সুখ-দুঃখের সংসারে জীবনের সব রং বদলে যায়। অভাবের সংসারে দাম্পত্য প্রেমের অমলিন ছবিও বদলে গেছে। ভিক্ষার চাল-পয়সায় যে আর সংসার চলে না। কিন্তু শিব সে কথায় কান দিতে নারাজ। তাই গৌরীকে রেগে বলে উঠলেন-

'কিঞ্চি করিয়া কোপ কহিলেন ভব।

কালিকার কিছু নাই উড়াইলে সব।।'

গৌরী স্বামীর মুখে এহেন কথা শুনে রেগে উঠলেন। গৌরীও যোগ্য জবাব দিয়ে বলে উঠলেন-

'দেবী বলে দেব দেব দোষ কেন দেও।

দিয়াছিলে যত ধন লেখ্যা করা নেও।।'

শিব রেগে আগুন। চিৎকার করে বললেন-

'ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করী খাব নাই ভাত।

যাব নাই ভিক্ষায় যে করে জগন্নাথ।।'

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এই ভাবে বাকযুদ্ধ চলেছে। শেষ পর্যন্ত স্বামীকে দোষারোপ করেছেন এই বলে-

'ইন্দ্র আদি অমর সকল যার দাস।

পরে দিত পারে ধন ঘরে উপবাস।।'

আর তখন মনেই হয় না এ যেন কৈলাসবাসী হরগৌরীর দাম্পত্য জীবনের ছবি। আবার 'শিবসঙ্কীর্তন' কাব্যে যে হিমালয়-মেনকার পারিবারিক জীবনের কথা বর্ণিত হয়েছে সেখানেও দৈবগন্ধের লেশমাত্র নেই।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য একজন সুশিক্ষিত, ভদ্র, রুচিশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। সেকালের সমাজ-সংস্কৃতির সম্পর্কে তার সম্যক জ্ঞান ছিল। তাই মানুষকে সঠিক পথের দিশা দিতে কাব্যের স্থানে স্থানে নীতিশিক্ষা, সমাজশিক্ষা, মূল্যবোধের শিক্ষা প্রচার করেছেন যা আমাদের জীবনে সংস্কৃতির ইতিহাসে পাথেয় বলেই মনে হয়।

ছ. আমোদ-প্রমোদ ও খেলাধূলা : মেয়েরা দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর ঘরের বারান্দায় বা দাওয়ায় বসে কড়িচড়ি, পাশা প্রভৃতি খেলাধুলা করতো। ঘরের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা কুলহিতে বা ঘরের উঠোনে বর-কন্যা, ভাত-তরকারি রান্না প্রভৃতি খেলা খেলতো। কখনও বা পুতুল নিয়ে দল বেঁধে খেলতে বসত। 'গৌরীর বিবাহ-খেলা' ও 'বিবাহ খেলার বরকন্যা বিদায়' - অংশে গৌরীর খেলাধুলার কথা কবি রামেশ্বর উল্লেখ করেছেন-

১. 'বরকন্যা বিদায়ের বিধি তারপর।

বিশ্ববিভাবিনী খেলে বলে রামেশ্বর।।'

২. কার ঘরে বধূ আইসে কার ঘরে বেটী।

কোথাহ মেলানি ভার কোথা বাটাবাটি।।

এই রূপে অভয়া অশেষ খেলা খেলে।

রামেশ্বর অতঃপর বিবরিয়া বলে।।'

আমাদের সমাজের অতি পরিচিত লোকক্রীড়া 'লুকোচুরি' বা 'লুকলুকানি' খেলার কথা আছে-

'খেলে লুকলুকানি আপনি হয়া বুড়ি।

একচোরে সভাকারে করে তাড়াতাড়ি।।'

জ. সামাজিক-সংস্কার বিশ্বাস : 'শিবসঙ্কীর্তন' মধ্যযুগের কাব্য। তাই সমগ্র কাব্যে সেকালের সমাজের প্রচলিত সংস্কার-বিশ্বাস এর কথা থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক নিয়ম। স্বাভাবিক ভাবেই সংস্কার-বিশ্বাসের মধ্যে কিছু কিছু রয়েছে লৌকিক আচার-আচরণ আর কিছু রয়েছে কুসংস্কার ও বিধিবিধান। জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহকে কেন্দ্র করে অজস্র লোকাচার 'শিবসঙ্কীর্তন' কাব্যে চোখে পড়ে। যেমন-

১. জন্মকেন্দ্রিক লোকাচার :

হিমালয়-মেনকার গৃহে গৌরী কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করেছে। জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে পিতা হিমালয় নানা ধরণের লোকাচার পালন করেছেন। যেমন-

ক. আত্মীয় স্বজনদের বস্ত্র ও কড়ি বিতরণ করেছেন।

খ. পাড়াপড়শিদের নিয়ে নাচ-গান-বাজনা সহযোগে কৌলিক জন্মোৎসব পালন করেছেন।

২. মৃত্যুকেন্দ্রিক সংস্কার : মদনভস্মের পর রতি বিলাপকালে পড়শির রমণীরা নানা ধরণের লোকাচার পালন করেছেন। শোকাতুর রতির মুখে কর্পূর-তাম্বুল তুলে দিয়েছেন। নাচ-গান-উলুধ্বনি দিয়ে সতী রতির কাছে সকলেই আশীর্বাদ নিয়েছেন।

'কত নারী গলে ধরি মরি মরি বল্যা।

কর্পুর তাম্বুল তার মুখে দিল তুল্যা।।

বাদ্গীত হুলাহুলি দিয়া জয়জয়।

নতি হৈয়া সতীর আশিস সবে লয়।।'

৩. বিবাহকেন্দ্রিক লোকাচার : সেকালে বিবাহের মত পবিত্র সামাজিক অনুষ্ঠানে লোকাচারের কথা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। যেমন-

ক. অধিবাস অনুষ্ঠান :

খ. কন্যা-সনপ্রদান : হিমালয় শিবের হাতে কন্যা সম্প্রদান কালে ছাদনাতলায় যে সব লোকাচার বিধির দৃশ্য চোখে পড়ে তা হল-

'হেমাসনে হিমালয় বসাইয়া হরে।

হরষিত হৈয়া হৈমবতী দান করে।।

বেদবাক্য বলিয়া করিল সমর্পণ।

দিয়া মাল্য মলয়জ বস্ত্র আভরণ।।

পায় পাদ্য শিরে অর্ঘ্য মুখে আচমণ।

মন্ত্র পড়্যা দিল মহীধর বিচক্ষণ ।

কন্যা সম্প্রদান কালে বলে গিরি রায়।।

প্রপিতামহ পূর্বক হৈতে চায়।।'

৪. বার-ব্রত ও উৎসব পার্বণের লোকাচার : বার-ব্রতে ও উৎসব পার্বণে সেকালের নর-নারীরা নানা ধরণের লোকাচারবিধি পালন করতেন। যেমন-শিবরাত্রি ব্রতের লোকাচার বিধি হল উপবাস দেওয়া, মুখে অন্ন না তোলা প্রভৃতি।

'শিবরাত্রি বিনা সব সেবা ফল নাশে।

মহাষ্টমী বিনা মনোভীষ্ট হবে কীসে।।

একাদশী অন্ন খাল্যে অধঃপাত হয়।

অতএব সবার কর্তব্য ব্রত হয়।।'

শারদীয়া পুজোর সময় মেয়েরা আলপনা দেয় মণ্ডপে বা মন্দিরে এবং ঘরে ঘরে বনমালা টাঙিয়ে রাখে। পুজোর সময় মেয়েরা উপবাস দেয়। ধূপ, ধুনা জ্বালিয়ে দেয়। সন্ধ্যায় সান্ধ্য প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে। ফুল-ফল দিয়ে পুজোর নৈবেদ্য সাজায়।

'শরতে শারদা পূজা সবাকার ঘরে।

নৃত্য গীত আনন্দিত সকল নগরে ।।

পুরমার্গ চতুষ্পথ সারা সুমাজ্জন।

বনমালা বান্ধিল বিতান বিলক্ষণ।।

পতাকা তোরণশোভা সবাকার-পুরী

দ্বারদেশে আলিপনা দিয়া বুলে নারী।।

দু'সারি পূর্ণিত ঘট ধূপ দীপ জ্বাল্যা।

দশভূজা পুজে উমা সুপ্রতিমা শৈল্যা।।'

৫. কৃষিকেন্দ্রিক লোকাচার : কৃষিভিত্তিক সামাজিক জীবনে অজস্স লোকাচার বিধির পরিচয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। যেমন-

'চৈত্রমাস গেল সব চাষ হল্য পূর্ণ।

মাঠ করা মই দিয়া মাটী কৈল চুর্ণ।।

উচু নিচু ঢালিয়া সকল কৈল সম।

উত্তরে উন্নত কৈল দক্ষিণ দিগভ্যম।

বৈশাখে বিছাতি কৈল শুভক্ষণ দিনে।

সার দিয়া সারা সবভূমি বাতে বুনে।।

ভূমি বুনে ভূতনাথ ভাজা পোড়া ছাড়্যা।

কলমীর শাক খায়্যা উজাড়িল গাড়্যা।।'

সংস্কার-বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে কিছুবিধিনিষেধ যেমন-বার-তিথি-একাদশী পালনে অন্ন খাওয়া নিষেধ। প্রথম দিনে ধানের চারা রোপণের সময় ঘরে ভাজা পোড়া জিনিস খেতে নেই। দেবতার প্রসাদ খেয়ে মাথায় হাত ঝুলিয়ে নিতে হয়। এই রকম অজস্র বিধি-নিষেধের কথা আছে।

১. 'জোড় হাতে যত্ন করা বলি জনে জনে।

খায়্য না খায়্য না অন্ন একাদশী দিনে।।

সত্য বলি সার বলি আর বলি হিত

একাদশী দিনে অন্ন খাবা অনুচিত।।'

২. 'ভূমি বনে ভূতনাথ ভাজা পোড়া ছাড়্যা।

কলমীর শাক খায়্যা উজাড়িল গাড়্যা।।'

৩. 'হাল কামাঞের দিন হর দেন বল্যা।

গাছি মারা হুড়া গাছি পাড়ে রাখে তুল্যা।।'

৪. 'মুখে ফেল্যা প্রসাদ মস্তকে মোছে হাত।'

প্রাচীন যুগে কেন, সবকালের মানুষের রক্তে মিশে আছে এই সব লোকায়ত বিশ্বাসের জগত-

১. 'অপকর্ম করিলে অধর্ম ভোগ আছে।'

২. 'ধর্ম গিলে ধূর্ত লোক ধারি নাই ধার।

পরিণামে নরকে নিস্তার নাই তার।।'

৩. 'ভাগ্যফলে ভূতলে মনুষ্য জন্ম হয়।

ধন্য তারা করে যারা ধর্মের সঞ্চয়।।'

সকালের সমাজে অজস্র কু-সংস্কার জনমানসে প্রচলিত ছিল। হাঁচি, কাশি, কাকের ডাক, শূন্য কলসি দেখা, ভিখারি দর্শন বা রাস্তায় যোগীদর্শন ইত্যাদি অমঙ্গল সূচক বলে প্রচলিত ছিল। সমাজ পরিবর্তনের ধারায় এখনও লোকসমাজে এইগুলি অমঙ্গল সূচক বলেই বিবেচিত হয়।

৭.২: শিব সংকীর্তন বা শিবায়ন কাব্যের কাহিনী

বাংলার শিব বিষয়ক কাহিনীগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১)মৃগলুব্ধ কাহিনী ২) শিবায়ন কাব্য -প্রথম শ্রেণীর কাব্যে পর্যায়ের অংশ পৌরাণিক আদর্শ প্রধান।

মৃগলুব্ধ-

মৃগলুব্ধ কাব্যের এপর্যন্ত জ্ঞাত কবি রতিদেব। এর বিষয়বস্তু নিম্নরুপ । প্রথমে দেব দেবী বন্দনা ও আত্মপরিচয় বর্ণনার পর মধু কৈটভ বধ এর গল্প আছে। শিব মুনিপত্নীকে লঙ্ঘন করায় শিবের শাপে শিবের লিঙ্গচ্যুতি,ভ্রষ্ট লিঙ্গের প্রভাব ইত্যাদি ঘটনা হরগৌরী সংবাদে ব্রতের আকারে বিবৃত। রাজা মুচুকুন্দ ও রানী রুক্মিণীর কথোপকথনে মূল উপাখ্যানটি বর্ণিত। একদিন রাজা মুচুকুন্দ শিবচতুর্দশীর পুজো সাঙ্গ করে রানী রুক্মিণীর কাছে ব্রত কথা শোনেন। রানীর গল্প এরকম-বিদ্যাধর চিত্রসেন একদিন ইন্দ্রের সভায়

নৃত্যের সময় হরিণ শিকারের দৃশ্য দেখে তালভঙ্গ করেন। তাকে নরলোকে ব্যাধ জীবন-যাপনের অভিশাপ দেন। ভদ্রসেন মৃগের সাক্ষাৎ লাভ করলে চিত্রসেনের শাপমুক্তি হবে- এ নির্দেশও ইন্দ্রের ছিল। সারাদিন হরিণ খুঁজে ব্যর্থ, শ্রান্ত ,অবসন্ন, উপবাস ক্লিষ্ট, ব্যাধ চিত্রসেন রাত্রিতে আত্মরক্ষার জন্য বেল গাছে ওঠে ।সেদিন ছিল শিবচতুর্দশী। চিত্রসেন গাছে ওঠার সময় একটি সজল বিল্বপত্র বৃক্ষের তলায় শিবলিঙ্গের উপর পড়ে। শিব তখন পরিতুষ্ট হয়ে ব্যাধকে বর দিতে আসেন ।ব্যাধ তার কাছে পরদিন সকালে পশুর লাভের বর পায়। পরদিন ভদ্রসেন মৃগ ব্যাধের জালে আবদ্ধ হয়। এদিকে ভদ্রসেনের সঙ্গিনি মৃগী কিছুতেই তাকে ত্যাগ করে যেতে চায়নি। নিজের প্রাণ বিপন্ন করেও স্বামী মৃগটীকে উদ্ধারের জন্য কৃত সংকল্প। এমন সময় ব্যাধ চিত্রসেন সেখানে উপস্থিত হন।

মৃগী বলেন জীব হত্যার তুল্য পাপ নেই। কেবল শিবরাত্রি ব্রতে সেই পাপমোচন সম্ভব এমন অনেক কথা বলে মৃগী তাকে ধর্মউপদেশ দিলেন।মৃগীর বাক্যে চিত্রসেনের জ্ঞানোদয় হয়। চন্দ্রভাগা তীরে শিবমন্দিরে আরাধনা করে চিত্রসেন পাপমুক্ত হন। ভদ্রসেন ও তাঁর পত্নী মৃগীও শিবলোক পেলেন। রুক্মিণীর এই কথা শুনে মুচুকুন্দের শিবরাত্রি ব্রত উদযাপিত হয়। পরদিন সকালে চন্দ্রভাগা তীরের শিব মন্দিরে পূজা শেষ করে রাজা লোকান্তরিত হয়ে শিবলোক প্রাপ্ত হন।

লৌকিক শিবায়ন কাব্য সমূহের গল্পাংশে দেবমাহাত্ম্য কীর্তনের চেয়ে লোক জীবনাশ্রিত গল্পরস আছে। প্রাথমিক অংশে পৌরাণিক কাহিনী আছে। ইন্দ্র সভায় শিবের দ্বারা নমস্কৃত না হয়ে দক্ষ প্রজাপতি ক্ষোভ,শিব হীন দক্ষ যজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ,দক্ষের বিড়ম্বনা , গৌরীরূপে হিমালয় ও মেনকার ঘরে সতীর পুনরায় জন্মগ্রহণ,পার্বতীর সাধনা ও শিবকে পতিরূপে লাভ ইত্যাদি কথা প্রসঙ্গের শেষেই আরম্ভ হয়েছে বাঙালির লোকায়ত গল্প। অবশ্য এই অংশে মৃগলব্ধ অনুযায়ী বাধ্যকথা শিবরাত্রি মাহাত্ম্যের বর্ণনাও রয়েছে সংক্ষিপ্ত আকারে। শিবায়ন এর মুখ্য গল্প এরকম-

গাহস্থ্যজীবনে পার্বতীর বড় দুঃখ ভিক্ষান্নে সংসার আর চলে না।মহাদেবকে তিনি কৃষক হওয়ার পরামর্শ দেন। বিশ্বকর্মা চাষের জোয়াল,লাঙল,মই তৈরি করে দিলেন। কুবেরের

ভান্ডার থেকে এলো বীজ ধান।ক্রমে শিবের কৃষিকর্ম সার্থক হয়ে উঠল- বসুন্ধরা হল শস্যপূর্ণা। আনন্দে নিজের দারিদ্র্য লাঞ্ছিত পরিবারের কথা ভুলে গেলেন।শিব ঘরে আসেন না পার্বতী দুঃখ-দুর্দশা অবধি নেই। নারদের কথায় শিবকে জব্দ করার জন্য তিনি উঙানি মশা,মাছি,ডাঁশদের পাঠালেন। শিবের পাকা ধানে পোকা পড়ল কিন্তু শিব নির্বিকার। অবশেষে মোহিনী বাগদিনীরূপে দেবীও মহাদেবকে বিভ্রান্ত করলেন। শিবের মন এবার টলল। বাগদিনীররূপে পাগল ভোলানাথ। ঠিক সেইসময় পার্বতীর ঘরে ফিরে এলেন।শিবও অনেকদিন পরে ঘরে এলেই পার্বতী সধবার ভূষণ শাঁখা চাইলেন শিবের কাছে। শাঁখা পড়লেই স্বামী আর বিমুখ হবেন না এই বিশ্বাসেই গৌরীর শাঁখা পড়ার অভিলাষ। শিব ভিখারি পাবেন কোথায় অর্থ যে গৌরীকে শাঁখা পড়াবেন। দুঃখে পার্বতী পিত্রালয়ে চলে গেলেন।হিমলয় গৃহে তখন দুর্গোৎসব।শিব শঙ্খ বণিকের বেশে শ্বশুরালয়ে উপনীত হন। পরে পার্বতী বিশ্বনাথের কাছে নারীর শ্রেষ্ঠ ভূষণ শঙ্খ পরিধান করে মহাকালী রূপে আবির্ভূত হন।হরপার্বতীর বিবাদ মিটে গেল,তাঁরা ফিরে এলেন কৈলাসে।

৭.৩: শিব সংকীর্তন বা শিবায়ন কাব্যের সমাজচিত্র

সাহিত্য হল সমাজজীবনের দর্পণ। যে কালে দাঁড়িয়ে সাহিত্যিক তাঁর সৃষ্টিশীল জগতে বা সাহিত্যের আঙিনায় যা সৃষ্টি করেন-তাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে কাল ও সমাজ আপনা-আপনি এসে ধরা দেয়। এটাই হল সৃষ্টির নিয়ম। দেশ-কাল-সমাজকে উপেক্ষা করে স্রষ্টা কখনও সাহিত্যের জগতে বিচরণ করতে পারেন না। তাই প্রাচীন ও মধ্যযুগে রচিত চর্যাপদে, মঙ্গলকাব্যে, অনুবাদ সাহিত্যে, পদাবলী সাহিত্যে, জীবনীকাব্যে, আখ্যানকাব্যে ও গাথা-গীতিকায় তৎকালীন সমাজ জীবনের বাস্তব চিত্র উঠে এসেছে। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবসঙ্কীর্তন'এর ব্যতিক্রম নয়। কেননা রামেশ্বর হলেন সচেতনশীল সমাজ অভিজ্ঞ কবি। গ্রামীণ সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা তার দীর্ঘদিনের। সমাজে বাস করে যা তিনি নিজের চোখে দেখেছেন 'শিবসঙ্কীর্তন' বা 'শিবায়ন' কাব্যে তারই বাস্তব রূপ দিয়েছেন। পুরাণের কাহিনী ও ঘটনা অপেক্ষা লৌকিক ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করেই শিবমাহাত্ম্য কথা পরিবেশন করেছেন। কৈলাসবাসী শিবের গার্হস্থ্যজীবন কাহিনি বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে তৎকালীন পরিপার্শ্বিক সমাজজীবনের বহু কথা উঠে এসেছে। যেমন-

ক. জীবন-জীবিকার (বৃত্তি) কথা

খ. খাদ্য

গ. পোষাক-পরিচ্ছদ ও অলংকার

ঘ. আসবাবপত্র

ঙ. ধর্মকর্ম ও দেবদেবী

৬. পারিবারিক ও সামাজিক জীবনাদর্শ

ছ. আমোদপ্রমোদ-খেলাধুলা

জ. সামাজিক সংস্কার-বিশ্বাস ইত্যাদি।

ক. জীবন-জীবিকার (বৃত্তি) কথা : কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য **'শিবসঙ্কীর্তন'** বা শিবায়ন কাব্যে অষ্টাদশ শতকের নিম্নমধ্যবিত্ত ও অন্ত্যজ সমাজের সামাজিক জীবন ভাবনার পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। সেকালের মানুষের জীবন-জীবিকার কথা তুলে ধরেছেন এই ভাবে-

১. ব্যাধ জাতি : এরা অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মানুষ। বনে-জঙ্গলে পশু-পাখি শিকার করে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতেন। তার প্রমান মেলে কাব্যের 'ব্যাধের মৃগয়ায়' অংশে

'একদিন সেই ব্যাধ প্রবেশিয়া বনে।

বধিল বিস্তর পশু বিস্তর সন্ধানে ।।'

২. শাঁখারি : এরা গ্রামে গ্রামে ঘরের কুলবধূদের হাতে শাঁখা পরিয়ে অর্থ উপার্জন করে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করেন।

'মাধব দাবুড়ি দেয় থাক মাগী ঠেঠা।

এ হাতে পরাবে শঙ্খ শাঁখারীর বেটা।।'

৩. ব্রাহ্মণ : সেকালের সমাজে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় উচ্চবর্ণের জাতি হিসেবে পরিগনিত। আজও এরা সমাজে উচ্চবর্ণের মানুষ বলে বিবেচিত হন। এদের আদি জাত-বৃত্তি হল পূজো অর্চনা করা। এদের সমাজের পুরুষরা কেউ কেউ দেবস্থানের পুরোহিত হতেন-

'পুরোহিত-পুরঃসর পূজা সঙ্জা লয়্যা।'

ব্রাহ্মণ ছাড়াও বৈষ্ণব, চণ্ডাল প্রভৃতি জাতির কথা উল্লেখ আছে।

১. 'পালা সাঙ্গ হৈল আশীর্বাদ অতঃপর ।

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দয়া করহ শঙ্কর।।'

২. 'অভক্ত ব্রাহ্মণ সে চণ্ডাল হৈতে দীন।

হরিভক্ত চণ্ডালের সে দ্বিজ অধীন।।'

৩. 'হরিভক্তি এমন চণ্ডাল যদি হয়।

সবাকার বন্দনীয় তার পদদ্বয়।।'

সেকালে এক শ্রেণির মানুষ ছন্নছাড়া, ভবঘুরে এবং ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতেন। শিবের ভিক্ষাবৃত্তির মধ্য দিয়েই তা প্রমান মেলে-

'ভ্রুকুটি করিয়া ভাল ভাল ভূমিতলে।

ভবন ভবন ভিক্ষা দেহি বলে।।'

এছাড়াও কৃষকরা চাষবাস করে জীবন-জীবিকা চালাতেন। শিবকে ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে চাষবাস করে জীবিকা নির্বাহের পরামর্শ দিয়েছেন সহধর্মিণী গৌরী-

'চষ ত্রিলোচন চাষ চষ ত্রিলোচন।

নহে দাসদাসী আদি ছাড় পরিজন।।'

খ. খাদ্য : 'শিবসঙ্কীর্তন' কাব্যে রামেশ্বর ভট্টাচার্য অজস্র খাদ্যদ্রব্যের কথা উল্লেখ করেছেন। বাঙালির প্রিয় খাদ্য ভাত ও নানা ধরণের তরিতরকারির কথা আছে।

১. 'আঁঠু ঢ্যাকা বস্ত্র দিবা পেট ভরা ভাত।

প্রীত কৈর যেমন জানকী রঘুনাথ।।'

২. 'জামাই ভাতের দিন ভাত দিতেছিনু।'

৩. 'লম্বোদর বলে শুন নগেন্দ্রের ঝি।

সূপ হৈল সাঙ্গ আন আর আছে কি।

দড়বড় দেবী আন্যা দিল ভাজা দশ।

খাইতে খাইতে গিরিশ গৌরীর গান যশ।।'

৪. 'সুক্তা খায়্যা ভোক্তা চায়্য হস্ত দিল শাকে।

অন্নপূর্ণা অন্ন আন রুদ্রমূর্তি ডাকে।।'

আর আছে নানা ধরণের শাক সব্জি, ফল-মূল খাওয়ার প্রসঙ্গ_-

'চাষা দিল শশা ফুটি আলু শাক কচু।

করলা কুমড়া কচি কাচকলা কিছু।।'

সেকালের বাঙালিরা পেট ভরে দই, দুধ, ঘোল, মন্ডা, মিঠাই প্রভৃতি খাবার খেতো। এছাড়াও ঘি, মধু ছিল প্রিয় খাদ্য। উৎসব-অনুষ্ঠানে ক্ষীর, পিঠে, পায়েস ভোজন করতেন। 'শিবসঙ্কীর্তন' কাব্যে এইসব খাদ্যদ্রব্যের কথা উঠে এসেছে-

'মাল্য মলয়জ দিয়া মুখে দেই মিঠা।

দুগ্ধ দধি ঘৃত মধু ক্ষীর খণ্ড পিঠা।।'

এখনও বাঙালিরা পেট ভরে মণ্ডা, মিঠাই, পায়েস, ক্ষীর ও পিঠে প্রভৃতি খাবার খায়। সেকালে মেয়েরা পান, সুপারি ও কর্পূর খেতো। পানের সঙ্গে খেতো লবঙ্গ ও এলাচির দানা।

১. 'কত নারী গলে ধরি মরি মরি বল্যা।

কপূর তাম্বুল তার মুখে দিল তুল্যা।।'

২. 'কর্পুর তাম্বুল খাল্য এলাচি লবঙ্গ।

বিধুমুখী বিম্বাধরে বাজাইল রঙ্গ।।'

সেযুগে ভবঘুরে, ছন্নছাড়া, সংসার উদাসী সাধু-সন্ন্যাসীর দল গাঁজা, ভাঙ, আফিং প্রভৃতি নেশা জাতীয় খাদ্যদ্রব্য খেতেন। 'শিবসঙ্কীতর্ন' কাব্যে তার প্রমাণ মেলে-

১. 'গাঁজা-ঝাড়া তিতা তাজা ভিজাইয়া তাকে।

মহিষমর্দিনী বাট্যা দিল মুহূর্তেকে।।'

২. 'দার-চিনি চন্দনি চন্দন চাঞিচুয়া।

মরিচ আফিং হিঙ্গ হরীতকী গুয়া।।'

গ. পোষাক-পরিচ্ছদ ও অলংকার : রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁর শিবায়ন কাব্যে দরিদ্র শিবের গাহস্থ্য জীবনের কাহিনি যে ভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে সেকালের দারিদ্যপীড়িত বাঙালির পোষাক-আসাক বা বেশভূষা যে অতিসাধারণ মানের সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। শিব ভিখারি। গায়ে মাখেন ছাইভস্ম, কপালে লেপেন চন্দনের ফোঁটা। বাঘছাল পরে ঘরে ঘরে ভিক্ষা মেগে বেড়ান।

'ব্যাঘ্রছাল-বসন বেষ্টিত কটিদেশ।

হাতে মাটা মাথে জটা যোগিনীর বেশ।।

স্বামীর সহিত সঙ্গ করা নিরন্তর

চিতা ভস্ম চন্দনে চর্চিত কলেবর।।'

আসলে সেকালে ছন্নছাড়া, সংসার উদাসী যোগী পুরুষরা বা ভিখারি দল এই ধরণের বেশভূষায় সজ্জিত হতেন। সেকালে পুরুষরা ধুতি, লুঙ্গি, গামছা পরে ঘুরে বেড়াতো। শীতবস্ত্র হিসেবে চাদর, গামছা পরতো। আর মেয়েরা সুতির শাড়ি, শিলিক শাড়ি ও পাটের বস্ত্র পরিধান করত। তবে বিয়ের সময় মেয়েরা সুন্দর বেশভূষার ও সাজ-পোষাকে সজ্জিত হতো। 'গৌরীর অধিবা'-এ তার প্রমাণ মেলে-

'সুন্দরী সুন্দর বস্ত্র অলঙ্কার পরা।

পাবর্বতী পুরট-পীঠে আরোহণ হল্যা।।'

সুন্দর সুন্দর পোষাকের সঙ্গে মেয়েরা সোনা-রূপার অলংকার পরতো। শাঁখারির কাছে গৌরী যখন হতে শাঁখা পরতে গেছেন -তখনও সুন্দর পোষাকের অঙ্গে সোনা-রূপা অলংকার পরিধান করেছেন-

'শঙ্করীকে কিঙ্করী বসায়্যা বরাসনে।

বিশেষ করিলা বেশ পরম যতনে ।।

অঙ্গরাগে এমন উদ্ভূত হৈল ছবি।

পারে নাই তুল্য হৈতে প্রভাতের রবি।।

সুন্দরী সুন্দর বস্ত্র অলঙ্কার পরা।

শাঁখারী সমীপে আল্য ঝলমল করা।।'

উপরোক্ত বর্ণনার মধ্যে আমাদের ঘরের কথা চেনা কোন বাঙালি কুলবধূ হাঁটু ঢাকা কাপড় পড়ে সারা অঙ্গে সোনা রূপার অলঙ্কার জড়িয়ে যেন শাঁখারী কাছে দুহাতে মঙ্গল শাঁখা পরতে ছুটে এসেছেন।

'সুন্দরী সুন্দর বস্ত্র অলংকার পরা।

শাঁখারী সমীপে আল্য ঝলমল করা।।'

ঘ. আসবাবপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র : রামেশ্বরের শিবায়ন কাব্যের বাঙ্গালীদের ব্যবহৃত অজস্র আসবাবপত্র ও অস্ত্রশস্ত্রের কথা উল্লেখ আছে ভাত রান্নার পাত্র (হাঁড়ি), ঘটি, থালা (ভোজনের) বর-কন্যা অধিবাসের থালা, মাটির পাথেরা খপরা (ভিক্ষার পাত্র) সরা, ভাণ্ড ইত্যাদি লোকতৈজস ও আসবাবপত্রের বিবরণ আছে।

১. 'তিনজনে একেবারে বার মুখে খায়।

এই দিতে এই নাই হাড়ি পানে চায়।।'

২. 'উৎকট চর্ব্বণে ফিরা ফুরাইল ওদন।

এক কালে শূন্য থালে ডাকে তিন জন।।'

৩. 'নন্দী আস্যা বস্যা গেল শঙ্করের থালে।

সমগ্র সামগ্রী দেবী দিলা এককালে।।'

আর উল্লেখ আছে বসার পিঁড়ি, বর কন্যা বসার বরাসন, বসার মাচিল্যা, ঘুমোবার জন্য খাটিয়া ও পালঙ্কের কথা-

১. 'পূর্ব্ব দুঃখে পার্বতী পূরিল পূর্ণকাম।

উচ্চ পিঁড়া হৈতে বুড়্যা পড়্যা বলে রাম।।'

২. 'অচল আচান্ত হইয়া বৈসে বরাসনে।

কৃতাঞ্জলি করে নতি কৃষ্ণের চরণে।।'

কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় উঠে এসেছে কৃষিকাজের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম-এর কথা। অর্থাৎ চাষবাসের জন্য হাল, জুয়াল, ফলা, পাসী প্রভৃতি কৃষিযন্ত্রপাতি সেকালে কৃষকরা ব্যবহার করতেন।

১. 'বিশাই বুঝিয়া কার্য্য কৈল সাবধান।

লাঙ্গল-জোয়াল-ফাল করিল নির্ম্মাণ।

হলধর পাশী মারা পুরাইল ফাল।

আড় চাল লাঙ্গলের যুড়্যা রাখে আল।।'

শিবায়ন কাব্যে চোখে পড়ে অজস্র অস্ত্রশস্ত্রের কথা যেমন - কাটারি, টাঙ্গি, ত্রিশূল, শর, ধনু, কুঠার ইত্যাদি।

১. 'কুঠারে কাটিতে কর করিল উদ্যাম'।

২. 'কেহমারে শেল শূল কুঠার তোমর।

ডাবুষ পট্টিশ টাঙ্গি ছত্রিশ আতর।।'

ঙ. ধর্মকর্ম ও দেবদেবী : রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ন কাব্যে সেকালের মানুষের ধর্মচর্চা ও দেবদেবীর পুজো অর্চনার বিস্তৃত পরিচয় রয়েছে। গ্রন্থের শুরুতেই গণেশ বন্দনা রয়েছে। এর পরেই রয়েছে শিব, চন্ডী নারায়ণী, ও চৈতন্যের বন্দনা গান। লোকদেবী ষষ্ঠী ও মনসার বন্দনা গান গেয়েছেন-

'ষোড়শ মাতৃকা ষড়ানন যষ্ঠী দেবী।

মনসা দেবীরে দণ্ডবৎ হয়্যা সেবি।।'

রাধা-কৃষ্ণকে উপাস্য দেবতা হিসেবে সেকেলের মানুষ পূজো করতো। সেকালে বাঙালির ঘরে ঘরে শারদীয়া উৎসবের ধুম পড়ে যেতো। নর-নারীরা নাচে গানে-মহাধূমধামে পার্বতীর পুজো দিতেন। 'হিমালয়ের শারদীয়া পূজা' অংশে তার প্রমাণ আছে-

'শরতে শারদা পূজা সবাকার ঘরে।

নৃত্য গীত আনন্দিত সকল নগরে।।'

যাগ-যজ্ঞ, জপ-তপ, চন্ডীপাঠ, পাঁচালি গান, নাচ প্রভৃতি মণ্ডপে মণ্ডপে পরিবেশিত হত। কোথাও কোথাও পুজোর সময় ছাগ, মেষ, মহিষ প্রভৃতি পশুবলি দেওয়া হত।

'সবর্ব গৃহে সবের্ব দেখে গীত বাদ্য নাট।

যত ঋষি সবে আসি করে চন্ডীপাঠ।।

ষোড়শোপচারে পূজা পরিপাটা করি।

নানা পুষ্প নানা ফল বিল্বদল ভরি।

নানা জাতি পিষ্টক লড্ডুক নানাবিধ।

পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্নঘৃত মধু দধি।

ছাগ মেঘ মহিষ অশেষ বলিদান।

জপ পূজা যজ্ঞ হৈল অশেষ বিধান।।'

রামেশ্বর ভট্টাচার্য সর্বধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। সকলের ধর্মচর্চা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পর্কে তার উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে 'শিব-মহিমা কীর্তন'- অংশে

'শৈব শাক্ত বৈষ্ণব সবার সেব্য শিব।

গঙ্গাধরে ঘৃণা করে গুরুদ্রোহী জীব।।'

চ. পারিবারিক ও সামাজিক জীবনাদর্শ : শিবসঙ্কীর্তন কাব্যে হর গৌরী পারিবারিক জীবনের নিখুঁত চিত্র ফুটে উঠেছে। অভাবের সংসার। তার উপর স্বামী গাঁজা-ভাঙ-নেশাখোর বাউন্ডুলে। ছাইভস্ম মেখে নন্দী-ভিঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ান। ভিক্ষাবৃত্তি-ই হল বাঁচার সম্বল-

'ভ্রূকুটি করিয়া ভাল ভাল ভূমিতলে।

ভবন ভবন ভিক্ষা দেহি দেহি বলে।।'

শিব ঝুলি ভর্তি চাল-ডাল এনে স্ত্রীর হাতে দেন। গৌরী ছেলেমেয়েদের খাওয়ার জন্য রান্নায় বসেন। রান্নার শেষে খাবার পরিবেশন করেছেন। হিঁসেল ঘরে সে এক দারুন দৃশ্য-

'তিন জনে একেবারে বার মুখে খায়।

এই দিতে এই নাই হাড়ি পানে চায়।।'

কখনও বা 'উৎকট চবর্বণে ফিরা ফুরাইল ওজন।

এক কালে শূন্য থালে ডাকে তিনজন।।'

তবুও গৌরী হিসেল ঘরে খাবার পরিবেশন করতে গিয়ে ধৈর্য্য হারাননি। ক্ষোভে, ঘণায় হিঁসেল ঘরে খাবার ফেলে পালিয়ে যাননি। সহধর্মিণী প্রশংসায় পঞ্চমুখ স্বামী শিব-

'প্রেয়সীকে প্রশংসিয়া বলে বিশ্বনাথ।

সত্য সতী তুমি অতি ধন্য দুটী হাত।।

অল্প রান্ধ্যা এত অন্ন কোথা হতে আন।

কেমন হস্তের গুণ কিবা মন্ত্রজান।।'

এতো দাম্পত্য প্রেমের অমলিন ছবি। যার রূপকার হলেন ব্রাহ্মণ কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য।

মানবজীবন বড়ই বিচিত্র। সুখ-দুঃখের সংসারে জীবনের সব রং বদলে যায়। অভাবের সংসারে দাম্পত্য প্রেমের অমলিন ছবিও বদলে গেছে। ভিক্ষার চাল-পয়সায় যে আর সংসার চলে না। কিন্তু শিব সে কথায় কান দিতে নারাজ। তাই গৌরীকে রেগে বলে উঠলেন-

'কিঞ্চি করিয়া কোপ কহিলেন ভব।

কালিকার কিছু নাই উড়াইলে সব।।'

গৌরী স্বামীর মুখে এহেন কথা শুনে রেগে উঠলেন। গৌরীও যোগ্য জবাব দিয়ে বলে উঠলেন-

'দেবী বলে দেব দেব দোষ কেন দেও।

দিয়াছিলে যত ধন লেখ্যা করা নেও।।'

শিব রেগে আগুন। চিৎকার করে বললেন-

'ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করী খাব নাই ভাত।

যাব নাই ভিক্ষায় যে করে জগন্নাথ।।'

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এই ভাবে বাকযুদ্ধ চলেছে। শেষ পর্যন্ত স্বামীকে দোষারোপ করেছেন এই বলে-

'ইন্দ্র আদি অমর সকল যার দাস।

পরে দিত পারে ধন ঘরে উপবাস।।'

আর তখন মনেই হয় না এ যেন কৈলাসবাসী হরগৌরীর দাম্পত্য জীবনের ছবি। আবার 'শিবসঙ্কীর্তন' কাব্যে যে হিমালয়-মেনকার পারিবারিক জীবনের কথা বর্ণিত হয়েছে সেখানেও দৈবগন্ধের লেশমাত্র নেই।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য একজন সুশিক্ষিত, ভদ্র, রুচিশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। সেকালের সমাজ-সংস্কৃতির সম্পর্কে তার সম্যক জ্ঞান ছিল। তাই মানুষকে সঠিক পথের দিশা দিতে কাব্যের স্থানে স্থানে নীতিশিক্ষা, সমাজশিক্ষা, মূল্যবোধের শিক্ষা প্রচার করেছেন যা আমাদের জীবনে সংস্কৃতির ইতিহাসে পাথেয় বলেই মনে হয়।

ছ. আমোদ-প্রমোদ ও খেলাধূলা : মেয়েরা দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর ঘরের বারান্দায় বা দাওয়ায় বসে কড়িচড়ি, পাশা প্রভৃতি খেলাধুলা করতো। ঘরের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা কুলহিতে বা ঘরের উঠোনে বর-কন্যা, ভাত-তরকারি রান্না প্রভৃতি খেলা খেলতো। কখনও বা পুতুল নিয়ে দল বেঁধে খেলতে বসত। 'গৌরীর বিবাহ-খেলা' ও 'বিবাহ খেলার বরকন্যা বিদায়' - অংশে গৌরীর খেলাধুলার কথা কবি রামেশ্বর উল্লেখ করেছেন-

১. 'বরকন্যা বিদায়ের বিধি তারপর।

বিশ্ববিভাবিনী খেলে বলে রামেশ্বর।।'

২. কার ঘরে বধূ আইসে কার ঘরে বেটী।

কোথাহ মেলানি ভার কোথা বাটাবাটি।।

এই রূপে অভয়া অশেষ খেলা খেলে।

রামেশ্বর অতঃপর বিবরিয়া বলে।।'

আমাদের সমাজের অতি পরিচিত লোকক্রীড়া 'লুকোচুরি' বা 'লুকলুকানি' খেলার কথা আছে-

'খেলে লুকলুকানি আপনি হয়া বুড়ি।

একচোরে সভাকারে করে তাড়াতাড়ি।।'

জ. সামাজিক-সংস্কার বিশ্বাস : 'শিবসঙ্কীর্তন' মধ্যযুগের কাব্য। তাই সমগ্র কাব্যে সেকালের সমাজের প্রচলিত সংস্কার-বিশ্বাস এর কথা থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক নিয়ম। স্বাভাবিক ভাবেই সংস্কার-বিশ্বাসের মধ্যে কিছু কিছু রয়েছে লৌকিক আচার-আচরণ আর কিছু রয়েছে কুসংস্কার ও বিধিবিধান। জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহকে কেন্দ্র করে অজস্র লোকাচার 'শিবসঙ্কীর্তন' কাব্যে চোখে পড়ে। যেমন-

১. জন্মকেন্দ্রিক লোকাচার :

হিমালয়-মেনকার গৃহে গৌরী কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করেছে। জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে পিতা হিমালয় নানা ধরণের লোকাচার পালন করেছেন। যেমন-

ক. আত্মীয় স্বজনদের বস্ত্র ও কড়ি বিতরণ করেছেন।

খ. পাড়াপড়শিদের নিয়ে নাচ-গান-বাজনা সহযোগে কৌলিক জন্মোৎসব পালন করেছেন।

২. মৃত্যুকেন্দ্রিক সংস্কার : মদনভস্মের পর রতি বিলাপকালে পড়শির রমণীরা নানা ধরণের লোকাচার পালন করেছেন। শোকাতুর রতির মুখে কর্পূর-তাম্বুল তুলে দিয়েছেন। নাচ-গান-উলুধ্বনি দিয়ে সতী রতির কাছে সকলেই আশীর্বাদ নিয়েছেন।

'কত নারী গলে ধরি মরি মরি বল্যা।

কর্পুর তাম্বুল তার মুখে দিল তুল্যা।।

বাদ্গীত হুলাহুলি দিয়া জয়জয়।

নতি হৈয়া সতীর আশিস সবে লয়।।'

৩. বিবাহকেন্দ্রিক লোকাচার : সেকালে বিবাহের মত পবিত্র সামাজিক অনুষ্ঠানে লোকাচারের কথা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। যেমন-

ক. অধিবাস অনুষ্ঠান :

খ. কন্যা-সনপ্রদান : হিমালয় শিবের হাতে কন্যা সম্প্রদান কালে ছাদনাতলায় যে সব লোকাচার বিধির দৃশ্য চোখে পড়ে তা হল-

'হেমাসনে হিমালয় বসাইয়া হরে।

হরষিত হৈয়া হৈমবতী দান করে।।

বেদবাক্য বলিয়া করিল সমর্পণ।

দিয়া মাল্য মলয়জ বস্ত্র আভরণ।।

পায় পাদ্য শিরে অর্ঘ্য মুখে আচমণ।

মন্ত্র পড়্যা দিল মহীধর বিচক্ষণ ।

কন্যা সম্প্রদান কালে বলে গিরি রায়।।

প্রপিতামহ পূর্বক হৈতে চায়।।'

৪. বার-ব্রত ও উৎসব পার্বণের লোকাচার : বার-ব্রতে ও উৎসব পার্বণে সেকালের নর-নারীরা নানা ধরণের লোকাচারবিধি পালন করতেন। যেমন-শিবরাত্রি ব্রতের লোকাচার বিধি হল উপবাস দেওয়া, মুখে অন্ন না তোলা প্রভৃতি।

'শিবরাত্রি বিনা সব সেবা ফল নাশে।

মহাষ্টমী বিনা মনোভীষ্ট হবে কীসে।।

একাদশী অন্ন খাল্যে অধঃপাত হয়।

অতএব সবার কর্তব্য ব্রত হয়।।'

শারদীয়া পুজোর সময় মেয়েরা আলপনা দেয় মণ্ডপে বা মন্দিরে এবং ঘরে ঘরে বনমালা টাঙিয়ে রাখে। পুজোর সময় মেয়েরা উপবাস দেয়। ধূপ, ধুনা জ্বালিয়ে দেয়। সন্ধ্যায় সান্ধ্য প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে। ফুল-ফল দিয়ে পুজোর নৈবেদ্য সাজায়।

'শরতে শারদা পূজা সবাকার ঘরে।

নৃত্য গীত আনন্দিত সকল নগরে ।।

পুরমার্গ চতুষ্পথ সারা সুমাজ্জন।

বনমালা বান্ধিল বিতান বিলক্ষণ।।

পতাকা তোরণশোভা সবাকার-পুরী

দ্বারদেশে আলিপনা দিয়া বুলে নারী।।

দু'সারি পূর্ণিত ঘট ধূপ দীপ জ্বাল্যা।

দশভূজা পুজে উমা সুপ্রতিমা শৈল্যা।।'

৫. কৃষিকেন্দ্রিক লোকাচার : কৃষিভিত্তিক সামাজিক জীবনে অজস্স লোকাচার বিধির পরিচয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। যেমন-

'চৈত্রমাস গেল সব চাষ হল্য পূর্ণ।

মাঠ করা মই দিয়া মাটী কৈল চুর্ণ।।

উচু নিচু ঢালিয়া সকল কৈল সম।

উত্তরে উন্নত কৈল দক্ষিণ দিগভ্যম।

বৈশাখে বিছাতি কৈল শুভক্ষণ দিনে।

সার দিয়া সারা সবভূমি বাতে বুনে।।

ভূমি বুনে ভূতনাথ ভাজা পোড়া ছাড়্যা।

কলমীর শাক খায়্যা উজাড়িল গাড়্যা।।'

সংস্কার-বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে কিছুবিধিনিষেধ যেমন-বার-তিথি-একাদশী পালনে অন্ন খাওয়া নিষেধ। প্রথম দিনে ধানের চারা রোপণের সময় ঘরে ভাজা পোড়া জিনিস খেতে নেই। দেবতার প্রসাদ খেয়ে মাথায় হাত ঝুলিয়ে নিতে হয়। এই রকম অজস্র বিধি-নিষেধের কথা আছে।

১. 'জোড় হাতে যত্ন করা বলি জনে জনে।

খায়্য না খায়্য না অন্ন একাদশী দিনে।।

সত্য বলি সার বলি আর বলি হিত

একাদশী দিনে অন্ন খাবা অনুচিত।।'

২. 'ভূমি বনে ভূতনাথ ভাজা পোড়া ছাড়্যা।

কলমীর শাক খায়্যা উজাড়িল গাড়্যা।।'

৩. 'হাল কামাঞের দিন হর দেন বল্যা।

গাছি মারা হুড়া গাছি পাড়ে রাখে তুল্যা।।'

৪. 'মুখে ফেল্যা প্রসাদ মস্তকে মোছে হাত।'

প্রাচীন যুগে কেন, সবকালের মানুষের রক্তে মিশে আছে এই সব লোকায়ত বিশ্বাসের জগত-

১. 'অপকর্ম করিলে অধর্ম ভোগ আছে।'

২. 'ধর্ম গিলে ধূর্ত লোক ধারি নাই ধার।
পরিণামে নরকে নিস্তার নাই তার।।'

৩. 'ভাগ্যফলে ভূতলে মনুষ্য জন্ম হয়।
ধন্য তারা করে যারা ধর্মের সঞ্চয়।।'

সকালের সমাজে অজস্র কু-সংস্কার জনমানসে প্রচলিত ছিল। হাঁচি, কাশি, কাকের ডাক, শূন্য কলসি দেখা, ভিখারি দর্শন বা রাস্তায় যোগীদর্শন ইত্যাদি অমঙ্গল সূচক বলে প্রচলিত ছিল। সমাজ পরিবর্তনের ধারায় এখনও লোকসমাজে এইগুলি অমঙ্গল সূচক বলেই বিবেচিত হয়।

৭.৪ : শিব সংকীর্তন বা শিবায়ন কাব্যে পৌরাণিক ও লৌকিক প্রভাব

রামেশ্বরের শিবসঙ্কীর্তন আটটি পালায় বিন্যস্ত। প্রত্যেকটি পালার কাহিনির যোগসূত্র অত্যন্ত দৃঢ়নিবদ্ধ। প্রথম পাঁচটি পালায় পুরাণের কাহিনি অনেকটা জুড়ে রয়েছে। পরের তিনটি পালায় পুরাণের যোগসূত্র ক্ষীণ বরং লোকঐতিহ্যের উপর নির্ভর করেই কাহিনির বিস্তার ও অভিনবত্বের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। আশুতোষ

ভট্টাচার্য রামেশ্বরের শিবসঙ্কীতণ কাব্যে পৌরাণিক ও লৌকিক উপাদানের সংমিশ্রিত কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন তা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে- "পৌরাণিক কাহিণীর বর্ণনার অনেক স্থলেই কবি সংস্কৃত পুরাণাদি, এমন কি, কালিদাসের 'কুমার সম্ভব' প্রভৃতিও বাংলায় অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। ভাষার দিক দিয়া এই পৌরাণিক অংশ অনেকটা আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু শিবের লৌকিক কাহিনীর অংশ রচনায় কবিকে সংস্কৃত আদর্শের অভাবে সর্বত্রই নিজের মৌলিক কল্পনা

ও রচনা শক্তির উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। এই সকল ক্ষেত্রে লেখকের একটি সরল কবি-চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়।" কাব্য প্রতিভায় রামেশ্বর কিভাবে পৌরাণিক কাহিনি অপেক্ষা শিবসঙ্কীর্তনে লোকঐতিহ্যকে বা লৌকিক কাহিনিকে গুরুত্ব দিয়েছেন তা-সংক্ষেপে উল্লেখ করবো।

পৌরাণিক প্রভাব :

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য মানেই দেব-দেবীর মাহাত্ম্যগান। মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল-সব মঙ্গলকাব্যেই দেব-দেবীর বন্দনা ও দেব-দেবীর পুজা প্রচারের কথা আছে। শিবায়ন কাব্যের শুরুতেই দেবদেবীর বন্দনার কথা আছে। রামেশ্বরের শিবসঙ্কীর্তণ-এর প্রথম পালায় (স্থাপনাপালা) যে সব দেবদেবীর বন্দনাগান রয়েছে-তা হল

(ক) গণেশ-বন্দনা

খ) শিব-বন্দনা

গ) নারায়ণী-বন্দনা

ঘ) শ্রীচৈতন্য-বন্দনা

ঙ) সর্বদেবের-বন্দনা

চৈতন্য পরবর্তীকালের কাব্য বলেই শিবসঙ্কীর্তন কাব্যে চৈতন্যবন্দনা আছে।
দেবদেবীদের বন্দনা গানে দেবদেবীদের যে পরিচিত দেওয়া হয়েছে তা পুরাণ অনুষঙ্গ। 'সব্বদেবের বন্দনা' অংশে রয়েছে নারায়ণ, সরস্বতী, ভৈরব, ভৈরবী, বিধি, বিষ্ণু, গঙ্গা প্রভৃতি দেবদেবীর কথা।

'শৌনকাদি ঋষি বন্দ বেদ আদি শাস্ত্র।

ইন্দ্র আদি দেব বন্দ বজ্র আদি অস্ত্র

গঙ্গা আদি তীর্থ বন্দ তুলস্যাদি বৃক্ষ।

অনন্তাদি সর্প বন্দ গরুড়াদি পক্ষ।।

বার তিথি নক্ষত্র করণ যোগ যত।

অহনিশি ত্রিসন্ধ্যা কুট্যাদি সংখ্যাকৃত।।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলির পায় নতি।

সবর্ব যুগ সদা দেহ শ্যামচান্দে মতি।।'

পালার শুরুতেই সৃষ্টি-কালের দেবতা, সৃষ্টির বিবরণ, পৃথিবীর উৎপত্তি প্রভৃতি অংশগুলি পুরাণ নির্ভর। পুরাণের অভিজ্ঞতা না থাকলে কখনই সৃষ্টির এমন রহস্যকথা কবি রামেশ্বর বলতে পারতেন না-

'সৃষ্টির প্রথম কালে মহাবিষ্ণু মহাজলে

ভাসিয়া কৌতুক হইল মনে।

সুশিক্ষার অভিলাষে সৃজন পালন আশে

তিন মূর্তি হইলা আপনে।।

রজোগুনে সৃষ্টি-কর্ম দক্ষিণাঙ্গে হইল ব্রহ্মা

বামাঙ্গে বাহির হইলা হরি।

যত-গুনে হৈল তবে সকল পালক ভাবে

শঙ্খ-চত্র-গদাপদ্মধারী।।'

রামেশ্বর পুরাণ অভিজ্ঞ কবি সে বিষয়ে কোণো সন্দেহ নেই। কেননা শিবসঙ্কীর্তনের দ্বিতীয় পালায় 'দক্ষের যজ্ঞকথা' , 'শিব-নারদ সংবাদ' , 'দক্ষযজ্ঞের সতীর গমন মানস,' 'পতিনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ', 'দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস', 'দক্ষযজ্ঞ ধবংস'এ সব অংশই পুরাণ নির্ভর এবং পুরাণের কাহিনি ও চরিত্রও যেন হুবহু উঠে এসেছে।

অর্থাৎ পৌরাণিক কাহিনি ও চরিত্র রূপায়ণের সময় রামেশ্বর ভট্টাচার্য অবশ্যই শিবপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, স্কন্দপুরাণ ও হরিবংশ প্রভৃতি পুরাণ গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন। শিবসঙ্কীর্তন কাব্যের তৃতীয় পালাটি পুরাণ ও লোকঐতিহ্যের সমাবেশে অনেক বেশি বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে। পালার 'হিমালয়ে গৌরীর জন্মলাভ' অংশে গৌরীর জন্মকথায় পুরাণ বৃত্তান্ত যেমন রয়েছে তেমনি জন্মের সময় নানান লোকাচারক্রিয়া পালিত হওয়ার মধ্য দিয়েই উঠে এসেছে লোকঐতিহ্যের কথা।

লৌকিক প্রভাব :

'শিবসঙ্কীর্তন' কাব্যে লোকঐতিহ্য ও লৌকিক কাহিনি আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই আমাদের জানতে হবে কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের ব্যাপক সমাজ অভিজ্ঞতার কথা। কারণ সমাজ-সংসার সম্পর্কে ধারণা না থাকলে কৈলাসের শিব-শিবাণীর দাম্পত্য হর-গৌরীর দাম্পত্য জীবনের কাহিনিকে মর্ত-মানব-মানবীর সংসার নিখুঁত চিত্র রূপে উপস্থাপন করা সহজ কথা নয়। ব্যাপক সমাজ-সংসার অভিজ্ঞতা; নিরিখেই কবি রামেশর এই কাজ সম্পন্ন করেছেন। এখন শিবসঙ্কীতন কব্য বিশ্লেষণ করে লোকঐতিহ্যের বিশদ পরিচয় লিপিবদ্ধ করবো।

শিবসঙ্কীর্তন কাব্যে রামেশ্বর ভট্টাচার্য প্রথম দুটি পালায় পৌরাণিক কাহিনির অবতারণা করেছেন এবং কোথাও লৌকিকজগতের কাহিনি ও ঘটনা বর্ণনায় উৎসাহী হননি। তবে তাঁর লোকজীবন, লোকসমাজ ও লোকধর্ম সম্পর্কে প্রবল অভিজ্ঞতা ছিল। পৌরাণিক কাহিনিকে সহজ ও বাস্তব রূপ দেবার জন্য সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন। প্রথম পালার 'পৃথিবীর উৎপত্তি' কাব্যাংশে পৌরাণিক কাহিনির ভাব পরিমণ্ডলে লোকধর্ম ও লোববিশ্বাস এর ব্যাপ্ত জগৎ চমৎকার ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন-

'আর মত ভোগভূমি কর্মভূমি এই।
শুভাশুভ কর্মের প্রচুর ফল দেই।।
ভাগ্য ফলে ভূতলে মনুষ্য জন্ম হয়।

ধন্য তারা করে যারা ধর্মের সঞ্চয়।।

সেসব কেশবোপম ধর্ম্মে যার মতি।

কম্মভূমে কুকর্ম করিলে অধোগতি।।

অতএব ধর্ম কর ধরা নরদেহ।

কর্ম্মভূমে কুকর্ম করিও নহে কেহ।।'

রামেশ্বরের শিবসঙ্কীর্তন বা শিবায়ন কাব্যের তৃতীয় পালাটি বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। কেননা এই পালাতেই প্রথম লৌকিক কাহিনির অবতারণা করেছেন। পালার শুরুতেই 'হিমালয়ে গৌরীর জন্মলাভ', কাব্যাংশে গৌরীর জন্ম বৃত্তান্তে পুরাণ প্রসঙ্গের কথাও বেশ দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশ করেছেন-

'লইয়া বান্ধব জনে বাদ্যগীত কোলাহলে

করিল কৌলিক মহোৎসব।।'

এর পরে রয়েছে 'গৌরীর বাল্য-খেলা', 'গৌরীর বিবাহ খেলা', 'বিবাহ-খেলার বর কন্যা বিদায়', 'গৌরীর বিবাহ-প্রসঙ্গ', 'গৌরীর বিবাহের সম্বন্ধ', 'হিমালয়ের বাড়ী শিবের আগমন' প্রভৃতি কাব্যাংশের লৌকিক কাহিনিগুলি রসসমৃদ্ধ। লৌকিক কাহিনিগুলির মধ্যেই রয়েছে লোকায়ত জীবনের ছায়া। 'গৌরীর বাল্য খেলা' কাব্যাংশে আছে গৌরীরজন্মের পাঁচমাসের 'পুণ্যাহ' দিনে 'কর্ণভেদ', সাতমাসে 'অন্নপ্রাশন' ও 'শিশুরনামকরণ'-এর মতো মাঙ্গলিক শুভকর্মে লোকাচার-ও লোকসংস্কারের কথা।

'গৌবীর বিবাহ-প্রসঙ্গ'-এ আছে লুকোচুরি (লুকলুকানি), কড়িচড়ি (কড়িখেলা), আঁটুল-বাটুল প্রভৃতি লোকক্রীড়ার কথা এবং 'গৌরীর বিবাহ সম্বন্ধ' অংশেও রয়েছে সামাজিক ঘটকালি প্রথার কথা।

তৃতীয় পালাটি অনেক বড়। এই পালাতেই 'শিবের বরবেশ', 'শিবের বরযাত্রা', 'গৌররী-অধিবাস', 'স্ত্রীআচার', 'শাশুড়ীদের জামাই নিন্দা', 'হিমালয়ের কন্যা-সম্প্রদান', 'হিমালয়ের যৌতুক দান' প্রভৃতি কাব্যাংশে প্রতিফলিত হয়েছে লোকায়ত জীবনের বাস্তব জীবনচিত্র।

কাব্যাংশগুলি সম্পূর্ণ লৌকিক। গৌরী শিবের ঘরনি (গিন্নি) হওয়ার পর থেকেই কাব্যে লৌকিক কাহিনিতে গতি এসেছে। কবি রামেশ্বর যেন পুরাণ কথা ভুলে যেতে চাইছিলেন। এই প্রসঙ্গেই আমরা বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য গ্রহণ করবো- "হরপার্বতীর বিবাহের পর হইতে পৌরাণিক কাহিনি অল্পে অল্পে অপসৃত হইয়াছে এবং কৃষিপ্রধান জীবন হইতে উদিত লৌকিক শিবের কাহিনী জাঁকাইয়া বসিয়াছে।"

চতুর্থ পালায় শিবের পারিবারিক জীবনের কথা বলতে গিয়ে কবি রামেশ্বর লোকায়ত সমাজ ও লোকজীকন থেকে প্রচুর রসদ সংগ্রহ করেছেন। শিব ভিখারী। ভিক্ষের চাল-কড়ি যা পান তাতেই সংসার চালান। এদিকে গৌরী স্বামীর সেবার কোনো ত্রুটি রাখেননি। নানা দ্রব্য রান্না করে স্বামীকে পেট ভরে খেতে দেন। নিজের সন্তানদেরও খেতে দিয়েছেন। তবুও যেন সংসারে সুখ-শান্তি নেই। স্বামীর সঙ্গে কথায় কথায় ঝগড়া। রামেশ্বর 'হরগৌরীর কলহ' অংশে অলস, ভবঘুরে স্বামীর প্রতি গৌরী যে ভাষায় অনুযোগ ও অনুতাপ প্রকাশ করেছেন তা আমাদের ভাবতে অবাক লাগে-

'বড় বল্যা বিশ্বনাথে বেটী দিল বাপ।

খুটি খাত্যে দুটা নাই টুটা মনস্তাপ।।

রঙ্গিনী রাজার বেটী রুখ করি স্নান।

তৈল বিহন তনু ক্ষীণ খড়ি উড়্যা যান।।'

তখন মনে হয় না এযেন কোনো দেবদেবীর সাংসারিক জীবনের কথা। এ যেন পাড়া গায়ের দারিদ্যপীড়িত এক নারীর হৃদয়ের কথা। যার মধ্য দিয়ে কবি হাজার হাজার দারিদ্রপীড়িত নারীদের মনের কথা বলতে চেয়েছেন। আসলে লোকজীবন এর অনুসন্ধানক্ষেত্র থেকেই কবি এই রসদ সংগ্রহ করেছেন।

কবি রামেশ্বর শিবসঙ্কীর্তন কাব্যের ষষ্ঠপালায় কৃষক শিবের জীবন বৃত্তান্ত লোকসমাজ থেকে সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করেছেন। আমার মনে হয় ষষ্ঠ পালায় এসে কবি পুরোপুরি লৌকিক কাহিনিতে প্রবেশ করেছেন। গৌরী শিবের সংসারে কত্রী। ভিখারি স্বামীর সংসার

চালাতে গিয়ে বারে বারে কলহে জড়িয়ে পড়েছেন। স্ত্রী গৌরীর সুপরামর্শ গ্রহণ করেছেন শিব। ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে শিব ইন্দ্রে কাছে চাষের জমি পাট্টা নিয়েছেন। কুবেরের কাছ থেকে বীজ ধান সংগ্রহ করেছেন। ভীমকে সঙ্গে নিয়ে মর্ত্যে কোমর বেঁধে চাষের কাজে নেমে পড়েছেন। শিবের শস্য ক্ষেত্রে প্রচুর ফসল ফলেছে। কৃষিকর্মে ব্যস্ত সংসার-স্ত্রী-পুত্র সবই ভুলে গেছেন। কবি রামেশ্বর শিবসঙ্কীর্তন কাব্যে লিখেছেন-

'হাপুতির পুত্র যেন নির্ধন্যার ধন।

ধান্য দেখ্যা রহিলেন পাসরা পরিজন।।'

শিব মনে-প্রাণে হয়ে উঠলেন কৃষক। শিব আর ভৃত্য ভীম দু'জনেই মাটির টানে, পেটের টানে মর্ত্যে পড়ে রইলেন আত্মীয় স্বজনদের ভুলে।

সপ্তম পালায় এসে কবি রামেশ্বর লোকজীবনের অভিজ্ঞতাকে আরো ব্যাপকভাবে কাব্যে ব্যবহার করেছেন। নারীমনের সুনিপুণ কারিগর হয়ে উঠেছেন কবি রামেশ্বর। গৌরী স্বামীকে স্বচ্ছল ও ভদ্রভাবে সমাজে বাঁচার আশায় কৃষিকাজের পরামর্শ দিয়েছেন। সেই পরামর্শ মতো শিব মর্ত্যে এসেছেন চাষ-বাসের কাজে। এদিকে স্বামী কৈলাসে ফিরে না আসার দারুন চিন্তায় পড়লেন গৌরী। স্বামীর সংবাদ না পেয়ে গভীর দুঃশ্চিন্তায় মগ্ন। হেন সময়ে-নারদ এসে উপস্থিত। নারদকে দেখে গৌরী ডেকে বললেন-

'বিশদ বরণ বাম বাহুমূলে বীণা।

গৌরী দেখ্যা আস্য বলে গুণের ভাগিনা।।

ব্যথিতে বন্দনা করা বসিলেন কাছে।

হাস্যা বলে ওগো মামী মামা কোথা গেছে।।

পাট্যা পাড়্যা পাবর্তী কহিল সব কথা।

নারদ নিশ্বাস ছাড়ি হেট কৈল মাথা।।'

নারদ সব কথা শুনলেন। গৌরীকে মন্ত্রণা দিলেন। নারদের মন্ত্রনা শুনে গৌরী মুগ্ধ হলেন। কথামতো উঙানি, মশা, মাছি, ডাঁস প্রভৃতি পাঠিয়ে স্বামীকে উত্যক্ত করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু শিব তেল মেখে উঙানি দূর করলেন, গাওয়া ঘি মেখে মাছি ও ডাঁস এর হাত থেকে রেহাই পেলেন। ধুঁয়া দিয়ে মশা তাড়ালেন। গৌরী হাজার হাজার জোক পাঠালেন। শিব লবণ ও চুন মিশিয়ে জোক মেরে ফেললেন। শেষে নিজে বাগদিনী বেশে শিবের ধান ক্ষেতে এসে হাজির হলেন। জল সিচে ক্ষেতে নেমে মাছ ধরতে লাগলেন। ভীমের সঙ্গে কলহ বেঁধে গেল। শেষ পর্যন্ত ভীম বাগদিনীকে মারতে উদ্যত হলেন-

‘চুকে নাই মুখে আর ধান্য ভাঙ্গে গাজে।

মহাকোপে ধায় ভীম মারিবার সাজে।।’

শেষে ভীম বাগদীনির বাক্যবাণে পরাস্ত হয়ে সেই জায়গা ছেড়ে সোজা শিবের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। শিবকে জানিয়ে দেন-

‘ধরে মৎস্য ধান ভাঙ্গা করে বরাবর।

রূপে গুণে যৌবনে জিন্যাছে চরাচর।’

শিব বাগদিনীর রূপ-গুণের কথা শুনে ছুটে এলেন ধান ক্ষেতে।এসেই বাগদিনীর রূপে মুগ্ধ হলেন। পরিচয় জানতে চাইলেন- ‘দেও পরিচয় রামা দেও পরিচয়’। বাগদিনীর ছলনা বুঝতে পারলেন না। তার উপর আবার খোঁচা দিয়ে অভিমানের সুরে বাগদিনী বললেন-

‘বাগদিনী বলে আইমা নিকড়্যা নাগর।

কড়িপাতি নাই কথা ডাগর ডাগর।।’

শিব আর দেরি করলেন না। বাগদিনীকে বহুমূল্য মাণিক্য অঙ্গুরী হাতে দিলেন। অঙ্গুরী হাতে পেয়ে ছলনার আশ্রয় নিয়ে কৈলাসে পালিয়ে গেলেন। ছলনা, প্রবঞ্চনা ও উপস্থিত বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ে গৌরী রক্তমাংসের মানবী চরিত্র হয়ে উঠেছে।

রামেশ্বরের শিবসঙ্কীর্তন কাব্যের অষ্টম পালাটি নাটকীয়তায় পরিপূর্ণ। এক নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে হর-গৌরীর মিলন সম্ভব হয়েছে। এই নাটকীয়তা কবি সৃষ্টি করেছেন – 'গৌরীর শঙ্খ পরিধান কথা' কাব্যাংশে। নারদের পরামর্শে স্বামী শিবের কাছে গৌরী শাখা পরতে চাইলেন। শিব অভাবের জ্বালায় স্ত্রীর শাঁখা পরার শখ মেটাতে অক্ষম। রেগে বলে উঠলেন-

'ভিখারীর ভার্য্যা হয়্যা ভূষণের সাধ।

কেনে অকিঞ্চন সনে কর বিসম্বাদ।।

বাপ বটে বড় লোক বল গিয়া তারে।

জঞ্জাল ঘুচুক যাও জনকের ঘরে ।।'

স্বামীর খোঁটা সহ্য করতে না পেরে গৌরী রাগের চোটে সোজা ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বাপের বাড়িতে চললেন। শিব অনুতপ্ত হলেন। স্ত্রীকে পথে অনেক অনুনয়- অনুরোধ করলেন যাতে বাপের বাড়িতে চলে না যান। কিন্তু পার্বতী স্বামীর কথায় কান দিলেন না। এরপর নারদের পরামর্শ মতো পার্বতীকে নানাভাবে ছলনা করতে লাগলেন। শিব পথে নানা বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করলেন। প্রথমে বাঘরূপে ছলনা, পরে পথের মধ্যে প্রবল ঝড় বৃষ্টির সৃষ্টি করলেন। শেষে মায়া নদী পেরিয়ে দেবী পার্বতী হিমালয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মহা ধূমধামে হিমালয়ে দুর্গোৎসব হল। নিরুপায় শিব শক্তিহীন হয়ে পড়লে মাধব শাঁখারির রূপ ধারণ করে বিশ্বকর্মাকে দিয়ে সুন্দর শাঁখা তৈরী করালেন। পরে এ শাঁখা নিয়ে শিব সোজা হিমালয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন। শাঁখারির হাতে শাঁখা দেখে পার্বতীর আনন্দের সীমা নেই। শাঁখারি মুল্যের কথা শুনে বলে উঠলেন-

'মূল্য থাকে তবে সে মুল্যের নিরূপণ।

অমূল্য শঙ্খের মূল্য আত্ম-সমর্পণ।'

এখানেই নাটকীয়তার পরিসমাপ্তি। যেন কাহিনির যবনিকা। দেবী শাঁখারির কাছে শাঁখা পরলেন। কিন্তু মূল্য দিতে চাইলেন না। এতে শাঁখারি রেগে আগুন। রাগ সহ্য করতে না পেরে বলে উঠলেন-

'দিবে বল্যা যৌবন যতনে নিলে শঙ্খ।

ইবে ধন দেখাহ ধনের নাহি রঙ্ক।'

দেবী শাঁখারির এহেন কথা শুনে মহাকালী রূপ ধারণ করলেন। শিব পদতলে পড়লেন। তখন পার্বতী শিবকে কাছে টেনে নিলেন। নারদ এসে শিব-পার্বতীর মিলন পূর্ণ করলেন। শিব সপরিবারে কৈলাসে ফিরে গেলেন। রামেশ্বরের শিবসঙ্কীর্তন বা শিবায়ন কাব্যের শেষের দুটি পালা (সপ্তম ও জাগরণ পালা) সম্পূর্ণ লৌকিক এবং লোকায়ত চিন্তা-ভাবনার সার্থক শিল্পরূপ। রামেশ্বরের শিবসঙ্কীর্তন বা শিবায়নের লৌকিক কাহিনির ব্যবহার সম্পর্কে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ-

"রামকৃষ্ণের শিবায়নে লৌকিক শিবের কাহিনি অনতিবিস্তৃত, কিন্তু রামেশ্বরের কাব্যের শেষাংশের সবটাই লৌকিক শিবকাহিনির আদর্শে রচিত।"

৭.৫ : রামেশ্বরের শিব সংকীর্তন কাব্যের চরিত্র-চিত্রন

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের অসামান্য সৃষ্টি হল 'শিবসঙ্কীর্তন' বা 'শিবায়ন' কাব্য। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রামেশ্বরের শিবায়ন এক স্বতন্ত্র ধারার কাব্য। হর-গৌরীর দাম্পত্য জীবনের কাহিনি-ই হল এই কাব্যের মুখ্য বিষয়। সেক্ষেত্রে এই কাব্যের মুখ্য চরিত্রগুলি হল হর ও গৌরী। এঁদের দাম্পত্য জীবনের ঘটনা প্রবাহে এবং ঘাত-প্রতিঘাতে এসে পড়েছে আরো কয়েকটি চরিত্র। যেমন- নারদ, ভীম, মেনকা, দক্ষ, বীরভদ্র প্রভৃতি। অপ্রধান চরিত্র হলেও এঁরা কাব্যে অত্যন্ত সজীব ও প্রাণবন্ত। রয়েছে বৃকাসুরের কথা। সমগ্র মঙ্গলকাব্যের আদলে রামেশ্বর 'শিবসঙ্কীর্তন কাব্যে চরিত্রের চিত্রশালা নির্মাণ করেছেন।

শিব :

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর- স্বর্গলোকের এই তিন দেবতার কথা সবাই জানেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল হিন্দু পুরাণের এই গুরুত্বপূর্ণ দেবতা শিবকে নিয়ে কবিরা কত বিচিত্র কাহিনি সৃষ্টি করেছেন। বিশেষ করে ছড়া, লোককথা, লোকগাথা, মঙ্গলকাব্যে যে শিবের কথা আলোচিত হয়েছে, আর অন্য কোনো দেবতার কথা আমরা সেভাবে জানতে পারিনি। গ্রাম্যকবিরা শিবকে নেশাখোর, সংসার উদাসীন এক ভবঘুরে চরিত্র রূপে দেখেছেন। ভিক্ষাই যার বাঁচার সম্বল। শ্মশানে-মশানে ভূত-প্রেত যার সঙ্গী। এহেন শিবঠাকুরকে নিয়ে কত সুখ-দুঃখের কাহিনি, কত রঙ্গ-রসিকতা করেছেন গ্রাম্য কবিরা। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের 'গ্রাম্যসাহিত্য' প্রবন্ধে লিখেছেন- "গ্রামের কবিপ্রতিভা এখানেই ক্ষান্ত হয় নাই। শিবকে গাঁজা ভাঙ প্রভৃতি নেশায় উন্মত্ত করিয়াছে। শুদ্ধ তাহাই নহে; অসভ্য কোঁচকামিনীদের প্রতি তাহার আসক্তি প্রচার করিতে ছাড়ে নাই। কালিদাসের অনুত্তরঙ্গ সমুদ্র ও নির্বাতনিষ্কম্প দীপশিখাবৎ যোগীশ্বর বাংলার পল্লীতে আসিয়া এমনি দুর্গতি-প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

কালে কালে লোকসমাজে লোকদেবতা শিবের প্রাধান্য সবচেয়ে বেশি। বাংলার গ্রামকেন্দ্রিক সংস্কৃতির আঙিনায় আজও গ্রামে গ্রামে শিবের থান আছে। বারো মাস পুজো পান। গাজনের সময় ভক্তরা উপবাস রেখে মহাধূমধামে নৃত্য-পরিবেশন করেন। আজও লোক মুখে মুখে শিবের গান শোনা যায়। আর এর থেকেই অনুমান করা যায় যে শিব ঠাকুরের জনপ্রিয়তা বাংলা এবং বাঙালি সমাজে কতটা গভীরে ছড়িয়ে আছে।

উচ্চতর সমাজেও শিব মর্যাদার সঙ্গে পুজো পান। আর্য-অনার্য মিশ্রণের পরেও শিবঠাকুরের জনপ্রিয়তা কমেনি। বরং তিনি মানুষের কাছে, মানুষের জীবনে কল্যাণময় রূপে আবির্ভূত হলেন। দেবতাদের মধ্যে সর্বপেক্ষা তিনিই সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে গ্রহণীয় হয়ে উঠলেন। কারণ ভিখারি শিবের দারিদ্রাপীড়িত জীবন ও জীবনের আদর্শকে দেশবাসী সাদরে গ্রহণ করলেন এবং নিজেদের ভাঙা কুঁড়েঘরের এক অতি আপনজন ভেবে নিয়ে সম্মান জানালেন, পুজো দিলেন। শিব হয়ে উঠলেন দেবদিদেব মহাদেব। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবসঙ্কীর্তন' বা 'শিবায়ন' বাঙালিদের কাছে এক স্মরণীয় গ্রন্থ। কেননা শৈব ভিক্ষুক, ভাট ভিখারি ও গাজনের উপাসকদের ভিখারি নেশাখোর-

বাউন্ডুলে শিবকে একেবারেই সংসারের গণ্ডিতে আবদ্ধ করেছেন। স্ত্রীর পরামর্শে শিব ভিক্ষার ঝুলি ফেলে রেখে লাঙল কাঁধে চাষ করতে মাঠে নেমে পড়েছেন। বাংলা ও বাঙালির সমাজে শিব হয়ে উঠলেন কৃষক এবং কৃষিদেবতা। কোথাও শিব রুদ্রমূর্তি এবং সংহারশক্তি নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হননি।

রামেশ্বরের 'শিবসঙ্কীর্তন' কাব্যের প্রধান চরিত্র হল শিব। হিমালয় কন্যা গৌরীকে বিবাহ করে শিব সংসারী হয়েছেন। সংসারী হয়েও সংসারের প্রতি উদাসীন। যেখানে-সেখানে ভূত-প্রেত সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ান। গাঁজা-ভাঙ-সিদ্ধি খেয়ে পড়ে থাকেন। গৌরী ভাবলেন এরকম আলস, অকর্মণ্য স্বামীকে নিয়ে কিভাবে সংসার চালাবেন, মাথায় যত দুশ্চিন্তা গৌরীর। ভিক্ষায় আর সংসার চলে না। সন্তানদের পেট ভরে খেতে দিতে পারে না।

'ক্ষুধিত তনয় সে বিনয় নাই মানে।

ধায়্যা গিয়া পথে তাতে আগুলিল গণে।।

হরমুখ দেখি হাসে নাচে এক পায়।

শূলী দিল ঝুলি দুঁহে লুটি করি খায়।।'

এই তো সংসার। কিন্তু গৌরী সর্বংসহা নারী। দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করেও স্বামীর সংসার আগলে আছেন। সংসার চালাতে গিয়ে কথায় কথায় স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া লেগে যায়। শিব যখন বলেন-

'কিঞ্চিৎ করিয়া ক্রোধ কহিছেন ভব।

কালিকার কিছু নাহি উড়াইলে সব।।'

তখন মনে হয় না শিব স্বর্গের কোনো দেবতা, মনে হয় যেন আমাদের কোনো এক পাড়া গ্রামের গৃহকর্তা, যিনি শিবু ঠাকুর নামে পরিচিত। যার ঘরে নিত্য অভাব। আর অভাব-অনটনের কারণেই যার ঘরে স্ত্রীর সঙ্গে নিত্য কলহ লেগেই থাকতো। এ যেন রামেশ্বরের কবি ভাবনায় লোকজীবন থেকে উঠে আসা এক দারিদ্র্যপীড়িত ব্রাহ্মণের সাংসারিক জীবনের কথা।

'শিবসঙ্কীর্তন'-এ রামেশ্বর শিব চরিত্রটিকে লোকজীবনের সঙ্গে গভীরভাবে মিশিয়ে দিয়েছেন। যখন দেখি শিব নেশাগ্রস্ত হয়ে কোঁচকামিনীদের পাড়ায় গিয়ে রঙ্গরসের গল্পে মজে থাকেন এবং কখনো বা কোচিনীদের নিয়ে আনন্দ-স্ফুর্তিতে মেতে উঠেন-

'কোঁচিনী সকল হৈল কুসুম উদ্যান।

শঙ্কর ভ্রমর তায় মধু করে পান।।

নিত্য নিত্য এই কীর্তি করে কৃত্তিবাস।

দিন শেষে বিজ্ঞ বেশে ভিক্ষা অভিলাষ ।।'

তখন মনে হয় না এ শিব কৈলাসবাসী ধ্যানযোগী মহাজ্ঞানী দেবতা বলে। বাগদিনীর সঙ্গেও শিব রঙ্গ-রসিকতায় মজেছেন 'হাস্যা হাস্যা ঘেস্যা ঘেস্যা ছুঁতে যায় অঙ্গ'। তখন আমাদের মনে সংশয় জাগে কৈলাসবাসী শিবের দেবত্ব নিয়ে। আসলে কবি রামেশ্বরের মুখ্য উদ্দেশ্য হল ভাল-মন্দ, দোষ-গুণে মিশ্রিত এক রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে লোকসমাজে শিবের চরিত্রকে প্রতিষ্ঠা করা।

শিব গৌরীর মতো স্ত্রী পেয়ে ধন্য হয়েছেন। বুদ্ধিমতী গৌরী কর্মতৎপরতার নৈপুণ্যে স্বামীর সংসারধর্মে এনে দিয়েছিলেন সুখ-শান্তি-ভালোবাসা। তিনি স্বামীকে চাষ-বাসের কাজ করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে বলেন 'চষ ত্রিলোচন চাষ চষ ত্রিলোচন।'

কিন্তু পার্বতীর কথায় প্রথমে কান দিতে নারাজ। তাই স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন- 'চাষ চষ্যা বিস্তর উদ্বেগ পাব মনে।' হয়তো সমাজে জোতদার, জমিদার, মহাজনের কোপে পড়তে হতে পারে ভেবেই শিব প্রথমে চাষবাসের কাজে নেমে পড়তে চাননি। পরে পার্বতীর অনুরোধে শিব চাষের কাজে সম্মত হয়েছেন 'ত্রিলাচন তানে কন তবে চাষ করি।' ভীমকে সঙ্গে নিয়ে চাষের জমিতে কঠোর পরিশ্রম করে ফলিয়েছেন সোনার ফসল। ফসলের আনন্দে মন উদ্বেল- 'হর্ষ হৈয়া হর ধান্য দেখে অবিরাম।' ভুলে গেলেন স্ত্রী-পুত্র-পরিবার পরিজনদের কথা-

'ধান্য দেখ্যা, রহিল পাসরা পরিজন।'

এটাই তো জীবন। বদলে যাওয়ার রঙেই জীবনে আসে নতুন বৈচিত্র্য। মাটির সঙ্গে এই প্রথম কোনো স্বর্গবাসী দেবতার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আর শিব হয়ে উঠলেন বাঙালির প্রাণের কৃষিদেবতা। চৈত্র-সংক্রান্তির দিনে পুজো দিয়েই বাঙালি কৃষকরা নতুন উদ্যোমে নতুন বছরে চাষের কাজে কোমর বেঁধে নেমে পড়েন। আজও বাঙালি কৃষকেরা সমাজে সংস্কার মেনে বৈশাখ ও জৈষ্ঠ্য মাসের শুভক্ষণে বীজ বপন করে থাকেন। কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁর 'শিবসঙ্কীর্তন' কাব্যে লিখছেন-

'বৈশাখে বিছাতি কৈল শুভক্ষণ দিনে।

সার দিয়া সারা সব ভূমি বাতে বুনে।।'

এই জন্যই হয়তো সমালোচক নন্দগোপাল যথার্থই মন্তব্য করেছেন- 'এ দেবাদিদেব মহেশ্বর এবং জগন্মাতা পাব্বতীর কৈলাস জীবন নয়, এ অতীত বাংলার কোন শিবদাস ভট্টাচার্য্য এবং তস্য ভার্য্যা পার্বতী ঠাকুরাণীর জীবন কাহিনী।"

গৌরী :

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে হর গৌরীর দাম্পত্য জীবনের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। লোকায়ত জীবন দর্শনে মঙ্গলকাব্যের কবিরা হর-গৌরীর দাম্পত্যের জীবনের নিখুঁত চিত্র বর্ণনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু মধ্যযুগে শিবায়ন কাব্যে হর গৌরীর দাম্পত্য জীবনের কথা অনেক বেশি মনস্বত্ত্ব সম্মত এবং বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। রামেশ্বরের 'শিবসঙ্কীর্তন' কাব্যে হর-গৌরীর পারিবারিক জীবন বাঙালির জীবনাদর্শ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে তাঁর কাব্যে গৌরী চরিত্রটি আমাদের কাছে আকর্ষণীয় এবং অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে। কেননা নারী শক্তিই পারে পুরুষের জীবন পাল্টে দিতে। নব উদ্যোগে নব অনুপ্রেরণায় জীবনকে অন্যখাতে বয়ে দিতে পারে। এখানে গৌরী বাউন্ডুলে স্বামী শিবকে কৃষিকাজে পরামর্শ দিয়ে কৃষক জীবনে উন্নীত করেছেন। শিবের হলকর্ষণের মধ্য দিয়ে বন্ধ্যা জমি উর্বর হয়ে উঠছে। সে জমিতে সোনার ফসলে পরিপূর্ণ। তাই বাঙালির লোকজীবনাদর্শে শিবের হলকর্ষণে প্রজনন শক্তি সংক্রান্ত সংস্কার জড়িয়ে রয়েছে । আমরা এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথে বক্তব্য উদ্ধৃত করবো- "কৃষিবিদ্যাকে সেদিন

আর্যসমাজ কত বড় মূল্যবান বলে জেনেছিল তার আভাস পাই রামায়ণে। .....অহল্যাভূমিকে হলযোগ্য করেছিলেন রাম। এই হলকর্ষণই একদিন অরণ্য পর্বত ভেদ করে ভারতের উত্তরকে দক্ষিণকে এক করেছিল ।"

বড়ুচন্ডীদাস তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' রাধা চরিত্রের ক্রমবিকাশ তেরোটি খণ্ডে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন। রাধা বালিকা থেকে নায়িকা হয়ে উঠেছে। সমগ্রকাব্যে কবি যেন রাধা চরিত্রে সর্বস্ব কবিত্বশক্তি উজাড় করে দিয়েছেন। আমার-মনে হয় অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে ব্রাহ্মণ কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য 'শিবসঙ্কীর্তন' কাব্যে গৌরীর চরিত্র অঙ্কনেও সর্বস্ব কবিপ্রতিভা উজাড় করে দিয়েছেন। গৌরীও বালিকা থেকে কাব্যের নায়িকা হয়ে উঠেছে। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে অনেক বেশি পূর্ণ বিকশিত চরিত্র হয়ে উঠেছে। মঙ্গলকাব্যের গৌরী রামেশ্বরের শিবসঙ্কীর্তন কাব্যে অনেক বেশি পুর্ণবিকশিত। যেন নারীসত্তায় পরিপূর্ণ। একদিকে প্রেমিকা অপর দিকে বধূ ও জননী রূপে গৌরী হয়ে ওঠেছে রক্ত মাংসের নারী চরিত্র। স্বামী শিবের কর্মমুখর জীবনের অনুপ্রেরণাদাত্রী। সুতরাং সমগ্র কাব্যে গৌরীর মধ্যে কোথাও দেবীর ছাপ লুকিয়ে আছে বলে মনেই, হয় না।

রামেশ্বরের 'শিবসঙ্কীর্তন' কাব্যে গৌরী রূপে-গুণে অতুলনীয়া, নারীত্বে পূর্ণবিকশিত এক মহিয়সী চরিত্র হয়ে উঠেছে। বাগদিনী ছদ্মবেশে পুরুষের কামনার জগতে যেমন আগুন ধরিয়ে দেয় আবার সেই-নারী-ই গৃহিণী রূপে ভক্তি-শ্রদ্ধায়-সারল্যে পুরুষের কর্মপ্রেরণাদাত্রী ও বাঁচার সঙ্গিনী হয়ে ওঠেন। তাই রামেশ্বরের হাতে গৌরী এক ক্রমবিকশিত নারীত্বের পূর্ণাবয়ব চরিত্র হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিয়েই গৌরীর চরিত্রকে অঙ্কন করবার চেষ্টা করবো।

পর্বতরাজ হিমালয়ের ঘরে মেনকার গর্ভে গৌরী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কবি রামেশ্বর তাঁর কাব্যে লিখেছেন-

'শুভক্ষণে সেই ধন্যা পরম সুন্দরী কন্যা

গিরিরাজ গৃহে অবতার ।'

গৌরী হিমালয় পুরীতে কতরঙে কতঢঙে খেলায় মেতে থাকেন। তবে খেলার সাথীদের মধ্যেও দলনেত্রী হল গৌরী। তাঁর কথা মতো সবাই খেলা করে-

'বিরাজে সবার মধ্যে প্রধান পাব্বতী।'

খেলাধুলার মধ্যে দিয়েই কিলোরী-গৌরীর জ্ঞান,বুদ্ধির বিকাশ ঘটেছে।যখন দেখি 'বিবাহ খেলার বরকন্যা বিদায়' কালে যে ভাষায় জামাইকে বুঝিয়েছেন তাতে তো রাঢের কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজের দুর্গতির ভয়ংকর চিত্র সম্পর্কে সে ওয়াকিবহাল।

'জামাতার হস্ত তুলিয়া নিল নিজ মাথে।

শাশুড়ীর কথা হৈল জামাতার সাথে।।

কুলীনের পোকে আর কি বলিব আমি।

বাছার অশেষ দোষ ক্ষমা কৈর তুমি।।

আঁঠু ঢ্যাকা বস্ত্র দিবা পেট ভরাভাত।

প্রীত কৈর যেমন জানকী রঘুনাথ।।'

কবি রামেশ্বর খুব অল্প বয়সেই গৌরীকে সমাজ জীবন সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছেন।

আগেকার দিনে বাল্যবিবাহ প্রথা ছিল। আট বছর হলেই মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হতো। মেয়ে বড় হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে গিরিরাজ হিমালয় দুশ্চিন্তায় পড়েন। মেয়েকে পাত্রস্থ করার জন্য নারদের শরণাপন্ন হলেন। ঘটক নারদের সহযোগিতায় গৌরীর বিবাহ সম্পন্ন হল শিবের সঙ্গে। পরম সুন্দরী কন্যার বর দেখে মেনকার চক্ষুস্থির। তবুও শিবের পাশে বসিয়ে গৌরীকে আনন্দে সম্প্রদান করলেন গিরিরাজ।

'হেমাসনে হিমালয় বসাইয়া হরে।

হরষিত হৈয়া হৈমবতী দান করে।।'

শিবের সংসারের দায়িত্ব নিতে হল গৌরীকে। ঘরে নিত্য অভাব। স্বামীর ভিক্ষার অন্নে সংসারে জোগান দেওয়া ভার। নিজে অভুক্ত থেকেও স্বামী-সন্তানদের পেটভরে খেতে দেন। রান্না ঘরে বসে স্বয়ং শিবও শিবাণীর প্রশংসা করেছেন-

‘প্রেয়সীকে প্রশংসিয়া বলে বিশ্বনাথ।

সত্য সতী তুমি অতি ধন্য দুটী হাত।।’

প্রেয়সী হিসেবে স্বামীর শিরোমণি। শিবের সংসারে গৃহিণী হিসেবেও গৌরীর ভূমিকা কম নয়। দারিদ্র্যের কারণেই সংসারে এত ঝামেলা গৌরীকে সহ্য করতে হয়। কথায় কথায় স্বামীর মুখে এমন কথা শুনতে হয় ‘গলগ্রহ গৌরীকে গোবিন্দ দিল কেনে’। গৌরী শান্ত চিত্তে সব সহ্য করেন। পাড়া প্রতিবেশীদের কাছে অলংকার, আসবাবপত্র সব বান্ধা (বন্ধক) দিয়ে পেটের অন্ন জোগাড় করতে গৌরী হিমসিম খেয়ে যান। তবুও যেন-

'জঠর অনলে জ্বলে জগতের মাতা।'

গৃহিণী হিসেবে গৌরী চরিত্রটি আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে যখন দেখি সংসার উদাসীন কর্তা শিবকে ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে কৃষিবৃত্তি গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেছেন। পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্য কামনায় গৌরীর এহেন পরামর্শের বাহবা দিতে হয়।

শিব প্রথমে কাদামাটি মেখে চাষ করতে সম্মত হননি। কৃষিকর্মে যে দুঃখ আছে- তা শিব ভালো ভাবেই জানেন। গৌরীকে ভেবে দেখতে বললেন-যদি চাষবাস ছাড়া অন্যকিছু করা যায়।

‘চাষ অভিলাষ ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করী।

আর কিছু ব্যবসায় বল তাহা করি।।’

কৃষিকাজের মধ্য দিয়েই কৃষকের ভাগ্য ফেরে, ঘরে অতুল ধনসম্পত্তিতে ভরে ওঠে। আত্মীয়-স্বজন-দাসদাসী পরিজনদের মুখে হাসি ফোটে। অষ্টাদশ শতকের অবক্ষয়ের যুগে গৌরী ভদ্রভাবে বাঁচায় স্বপ্নে অকর্মন্য, অলস ভিখারি স্বামীকে যে ভাবে উজ্জীবিত করেছেন তা ভাবতে অবাক লাগে।

'ভবে রাখ্যা ভীম দিয়া চাষ চষ তবে।

পেট ভরা ঢের করা দশ হাতে খাবে।।'

স্বামীকে সংসারের আদর্শ গৃহকর্তা রূপে দেখতে চেয়েছিলেন পার্বতী । পার্বতীর এই স্বপ্ন সেদিন ছিল আপামর বাঙালি নারীর স্বপন তাই রামেশ্বরের হাতে 'শিবসঙ্কীর্তন' বা 'শিবায়ন' কাব্যে পার্বতীই হয়ে উঠলেন বাঙালির পতিব্রতা রমণী, স্বামীর মঙ্গল কামনাদাত্রী নারীরূপে।

কবি রামেশ্বরের 'শিবসঙ্কীর্তন' কাব্যে গৌরীর জননী রূপটিও অধিকতর আকর্ষণীয় চিরন্তন স্নেহময়ী মাতৃত্বের প্রতিভূ চরিত্র হিসেবে অঙ্কন করতে সমর্থ হয়েছেন। পুত্র-কন্যা পরিবেষ্টিত হর গৌরীর সংসার। শিব যখন ভিক্ষা করতে যান, তখন ঘরে পুত্রকন্যাদের নিয়ে আগলে থাকেন পার্বতী। ঘরে দাস-দাসী থাকলেও তাকেই রান্না চড়াতে হয় এবং প্রস্তুত অন্ন নিজের হাতে স্বামী-সন্তান-পরিজনদের পরিবেশন করেন। স্বয়ং শিবও অন্ন পরিবেশন আশ্চর্য হয়েছেন-

'অল্প রান্ধ্যা এত অন্ন কোথা হতে আন।

কেমন হস্তের গুণ কিবা মন্ত্রজান।।

ধন্য ধন্য উমা আগো ধন্য ধন্য উমা।

মিছামরি ভিখ্ মাগ্যা না বুঝিয়া তোমা।'

এই পার্বতী-ই সেদিন বাঙালিদের ঘরে ঘরে প্রাণের দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁর হাতের অন্ন খাওয়ার জন্য বাঙালিরা লালায়িত হয়ে ওঠেন।

'হাসিয়া অভয়া অন্ন বিতরণ করে।'বাঙালিদের কাছে এই পার্বতী-ই হয়ে উঠেছিলেন অন্নদাত্রী জগন্মাতা।

৭.৬ : রামেশ্বরের শিব সংকীর্তন কাব্যে হাস্যরস

হাসি-কান্না জীবনের অঙ্গ। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ছাড়া মানুষের জীবনকে ভাবা যায় না। কাব্য, নাটক, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি সাহিত্যের বিচিত্র শাখায় জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার ছবি ভেসে ওঠে। কবি-সাহিত্যিকেরা ব্যাপ্ত সাহিত্য জগতে চরিত্রের আচরণে ও সংলাপে কখনো অসঙ্গতি, কখনো ত্রুটিবিচ্যুতি, কখনো স্থূল ভাড়ামি, কখনো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আবার কখনো বা বাগবৈদগ্ধ্য গুণে হাস্যরস সৃষ্টি করেন। মধ্যযুগের কবিরাও কাব্য-কবিতার জগতে হাস্যরসের অবতারণা করেছেন। বিশেষ করে আখ্যান কাব্যে, অনুবাদ কাব্যে, জীবনীকাব্যে ও মঙ্গলকাব্যে হাস্যরসের উতরোল ধারা আমরা লক্ষ করি। অষ্টাদশ শতক মধ্যযুগের সাহিত্য-সংস্কৃতির দিক থেকে যেমন তাৎপর্যপূর্ণ তেমনি সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের দিক থেকেও যথেষ্ট ইঙ্গিতবাহী। যুগসন্ধিক্ষণের সব বৈচিত্র্য যেন সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতে লিপিবদ্ধ হল। রামেশ্বরের 'শিবসঙ্কীর্তন' বা 'শিবায়নে' যুগসংশয়ের কালচেতনায় মানুষের সংশয়-উৎকণ্ঠা ও হতাশার দিকগুলি আকারে-ইঙ্গিতে ধরা পড়েছে । আর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে যুগসন্ধিক্ষণের বাস্তব চিত্র সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে। ভারতচন্দ্র দক্ষ শিল্পী ছিলেন। অবক্ষয় যুগে মানুষের মনের সংশয়, হতাশা, ক্ষোভ 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ করেছেন। যার ফলে ভারতচন্দ্র জীবনের অসঙ্গতি, ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি হাস্য-পরিহাসচ্ছলে নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। অনেকক্ষেত্রে তিনি হাস্যরস সৃষ্টির জন্য চরিত্রগুলিকেও কাজে লাগিয়েছেন। রামেশ্বর ভট্টাচার্যও অত্যন্ত সমাজ অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিল্পী ছিলেন। তাঁর কাব্যে যুগসংশয়ের ছায়া চরিত্রগুলির হাবে-ভাবে ও কার্যকলাপে ধরা পড়েছে। কখনও-বা দেবতাদের কাণ্ড-কারখানা দেখে আমাদের হাসি পায়। এ হাসি কখনো কৌতুক, কখনো বিদ্রুপাত্মক, আবার কখনো বা বেদনাবহ হয়ে ওঠে। 'শিবসঙ্কীর্তন' কাব্যের হাস্যরস প্রসঙ্গে সম্পাদক পঞ্চানন চক্রবর্তী লিখেছেন- "সত্যই রামেশ্বরের নিবিড় অনুপ্রাস ভেদ করিয়া সমগ্র কাব্যটির মধ্যে শুচিস্নিগ্ধ স্মিতহাস্য কোথাও স্পষ্ট, কোথাও-বা অস্পষ্ট হইয়া প্রকাশিত রহিয়াছে। কৌতুক, বিদ্রুপ, পরিহাস, উপহাস, ব্যঙ্গোক্তি ও ব্যঙ্গ, হাস্য-রসের উপাদান শিবায়নে ইহার সবগুলিকেই একত্র দেখা যায়।"

রামেশ্বর ভট্টাচার্যকে হাস্যরসিক কবি বললেও ভুল হয় না। কেননা সমগ্র কাব্যে শুচিস্নিগ্ধ স্মিত হাস্য', কখনও স্পষ্ট রূপে কিম্বা কখনও বা অস্পষ্ট রূপে কবি পরিবেশন করেছেন। এখন আমরা শিবসঙ্কীতন বা শিবায়ন কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে হাস্যরসের নানা দিক অনুসন্ধান করবো।

দক্ষ মহাযজ্ঞের আয়োজন করেছেন। কিন্তু সেই মহাযজ্ঞে জামাতা শিবকে নিমন্ত্রণ জানাননি। তবুও সতী বাবার মহাযজ্ঞে অংশগ্রহণ করতে চান। কিন্তু শিবের অনুমতি পাননি। স্বামীর শত নিষেধ উপেক্ষা করে সতী বাবার যজ্ঞ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলেন। কন্যার সামনেই দক্ষ শিব নিন্দায় মুখর হলেন। পতিনিন্দা সহ্য করতে না পেরে সতী দেহত্যাগ করলেন। একথা শুনে শিব দক্ষ যজ্ঞ নাশে বীরভদ্রকে পাঠালেন। বীরভদ্র দক্ষসৈন্যদের পরাস্ত করলেন। 'দক্ষযজ্ঞ নাশ' অংশে কবি রামেশ্বর লিখেছেন-

'সংসারে দেখাতে শিব-নিন্দুকের ফল।
কাটিয়া দক্ষের মাথা হাসে খলখল।।
ফেলাইয়া পাবকে প্রস্রাব কৈল তায়।
মূত্রে পুরে যজ্ঞকুণ্ড উথলিয়া যায়।।'

প্রতাপশালী দক্ষের এমন করুণ অবস্থা দেখে আমাদের মন বিচলিত হয়ে ওঠে। বেদনাবহ হলেও মুখের হাসি ধরে রাখতে পারি না। যখন এমন কাণ্ড দেখি-

'ফেলাইয়া পাবকে প্রস্রাব কৈল তায়।
মুত্রে পুরে যজ্ঞকুণ্ড উথলিয়া যায়।।'

বাঙালিরা ভোজন রসিক। রসিয়ে রসিয়ে খেতে ভালোবাসেন। মধ্যযুগের কাব্যেও ভোজন রসিক বাঙালিদের পরিচয় রয়েছে। অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' থেকে 'অন্নদামঙ্গল' সর্বত্রই খাদ্যরসিক বাঙালিদের পরিচয় আছে। আবার হিঁসেল ঘরে রন্ধন প্রণালী এবং ভোজনকে কেন্দ্র করে কবিরা হাস্যরসের উতরোল বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। 'চন্ডীমঙ্গল'

কাব্যে মুকুন্দ চক্রবর্তী ‘কালকেতুর ভোজন’ অংশে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন

কালকেতুর ভোজনকে কেন্দ্র করে-

‘শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিটকাল।

ছোট গ্রাস তোলে যেন তেয়ারটিয়াতাল।।

ভোজন করিতে গলা করে ঘড় ঘড়।

বসন খসায় যেন মরাইর বড়।।’

কবি রামেশ্বরও শিবসঙ্কীর্তন কাব্যে ‘পিতাপুত্রের ভোজন’ অংশে হাস্যরস পরিবেশন করেছেন। গৌরী হিঁসেল ঘরে কার্তিক, গণেশ ও স্বামী শিবকে ভাত- তরিতরকারি খেতে দিয়েছেন। কিন্তু খেতে দেওয়ার নিমেষেই খাবার শেষ। গৌরী খাবারের জোগান দিতে গিয়ে গলদ্ঘর্ম। এ দৃশ্য দেখে বেরসিকও না হেসে থাকতে পারবেন না-

‘তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী।

দুটি সুতে সপ্তমুখ পঞ্চমুখ পতি।।

তিন জনে একুনে বদন হইল বার।

গুটি গুটি দুটি হাথে যত দিত পার।।

তিন জনে বার মুখে পাঁচ হাথে খায়।

এই দিতে এই নাঞি হাঁড়ি পানে চায়।।

দেখ্যা দেখ্যা পদ্মাবতী বস্যা একপাশে।

বদনে বসন দিয়া মন্দ মন্দ হাসে।।

সুক্তা খ্যায়া ভোক্তা যদি হস্ত দিল শাকে।

অন্নপূর্ণা অন্ন আন রুদ্রমূর্তি ডাকে।।’

'ভীমের ভোজন' অংশেও কবি রামেশ্বর হাস্যরসের অবতারণা করেছেন। কালকেতুর মতই সে ভয়ংকর শক্তিধারী। খাবার খাওয়ার দৃশ্যও যেন আরো বীভৎস। যার ভোজন দৃশ্য দেখে দৈত্য-দানব-রাক্ষস সকলেই ভীত।

'গণ্ডশৈল সমান নির্মাণ করা গ্রাস।

দেব দৈত্য দানব দেখিয়া পাইল ত্রাস।'

বৃকাসুর উপাখ্যান অংশে শিবের উপস্থিত বুদ্ধির অভাবে কৌতুক হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। কেননা মহাশক্তিধর বৃকাসুর শিবের কাছে যে বর চেয়ে বসলেন-তা বিবেচনা না করেই শিব বরদান করলেন-

'যার শিরে হস্ত দিব ভস্ম হবে সেই।'

অমনি বর পেয়ে বৃকাসুর পরীক্ষা করার জন্য বরদাতার মাথায় হাত দিতে গেলেন। শিব বুঝতে পেরে প্রাণ নিয়ে ছুটে পালালেন-

'প্রাণ ভয়ে পালানু পশ্চাৎ নিল তাড়্যা।

আউলাইল জটা বাঘছাল গেল পড়্যা।।

এ দৃশ্য দেখে না হেসে আমাদের উপায় নেই। এখানে যেন দেখি কৌতুকের ছটায় হাসির উদ্রেক।

ভারতচন্দ্রের পূর্বে রামেশ্বর ভট্টাচার্য 'শিবসঙ্কীর্তন' কাব্যে স্বর্গের কৈলাসে বসবাসকারী দেবতা হর গৌরীকে প্রথম নামিয়ে এনেছিলেন মর্ত্য পৃথিবীর এক অজ পাড়াগাঁয়ে, যাদেরকে গ্রামের মানুষ হর-গৌরী নামেই চিনতো, দরিদ্র এক চাষির পরিবার হিসেবেই জানতো। পরিবারের কর্তা হর বা শিব আর পরিবারের কত্রী গৌরী। কর্তা এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষের চাল- ফলমূল এনে কত্রীর হাতে দেন। স্বামী-সন্তান-সন্ততিদের খেতে দেওয়ার পর তা সব ফুরিয়ে যায়। এতে শিব রেগে একেবারে আগুন। গৌরীকে রাঙা চোখ দেখিয়ে বললেন-

'ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করী খাব নাই ভাত।

যাব নাই ভিক্ষায় যে করে জগন্নাথ।।'

সন্তানের ক্ষুধার জালা মায়ের কাছে অজানা নয়। তাই যন্ত্রণার সুরে স্বামীকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করতে চান-

'পাবর্বতী বলেন প্রভু তুমি কেন খাবে।

চাক করিলে ভাঙ্গ এখন পাক করিতে কবে।।

এখন বাপের কাছে বস্যা আছে পো।

ক্ষুধা হৈলে কবে মোকে খাইতে দেনা গো।।

বাপের বিভোগ নাই কি করিবে মায়।

দুগ্ধপোষ্য ক্ষুব্ধ নাকি চুপু দিলে রয়।।'

গৌরীর এই অন্তরের বেদনা-আমাদের যেমন ভাবিয়ে তোলে, তেমনি শুচিস্নিগ্ধ হাসির লহরীতে এক অন্য বার্তা দেয়।

গৌরীর পরামর্শ মতো শিব চাষের কাজে মন দিলেন। সঙ্গে পেলেন ভীমকে। কিন্তু চাষের কাজ করতে গেলে হাল-জুয়াল-মই দরকার। দরকার বীজধান। সেক্ষেত্রে গৌরী পরামর্শ দিলেন বিশ্বকর্মার কাছে যেতে-

'দেখ বিনা বেতনে বিশাইয়ে বল্যা কালি।

গাছ কাট্যা গড়াইব লাঙ্গল জোয়ালি।।

ঘাত করো তারে লয়্যা পাতাইবে শাল।

'শূলভাঙ্গা সাজসজ্জা গড়াইব কাল।।'

শূল ভাঙার কথা শুনে শিব রেগে উঠলেন-

'শূল ভঙ্গ শুনিয়া শিবের হৈল কোপ।'

গৌরীও স্বামীকে রাগ সংবরণ করতে বললেন এবং যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার অনুরোধ করলেন। কেননা শূল নিয়ে বসে থাকলে আর চলবে না। শূল ভেঙেই সৃষ্টি করতে হবে চাষের সরঞ্জাম। বাঁচার নতুন মন্ত্র হিসেবে কৃষির প্রতি স্বামীকে আস্থাশীল করতে চেয়েছেন। কিন্তু স্বামী তাঁকে যে ভাষায় আক্রমণ করেছেন তাতে তো শুনে হাসি পাবারই কথা-

'নামের নিমিত্ত লোক নানা কম্ম করে।

ডাকিনী বস্যাচ্ছ নাম ডুবাবার তরে।।

রামেশ্বর বলে শুন্যা রুষিল রঙ্কিণী।

কি কাজ করিবে শূল কহ দেখি শুনি।।'

বচসা বা ঝগড়ার সময় হর-গৌরী যে ভাষায় কথা বললেন তাতে তো আমাদের হাসি পাওয়ারই কথা। চরিত্রের কথাবার্তায়, চাল-চলনে, হাব-ভাবে হাস্যকৌতুকের ধারা কাব্যে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করবো প্রখ্যাত সমালোচক ড. অজিতকুমার ঘোষ-এর মন্তব্য- "রামেশ্বর সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর চরিত্রের প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রুপ বর্ষণ করিয়া আমোদ উপভোগ করিয়াছেন। লোকচরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি সরস হাস্যকৌতুকের ধারায় স্নিগ্ধ হইয়া কাব্য মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে।"

৭.৭ : অনুশীলনী

১। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ন কাব্যের রচনাকাল ও কাহিনী সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। রামেশ্বরের শিবায়ন কাব্যে বর্ণিত সমাজ চিত্রের পরিচয় দিন।

৩। রামেশ্বরের শিবায়ন কাব্যে বর্ণিত বাংলার কৃষিনির্ভর জীবনচিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

৪। রামেশ্বরের শিবায়ন কাব্যের পৌরাণিক ও লৌকিক প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৫। রামেশ্বরের চরিত্র-চিত্রন দক্ষতার পরিচয় দিন।

৬। টীকা লিখুন- রামেশ্বরের কাব্যের হাস্যরস।

৭.৮ : গ্রন্থপঞ্জি

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস- সুকুমার সেন

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত- ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত- ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৪। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস- ক্ষেত্র গুপ্ত

৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা- শ্রী ভূদেব চৌধুরী

৬। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস- ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য

৭। বাংলা সাহিত্য পরিচয়- ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়

৮। শিবসঙ্কীর্তন বা শিবায়ন-ড. দয়াময় মণ্ডল